বিদেশী প্রবন্ধ-সঞ্চয়ন

বিদেশী প্রবন্ধ-সঞ্চয়ন

[শ্রেষ্ঠ বিদেশী প্রবন্ধের সরস ও প্রাঞ্জল অনুবাদ]

অনুবাদক ও সম্পাদক

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৩৫৯

প্রথম ০ কার্ত্তিক
সংস্করণ ০ ১৩৫৯
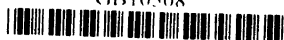
প্রকাশক : শ্রীসরোজনাথ সরকার,
এম্-এ, বি-এল্।
কমলা বুক ডিপো
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা—১২।

মূল্য : তিন টাকা আট আনা মাত্র

মুদ্রাকর : শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস
শ্রীপতি প্রেস
১৪, ডি. এল্. রায় ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা—৬।

ভূমিকা

প্রকাশকের প্রীতির দাবী আমাকেই এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে হইবে; বোধ হয় পরমারাধ্য স্বর্গত গ্রন্থকারের সহিত আমার সম্পর্ক স্মরণ করিয়া আমার অক্ষমতা সত্ত্বেও তাঁহারা আমাকে তলব করিয়াছেন। গ্রন্থের পরিচয়-স্বরূপ একটা ভূমিকা সেই সঙ্গে জুড়িয়া দিতে হয়, ইহাই নিয়ম। অতএব, কেবল ঐ নিয়মরক্ষার্থেই আমি তাঁহাদের এই দাবী মান্য করিয়াছি, আসলে আমার দায়িত্ব সামান্যই। কারণ, প্রথমতঃ গ্রন্থকার কোন ভূমিকা-লেখকের দেওয়া পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না; তাঁহার সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে 'not to know him is to urgue oneself unknown'. দ্বিতীয়তঃ, সঞ্চয়নের অন্তর্ভূক্ত প্রায় প্রবন্ধগুলির ললাটে তিনি যে প্রবন্ধ ও প্রবন্ধকার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয়-লিপি লিখিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই ভূমিকার প্রয়োজন অনেকখানি সিদ্ধ হইয়াছে; বাদ বাকি রসিক পাঠকগণ প্রবন্ধগুলির ভিতরে প্রবেশ করিলে নিজেরাই উদ্ধার করিতে পারিবেন। আমার কাজ হইবে প্রবন্ধগুলির জন্ম-লগ্ন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ তথ্য সরবরাহ করা।

বর্ত্তমান সঞ্চয়নের 'এক-বক্তার বৈঠক'-প্রবন্ধটি ব্যতীত বাকিগুলি ১৩৫৪ হইতে ১৩৫৬ সালের মধ্যে দ্বিতীয় নব পর্য্যায়ের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে তিনি বিদেশী কাব্যের মণিমুক্তা কাব্যচ্ছন্দে আহরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এইরূপ সংকলন ও অনুবাদ-কর্ম্মের সাক্ষাৎ তাগিদ অনুভব করেন নাই। বঙ্গদর্শন-সম্পাদকরূপে তিনি পাঠকদের নিকটে দুইটি দায়িত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন,—প্রথমতঃ 'অনুবাদের সাহায্যে বিদেশী সাহিত্য হইতে সাহিত্যরস-আহরণ'; এবং দ্বিতীয়তঃ 'বিদেশী সাহিত্যাচার্যগণের উৎকৃষ্ট উক্তি বা ভাবচিন্তার সুপরিমিত সঙ্কলন'। এই দ্বিবিধ উপায়ে বিদেশী সাহিত্যের সত্যকার উৎকৃষ্ট সৃষ্টিসমূহ যুগে যুগে যাহা বহু রসিকের রসপিপাসা চরিতার্থ করিয়াছে তাহারই যৎসামান্য মাতৃভাষায় পরিবেষণ করিয়া বাঙালী পাঠকের রসবোধ ও সাহিত্যজ্ঞান প্রবুদ্ধ করিতে সেই বৃদ্ধ বয়সে ও ভগ্ন স্বাস্থ্যে তিনি কিরূপ দুরূহ ব্রত পালন করিয়াছিলেন—এই প্রবন্ধগুলি তাহার সাক্ষ্য দিবে। সেদিন ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে আমাদের নিকটে যাহা

অতিশয় দুঃসাধ্য ও সুকঠিন শ্রমকর্ম্ম বলিয়া মনে হইয়াছে তিনি তাহা এমনই অবলীলায় সম্পন্ন করিতেন যে উহা যেন তাঁহার অবসরবিনোদনের একটি উপায় মাত্র ছিল। ইহার কারণ এই বলিয়া মনে হয় যে কি প্রাচীন, কি আধুনিক দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের উৎকৃষ্ট ভাবচিন্তা ও রসের জগতে তিনি এমনই সচ্ছন্দে বিচরণ করিতেন এবং দিবারাত্র মশগুল থাকিতেন যে একাত্মবোধের সেই অসীম প্রত্যয়ানন্দজনিত ঐরূপ অনুবাদ-কর্ম্মও একটা যান্ত্রিক শ্রমকর্ম্ম না হইয়া মৌলিক সৃষ্টিসুলভ সৌরভ ও স্বাদযুক্ত হইত। বস্তুতঃ মূলরচনার ভাবচিন্তার সহিত অনুবাদকের একাত্মবোধ এবং সেই সঙ্গে উৎকৃষ্ট ভাষাজ্ঞান যুক্ত না হইলে সার্থক অনুবাদ সম্পন্ন হইতে পারে না। এইজন্য একহিসাবে এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে গ্রন্থকারের নিজস্ব সাহিত্যিক রুচি ও রসবোধেরও একটা প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আরও একটি তথ্য স্মরণযোগ্য যে কেবল অনুবাদ মাত্র নহে 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্রে'র মত বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয় মৌলিক সৃষ্টিমূলক সমালোচনা-গ্রন্থটিও বঙ্গদর্শনে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইতেছিল। এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে চাই; তাহা ভূমিকা-লেখকের পক্ষে স্পর্দ্ধা বলিয়া মনে হইলেও আশা করি অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে না। আদি বঙ্গদর্শন-সম্পাদক, স্রষ্টা ও যোদ্ধারূপী বঙ্কিমচন্দ্রকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে অভিধেয় দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় নব পর্য্যায় বঙ্গদর্শনের স্রষ্টা ও যোদ্ধারূপী সম্পাদক সম্বন্ধেও যে উহা কিরূপ সমান প্রযোজ্য, মোহিতলালের ভবিষ্যৎ-জীবনীকার তাহা স্মরণ করিবেন। ঢাকা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতা ফিরিবার পর পুরাতন মিত্রামিত্রেরা যাঁহাকে অবসিতশক্তি মনে করিয়াছিলেন, বঙ্গদর্শন-সম্পাদকরূপে তাঁহার শক্তির চকিত ও বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা যুগপৎ বিস্মিত ও হতাশ্বাস হইয়াছিলেন। সাহিত্য ও সমাজ, দেশ ও জাতির সেই সংকট-মুহূর্ত্তে সকল বিরুদ্ধতা ও প্রতিকূলতার সম্মুখে একক দাঁড়াইয়া তিনি যে অকুতোভয়তা, গভীর মনস্বীতা ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা সত্যই বিস্ময়ের বস্তু। উনবিংশ শতাব্দীর সেই চারিত্রশক্তি যে সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই, একজন জরাজীর্ণ সহায়সম্বলহীন বৃদ্ধ বাঙালীর মধ্যে তখনও অবশিষ্ট ছিল, সেদিন বঙ্গদর্শনে তাহারই একটি অভ্রান্ত সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছিল। ইহার পর যখন কোন প্রবীণ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির মুখে শুনিতে পাই যে মোহিতলালের সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তব্য ফুরাইয়া গিয়াছিল বলিয়াই তিনি শেষ জীবনে সাহিত্য ত্যাগ করিয়া রাজনীতির আশ্রয় লইয়াছিলেন, তখন

সেই উক্তিকে নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়, যুক্তিহীন এবং সত্যবিরোধী বলিয়া বাতিল করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

পরিশেষে 'এক-বক্তার বৈঠক' প্রবন্ধটির সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিবেদন করিয়া ভূমিকা শেষ করিব। প্রবন্ধটি মূল গ্রন্থের প্রবন্ধাকারে সংকলন মাত্র, সম্পূর্ণ অনুবাদ নহে। 'বিদেশী ছোটগল্প সঞ্চয়ন' প্রকাশিত হইবার কিছুকাল পর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির একটি সঞ্চয়ন প্রকাশ করিবার গ্রন্থকারের ইচ্ছা হয়। এইরূপ প্রবন্ধ পুস্তক গল্প-উপন্যাসপ্রিয় পাঠক-সমাজে তেমন আদৃত হইবে না জানিয়াও কেবলমাত্র তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম আন্তরিক প্রীতি ও সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাবশতঃ কমলা বুক ডিপো প্রবন্ধ-সঞ্চয়নটি প্রকাশ করিতে সম্মত হন। কিন্তু বঙ্গদর্শনের ঐ কয়েকটি প্রবন্ধে গ্রন্থখানি বড় ক্ষীণকায় হইয়া পড়ে দেখিয়া গ্রন্থকার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক সাহিত্যকর্ম্ম ও অপরবিধ রচনাকার্য্যের ফাঁকে ফাঁকে এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি সংকলন ও অনুবাদ করেন। পরে মৃত্যুর মাত্র তিন মাস পূর্ব্বে গত বৈশাখ মাস হইতে তিনি যে একটি নূতন পত্রিকার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন, সেই 'বঙ্গভারতী'র পৃষ্ঠায় প্রবন্ধটি ছাপা হইতে থাকে। তখন প্রবন্ধের ঐ 'এক-বক্তা' কথাটি লইয়া গোলদীঘির জনৈক পণ্ডিতমশায় লেখকের প্রতি একটু রস-কটাক্ষ করেন। সে যাহা হউক, এই প্রবন্ধটির যে পৃথক উল্লেখ ও আলোচনা করিতেছি তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। মার্কিণ লেখকের ঐ গ্রন্থ সাহিত্যের একখানি উৎকৃষ্ট ক্লাসিক বলিয়াই যে গ্রন্থকার অনুবাদ করিবার প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন তাহাই নহে, আমার মনে হয়, ঐ 'এক-বক্তা'র সহিত তাঁহার ব্যক্তি-প্রকৃতি ও সাহিত্যিক জীবনের এমন একটি নিগূঢ় ও নিবিড় সমধর্ম্মিতা রহিয়াছে যে তিনি সজ্ঞানে না হৌক অজ্ঞানে উহার অনুবাদ-কার্য্যে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিজ সাহিত্যিক জীবনের অন্তরতর কাহিনীটি যেন এক ভিন্ন দেশের ভিন্ন কবির জবানীতে ব্যক্ত হইয়াছে। যাঁহারা বৈঠকী মোহিতলালের সাক্ষাৎ পরিচয় অবগত আছেন, ঐ autocrat বা এক-বক্তা যে মোহিতলাল স্বয়ং তাহা তাঁহাদের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। এবং প্রবন্ধটির ভিতরে প্রবেশ করিলে আরও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে ঐ autocrat-এর মতই তাঁহার সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার নির্ভীকতা এবং প্রজ্ঞা ও রসবোধের দীপ্তিতে উক্তিগুলির মৌলিকতা ও সরসতা অন্তরঙ্গদের নিকটে তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের পাত্র করিয়া তুলিয়াছিল। 'এক-বক্তা'র মত তাঁহারও

বক্তব্য ছিল যেন ইহাই—'এই জীবন সম্বন্ধে আমি এমন কিছু বলতে বা লিখতে পারি যা পড়বার বা শোনবার মত। যা বলছি এখন তা সঙ্গে করে নিয়ে যাও, পরে ভেবেচিন্তে যা করবার করো।'

ভূমিকা শেষ হইল; আশঙ্কা হইতেছে আমি আমার দায়িত্ব যথাযথ পালন করিতে পারি নাই—গ্রন্থ অপেক্ষা গ্রন্থকারের পরিচয় দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি ভরসা আছে সহৃদয় পাঠকের নিকটে গ্রন্থকারের এই পরিচয় বিরক্তিকর হইবে না। কারণ, এই সেদিনও যিনি ছিলেন, তিনি আজ আর নাই; কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়া আছে, থাকিবেও এবং কালে কালে কত পাঠকের সঙ্গে তাহাদের ভাববিনিময় হইবে। সুতরাং আজিকার কথা স্বতন্ত্র, আজ গ্রন্থ নয় গ্রন্থকারের কথা ভাবিতে, বলিতে ও শুনিতে প্রাণ চায়।

সিটি কলেজ, কলিকাতা
৺শ্যামাপূজা, ১৩৫৯

শ্রীমথুরেন্দ্রনাথ নন্দি

সূচীপত্র

পৃষ্ঠাঙ্ক

১ । শিল্পী ও সমালোচক ··· (*Oscar Wilde*) ··· ১

১ । সভ্যতা ··· (*Clive Bell*) ··· ৫৭

৩ । এক-বক্তার বৈঠক ··· (*O. W. Holmes*) ··· ১১৭

৪ । গ্রন্থরচনা ও রচনারীতি ··· (*Schopenhauer*) ··· ১৭৬

৫ । কথাসাহিত্যে প্রকৃতি-পন্থা ··· (*Emile Zola*) ··· ১৯১

৬ । প্রেমের গূঢ়তত্ত্ব ··· (*Schopenhauer*) ··· ২০২

বাঙ্‌লা সাহিত্যে মোহিতলালের অবিস্মরণীয় দান

প্র ব ন্ধ ও স মা লো চ না

কবি শ্রীমধুসূদন * বঙ্কিম-বরণ * বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস * রবি-প্রদক্ষিণ * কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য * শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র * আধুনিক বাংলা সাহিত্য * সাহিত্য কথা * বাংলার নবযুগ * সাহিত্য বিতান * বাংলা কবিতার ছন্দ * জীবন-জিজ্ঞাসা * বাংলা ও বাঙালী * বাংলা প্রবন্ধ ও রচনা-রীতি * জয়তু নেতাজী

কবিতা

বিস্মরণী

স্মর-গরল

হেমন্ত-গোধূলি

স্বপন-পসারী

ছন্দ-চতুর্দ্দশী

(সনেট-গুচ্ছ)

অ নু বা দ

বিদেশী প্রবন্ধ-সঞ্চয়ন

বিদেশী ছোটগল্প-সঞ্চয়ন

বিদেশী কাব্য-সঞ্চয়ন (যন্ত্রস্থ)

—: সম্পাদনা :—

অভয়ের কথা ● কাব্য-মঞ্জুষা (ছোট) ● কাব্য-মঞ্জুষা (বড়) [যন্ত্রস্থ]

শিল্পী ও সমালোচক

(দুই বন্ধুর কথোপকথন)

প্রথম পর্ব্ব

[বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক, কবি ও নাট্যকার, অস্কার ওয়াইল্ড্ (Oscar Wilde)-লিখিত শিল্প ও সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা। যেন সাহিত্যিক ও কলাশিল্পবিদ্ দুই বন্ধু উচ্চাঙ্গের কাব্যালোচনা করিতেছেন—এই ভঙ্গিতে, লেখক তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, শিল্প ও সাহিত্যজ্ঞান, এবং কবিত্বময় অথচ শাণিত রসিকতার সহিত, নানা প্রসঙ্গে নিজের স্বাধীনচিন্তা, ও ততোধিক চমকপ্রদ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। লেখক প্রমাণ করিতে চান যে, শুধুই কবি বা শিল্পীই সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করেন না, যিনি সমালোচক তিনিও কবি, তাঁহার সেই সমালোচনাও একপ্রকার রসসৃষ্টি। মূল ইংরেজী গদ্যের ভাষায়—ভাব, চিন্তা ও সুর বা কাব্যচ্ছন্দ, এই তিনেরই সার্থক সম্মিলন ঘটিয়াছে, এজন্য লেখক কেবল কথায় নয়—কাজেও তাঁহার ঐ মতটিকে সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই রচনাতেও পাঠক-পাঠিকাগণ এক বিষয়ে লেখকের বহুবিদিত প্রতিভার পরিচয় পাইবেন—প্রচলিত মতের ঠিক বিপরীতটাকেই উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিবার শক্তি ; তাহাতেই তাঁহার উক্তিগুলি সময়ে সময়ে গভীরতর সত্যে ঝলসিয়া উঠে।]

স্থান — লণ্ডন পিকাডিলির একটি সুসজ্জিত গৃহ। কাল — রাত্রি।

গিলবার্ট (পিয়ানো বাজাইতেছিলেন)। তুমি এত হাসছ কেন বল দেখি ?

আর্নেষ্ট (বই হইতে মুখ তুলিয়া)। তোমার টেবিলে এই যে একখানা জীবন-স্মৃতির বই রয়েছে এর ভিতর একটা ভারি মজার গল্প পেয়েছি।

গি—কি বই ওখানা ? ওঃ, বটে ? ওখানা আমি এখনও পড়িনি। বইখানা কেমন—বেশ ভালো ?

আ—তুমি যতক্ষণ পিয়ানো বাজাচ্ছিলে ততক্ষণ আমি এই বইখানার পাতা উল্টে বেশ একটু আমোদ পাচ্ছিলাম,—যদিও আজকালকার এই সব স্মৃতি-কথা আমার আদৌ ভাল লাগে না। এসব যারা লেখে, হয় তাদের একেবারে স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে, নয়তো জীবনে তারা এমন কিছু করেনি যা' মনে থাকবার মত। সেইজন্যেই তাদের লেখা লোকে এত পড়তে চায় ; কারণ, এ দেশের লোক সেইসব লেখকের লেখা পড়ে তৃপ্তিবোধ করে, যাদের মাথা আর পাঁচজনেরই সমান।

গি—হাঁ, তা ঠিক ; সাধারণ পাঠক-পাঠিকার ক্ষমা-গুণ সত্যিই প্রশংসনীয় ; তারা সবাইকে ক্ষমা করতে পারে, কেবল প্রতিভাবান ব্যক্তিকে ছাড়া। কিন্তু যাই বল, ঐ স্মৃতিকথা বা আত্মচরিতগুলো আমার ভারি ভালো লাগে—বিষয়বস্তুর দিক দিয়েও যেমন, তেমনি—ওর ঐ ভঙ্গিটাও। বড়লোকদের আত্মজীবন-কাহিনী বড় বেশি পাওয়া যায় না ; যে দু'চারখানি পাওয়া গেছে সেগুলো যেমন লোভনীয়, তেমনি, পড়লে আর ভুলে যাবার যো নেই। রুসো (Rousseau) যে—কোনো গুরুঠাকুরের কাছে গোপনে তাঁর জীবনের যতকিছু পাপ স্বীকার না ক'রে, সেগুলো বাইরে সকলের কাছে প্রকাশ করেছিলেন, তার জন্যে জগৎবাসীর কাছে তিনি চিরদিন প্রীতির পাত্র হ'য়ে আছেন। না, সত্যি বলছি, আত্মজীবন-কাহিনীতে পাঠক মুগ্ধ না হ'য়ে পারে না। বাস্তব জীবনেও—মানুষের সুগভীর আত্মপ্রীতি কোন কোন দিক দিয়ে বেশ উপভোগ্য হয়ে থাকে ; লোকে যখন নিজের কথা বলে, তখন সে কথায় আপনা হতেই বেশ একটু রস এসে পড়ে ; পরের কথা বলতে গেলেই বেরসিকতা করে ফেলে। কেবল, বইএর মত—যদি তাদের ইচ্ছামত খুলে পড়া, আর ইচ্ছেমত বন্ধ করা যেত, তাহ'লে আরও ভাল হ'ত।

আ—তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর—প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের কথা নিজেই লিখবে ? তা হ'লে, এই যে সব এত কষ্ট করে' বড় বড় জীবন-চরিত লিখছে, এদের দশা কি হবে ?

গি—তাদের দশা যা' হয়েছে তা' তো দেখতেই পাচ্ছ ! তারা ত' একালের একটা আপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক বড়লোকেরই অনেকগুলো করে' শিষ্য থাকে, তাদের মধ্যে যে 'জুডাস' (অর্থাৎ, বিশ্বাসঘাতক) সেই তাঁর জীবন-চরিত রচনা করে।

আ—কি ভয়ানক কথা !

গি—না, ঐ কথাই সত্যি। সেকালে ভক্তেরা মহাপুরুষদের দেবতা করে' তুলত, একালে তাদের ভূত বানিয়ে ছাড়ে। উৎকৃষ্ট বইএর সস্তা সংস্করণ হওয়া ভালই, কিন্তু বড় বড় লোকদের এই রকম সস্তা সংস্করণ দেখলে ঘেন্না ধরে' যায়। যাক ওসব কথা, এখন একটু বাজাই শোন ; কি বাজাব—শোপ্যাঁ,

না ঘোরাক ? ঘোরাকের একটা খেয়ালী-গৎ বাজাই, এঁর রচনাগুলো ভারি উন্মাদকর—অদ্ভুত সব রঙের খেলা আছে।

আ—না, আমার এখন গান ভাল লাগবেনা—ঐ রাগ-রাগিণীগুলো আমার কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে, কোন-কিছুর স্পষ্ট প্রকাশ ওতে থাকে না। না, গিলবার্ট, তোমার বাজনা এখন থাক্‌, তুমি ফিরে বোস, একটু কথাবার্ত্তা চলুক। ভোরের শাদা আলো যতক্ষণ না ঘরের ভিতর দেখা দেয়, ততক্ষণ তুমি কথা বল—তোমার কণ্ঠস্বরে কেমন একটা যাদু আছে।

গি—(পিয়ানো হইতে উঠিয়া)। আজ রাতে আমার কথা বলতে ভাল লাগছে না—ঐ রকম বিশ্রী হাসি হেসোনা, বলছি! সিগারেট কই ? ধন্যবাদ। এই এক-পাটি ড্যাফোডিলগুলো কি সুন্দর! যেন হাতির দাঁত আর এ্যাম্বার-মণি দিয়ে গড়া! এদের দেখলে গ্রীক শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ জিনিষ-গুলির কথা মনে পড়ে। তুমি যে ঐ বইখানা প'ড়ে এত হাসছিলে—ওর সেই আত্মকথার কোনখানটা প'ড়ে ? তাতে কোন্ পাপকর্ম্মের জন্য ঐ মহাজ্ঞানী ব্যক্তিটি এমন অনুতপ্ত হয়ে উঠেছেন ? বল, শুনি। শোপ্যাঁর ঐ রাগিণীটি বাজাতে বাজাতে আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন কত পাপ করেছি, তার জন্যে কান্নায় বুক ভরে' উঠছিল! যেন এমন সব দারুণ ট্র্যাজেডি আমার জীবনে ঘটেছে যার শোক আমি ভুলতে পাচ্ছিনে। অথচ, কোনটাই আমার নয়! আমার বোধ হয়, কেবল গানেরই ঐ শক্তি আছে। গানের দ্বারাই এমন একটা বিগত-কালের সৃষ্টি হয়, যা আমাদের চেতনায় কখনো ছিল না; এমন সব দুঃখ প্রাণের ভিতরে ভিড় করে' আসে, যা' আমাদের চোখ কখনো অশ্রুময় করেনি। আমি এমনও কল্পনা করতে পারি যে, যে-লোক বরাবর একটা সাধারণ জীবন যাপন ক'রে এসেছে, সেও হঠাৎ কোথাও একটা অদ্ভুত সুরের আলাপ শুনে যেন নিজের অজ্ঞাতেই নিজের গভীরতম সত্তাকে আবিষ্কার ক'রে ফেলে। তার প্রাণে তখন কত রকমের মর্ম্মান্তিক অনুভূতি হ'তে থাকে—কত দুঃসাহসিক সুখ, কত উন্মত্ত রোমান্টিক প্রেম, কত বিরাট বৈরাগ্যের বাসনা। তার জীবনে যেন ঐ সকলই ঘটেছে! বল, আর্নেষ্ট, তোমার ঐ গল্পটা শুনি।

আ—গল্পটা তেমন কিছু নয়। তবে, ওর থেকে একটা চমৎকার প্রমাণ পাওয়া যায়—আজকাল যে ধরণের আর্ট-সমালোচনা হয়ে থাকে তার মূল্য

কতটুকু। একজন মহিলা নাকি কোন এক বিখ্যাত চিত্রকরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁর সেই ছবিগুলো তিনি কি হাত দিয়ে এঁকে থাকেন?

গি—সত্যিই কি তিনি হাত দিয়ে আঁকতেন?

আ—নাঃ, তোমাকে আর পারা গেল না! সে যাই হোক, তুমিই বল না, শিল্পীদের রচনা সমালোচনা করার কি দরকার? আর্টিষ্ট যা করে তাই করুক না। যদি কোন নতুন জগৎ সৃষ্টি করাই তার অভিপ্রায় হয়, তাই করুক না সে; কিম্বা যে-জগৎ আমরা সর্ব্বদা দেখতে পাচ্ছি তারই একটা প্রতিরূপ যদি প্রতিফলিত করতে পারে, সেই বা মন্দ কি? এই অতি-পরিচিত জগৎকে বেশ একটু নতুন করে' সাজিয়ে—তার নিজের পছন্দমত, সূক্ষ্ম নির্ব্বাচনী বুদ্ধি দিয়ে, যদি এটাকে একটু শোধন ক'রে না দেয়, তবে ওটা যে বড় একঘেয়ে হ'য়ে ওঠে! আর্টিষ্টরাই ত' তাকে একটা এক-মুহূর্ত্তের পরম-রমণীয়তায় উদ্ভাসিত করে' তোলে। আমার মনে হয়, কল্পনা জিনিষটার অবাধ স্ফূর্ত্তির জন্যে একটা বড় রকমের অবকাশ চাই—নির্ব্বাক নির্জ্জনতা চাই। সমালোচকদের তীব্র চীৎকার শিল্পীর সেই ধ্যান ভঙ্গ করবে কেন? যারা নিজেরা কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, তারা পরের সৃষ্টি-করা জিনিষের মূল্য বিচার করবার স্পর্দ্ধা করে কেন? তারা এ সবের জানে কি? কারো রচনা যদি এম্‌নিই বেশ বুঝতে পারা যায়, তা' হলে তার আবার ব্যাখ্যা কেন?

গি—আর, সেই রচনা যদি দুর্ব্বোধ হয় তা হ'লে ব্যাখ্যা করতে যাওয়াটাও অন্যায়।

আ—আমি তো তা' বলি নি।

গি—না বললেও বলা উচিত ছিল। একালে সকল বস্তুকেই এমন সুস্পষ্ট ও রহস্য-বর্জ্জিত করে' তোলা হয়েছে যে, যদি কোথাও একটু অস্পষ্টতার রহস্য এখনও লেগে থাকে, তবে সেটুকুকে হারাতে আমি রাজি নই। যাঁরা দৈবী-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তাঁদের শক্তির সেই অলৌকিকতা ব্যাখ্যার দ্বারা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ব্রাউনিঙের কথাই ধর না কেন। তাঁর কাব্যে যে একটা বাক্যাতীতকে বাক্যে প্রকাশ করার প্রয়াস আছে—সে কথা আর কেউ বলে না, বলে—তাঁর বলবার কিছুই ছিল না। আমি তাঁর রচনাবলীর অসম্বদ্ধতার কথাই বলছি। তবু সব দিক দিয়ে বিচার করলে বলতেই হবে, তিনি বড়দেরই একজন ছিলেন—দেবতার

মত পূর্ণশক্তির অধিকারী না হ'লেও দানবের মত অসম্পূর্ণ শক্তি তাঁর ছিল। মানুষের মনের অতি সূক্ষ্ম ও জটিল কলকব্জাগুলোই তিনি এত বড় করে' দেখেছিলেন যে, কোন ভাষাই তার বাহন হ'তে পারে না, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস; তাই তিনি তাঁর রচনায় ভাষাকে কিছুমাত্র খাতির করেন নি। ব্রাউনিঙের হাতে পদ্যের মিল জিনিষটাও যেন একটা তুচ্ছ আমোদের বস্তু হয়ে উঠেছিল। অথচ ঐ মিলই গিরিশিখরবাসিনী কাব্য-লক্ষ্মীর গিরি-কন্দরে অপরূপ প্রতিধ্বনির মত,—নিজ-কণ্ঠস্বর নিজেই সৃষ্টি করে', সে যেন নিজেই তার প্রত্যুত্তর করে। মিল ত' শুধুই ছন্দ-মাধুরীর একটা স্থূল উপকরণ নয়, ওর একটা আধ্যাত্মিক শক্তি আছে; বড় শিল্পীর হাতে পড়লে মিল আমাদের চিত্তে ভাবান্তর ঘটাতে পারে, ভিন্নতর ভাবের চমক দেয়—কেবলমাত্র ওই শিঞ্জন-ধ্বনির লালিত্যেই কোন একটা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের স্বর্ণ-দ্বার খুলে যায়, কল্পনাও যা খুলতে পারে নি। ওই একটি কৌশলের দ্বারা মানুষের ভাষাকে দেবতার ভাষায় পরিণত করা সম্ভব হয়েছে; গ্রীক কবিদের সেই বীণায় আমরা ঐ একটিমাত্র তার যোজনা করতে পেরেছি। তবু ব্রাউনিঙ কে বড়ই বলতে হবে। কিন্তু কিসে বড়? কবি হিসেবে নয়—নর-নারীর মানস-জীবনের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী হিসেবে। সেই কথার এত বড় শিল্পী বোধ হয় এ পর্য্যন্ত আর দেখা দেয় নি। নাটকীয় ঘটনা-সংস্থান সৃষ্টি করতে তাঁর জুড়ি নেই বললেও হয়। তিনি নিজে যে-সব সমস্যা উত্থাপন করেছেন, তার জবাব নিজেও দিতে পারেন নি বটে, কিন্তু সেই সমস্যা তিনি সকলের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন—শিল্পীর পক্ষে তাই ত' যথেষ্ট। চরিত্র-সৃষ্টির দিক দিয়ে বিচার করলেও, তাঁকে সেই আরেক জনের পরেই স্থান দিতে হবে—যিনি হ্যামলেট-চরিত্র সৃষ্টি করেছেন; যদি ঐ সঙ্গে তাঁর বাক্‌শক্তিও থাকত, তা' হলে তিনি একেবারে তাঁর পাশেই বসতে পারতেন। ব্রাউনিঙ গদ্যের পরিবর্ত্ত-হিসেবে পদ্যের ব্যবহার করেছেন।

আ—তুমি যা বলছ তার অনেকটা সত্যি বটে, কিন্তু সব সত্যি নয়—কতকগুলো বিষয়ে তোমার মত ন্যায়সঙ্গত বলে' মনে হয় না।

গি—যাকে ভালবাসি তার প্রতি একটু অবিচার না ক'রে পারি নে। কিন্তু তোমার কথাটা কি ছিল?—তুমি কি নিয়ে আরম্ভ করেছিলে?

আ—আর কিছু নয়, কেবল এই কথা—যেকালে শিল্পকলার চরম উৎকর্ষ হয়েছিল, সেকালে কোন সমালোচক ছিল না।

গি—দেখ, ও কথাটা আমি যেন আগেও শুনেছি। কথাটা পুরোনো বন্ধুর মতো নবত্বহীন, আব মূর্খতার মতই দীর্ঘজীবী।

আ—না, কথাটা অতিশয় সত্য—নিশ্চয়!—যতই তোমার অ-মনোমত হোক, যতই তুমি মাথা নাড়ো না কেন। শিল্পকলার সবচেয়ে উন্নতি হয়েছিল যে-যুগে—সে-যুগে তার কোন সমালোচক ছিল না। সেকালে শিল্পীরা ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। নদীর খাত থেকে তারা যে মিহিন মাটি তুলে আনতো, তার থেকেই—কেবল হাড়ের বা কাঠের টুকরো দিয়ে—এমন সব মনোহর পুতুল গড়ত, যা' তখনকার দিনের লোকেরা তাদের মৃত আত্মীয়-বন্ধুদের কবরের ভিতরে সাজিয়ে দিত—মৃতেরাও তাই নিয়ে খেলা করবে! এখনো টাঙ্গারার পাহাড়ের ধারে হলুদবর্ণ বালির নীচে যে সব পুতুল পাওয়া যাচ্ছে, তাদের মাথার চুলে, মুখের কোণে, পোষাকের পাড়ে ঘোর লাল রঙের ছাপ অস্পষ্ট হ'য়ে লেগে রয়েছে। সদ্য-গলানো প্লাষ্টারের একখানি দীর্ঘ চিত্র-ফলক তারা তৈরী করে নিত; স্যাণ্ডিক্সের গুঁড়ো দিয়ে, কিম্বা দুধ ও জাফরানে মিশিয়ে রং করত সেই প্লাষ্টার; সেই রং-করা প্লাষ্টারের ফলকে তারা যে সব ছবি তুলত, তাদের মধ্যে কোনটা স্বর্গের উদ্যানে ক্লান্তিমন্থর নগ্নপদক্ষেপে বিচরণ করছে—পায়ের নীচে রাশি রাশি রক্ত-নীল আস্ফোডেল-ফুল ফুটে রয়েছে, তাদের মাঝখানটি শাদা; কিম্বা সে হয়তো প্রিয়াম-দুহিতা পলিক্সেনার ছবি—যার আঁখিপল্লবের মধ্যে সমস্ত ট্রয়-যুদ্ধ যেন আসন্ন হয়ে রয়েছে! তারা জীবনের কোন ছবিই বাদ দেয়নি। বাজারে বসে' কেনা-বেচা করছে দোকানদার; পাহাড়ের ধারে মেষ চরাচ্ছে গায়ে-চাদর-মুড়ি-দেওয়া রাখাল; বনে 'লরেল'-গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ছে বন-দেবী, নিস্তব্ধ দুপুরে বাঁশি বাজাচ্ছে বন-দেবতা। সবুজ পর্দ্দায়-ঢাকা চতুর্দ্দোলে চলেছেন কোন রাজা, বাহকদের কাঁধগুলা তেলে চকচক করছে, ময়ুরপুচ্ছের পাখা দিয়ে ক্রীতদাসেরা তাকে ব্যজন করছে। মুখে হাসি এবং চোখে অশ্রু নিয়ে নরনারীর দল তাদের সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে, তারা সেই সব মুখ ভাল ক'রেই দেখেছে—সেইসব প্রাণের গোপন কথা তাদেরও আপন কথা হয়ে গিয়েছে। তারা রূপ ও রঙের

সাহায্যে একটা নতুন জগৎ সৃষ্টি করেছিল। কোন বাজে কথায় তাদের বিরক্ত হ'তে হয়নি, তাদের কাজ তারা আপন মনেই করে' গিয়েছে। গ্রীকদের মধ্যে কোন শিল্প-সমালোচক ছিল না।

গি—আর্নেষ্ট, তোমার কথাগুলি বড়ই শ্রুতিমধুর, কিন্তু মতামত বড়ই যুক্তিহীন। আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি বোধ হয় কোন বয়সে-বড় ব্যক্তির মুখে এই সব কথা শুনে থাকবে। ঐ কাজটি বড়ই বিপদজনক,—ওটা যদি তোমার একটি অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়, তা'হলে তোমার চিন্তাশক্তির দফা একেবারেই রফা হয়ে যাবে। আজকালকার সাময়িক-সাহিত্যে যে-সব মত প্রচারিত হয়ে থাকে, তার স্বপক্ষে কিছু বলা আমার কর্ম্ম নয়। ডারুইন যে মস্ত একটা নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন যে,—যারা সব চেয়ে ইতর ও স্থূলবুদ্ধি তারাই টিঁকে থাকে—সেই নিয়মের জোরেই ওগুলোও টিঁকে আছে, এবং থাকবে। আমি খাঁটি সাহিত্যের কথাই বলছি।

আ—সাহিত্য, আর ঐ সাময়িক প্রয়োজনে যা লেখা হয়, তার মধ্যে তফাৎ কি ?

গি—একটা পড়বার উপযুক্ত নয়, অপরটা কেউ পড়ে না, এইমাত্র। তবে তোমার ঐ যে মত—গ্রীকদের ভিতরে কোন শিল্প-সমালোচক ছিল না, ওটা অতিশয় ভ্রান্ত। বরং এই কথা বললেই যথার্থ হবে যে, গ্রীক-জাতটাই ছিল সমালোচকের জাত।

আ—বল কি ?

গি—হাঁ, জাতটাই আর্ট-সমালোচকের জাত। কিন্তু গ্রীক-শিল্পীর সঙ্গে সেকালের সমালোচকের যে সম্বন্ধ ছিল, তাকে তুমি যে রকম অবাস্তব-রমণীয়তায় মণ্ডিত করেছ—তোমার ঐ চমৎকার বর্ণনাটি—আমি নষ্ট করতে চাই নে। যা' কখনো ঘটেনি তারই একটা অতিশয় নিখুঁত ও যথাযথ বিবৃতি দেওয়াই যেমন ঐতিহাসিক মাত্রের যথার্থ কাজ, তেমনই, যার একটু বিদ্যাবুদ্ধি ও রসবোধ আছে তারও ঐ রকম গল্প তৈরী করবার অধিকার নিশ্চয় আছে। তবু আমি পণ্ডিতী ধরণে কথা কওয়া পছন্দ করিনে। পণ্ডিতী আলাপ কেবল তারাই ক'রে থাকে—যারা নিজেদের মূর্খতা গোপন করতে চায়, কিম্বা যাদের মস্তিষ্ক-চালনা করবার মত আর কোন কাজই নেই। না, এসো, তোমাকে ঘোরাকের একখানা গৎ বাজিয়ে শোনাই—খুব পাগল-করা রকমের, যাকে বলে লাল—টকটকে। দেওয়ালের

পর্দায়-আঁকা ঐ মূর্ত্তিগুলো বিবর্ণ দেখাচ্ছে—তবু কেমন হাসি-মুখে চেয়ে আছে! আর ঐ ব্রোঞ্জের নার্শিসাস্‌টা—ওর চোখের পাতা ঘুমে ভারি হয়ে উঠেছে। এখন ওসব গম্ভীর আলোচনা থাক্। দেখ, আমরা যে যুগে জন্মেছি সে যুগে যার কথা যত নীরস, তাকেই লোকে তত চিন্তাশীল বলে' খাতির করে—আমার সবচেয়ে ভয়, পাছে লোকে আমার কথার উল্টো-মানে না করে। তুমিও আমার এমন অবস্থা কোরো না যে, আমার মুখ দিয়ে কেবল কাজে-লাগবার মত কথাই বেরুতে থাকে। মানুষকে শিক্ষা দেওয়া অবিশ্যি খুব ভাল কাজ, কিন্তু এটাও মাঝে মাঝে স্মরণ করা উচিত যে, যে-বস্তুর সত্যিকার কোন মূল্য আছে—তা কাউকে শিখিয়ে দেওয়া যায় না। জান্‌লার পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে, আমি চাঁদটাকে দেখতে পাচ্ছি—ঠিক যেন কাঁচি-দিয়ে কাটা এক টুকরো রূপোর পাত। তারাগুলো যেন সোনালী রঙের ভোমরা—ওকে ঘিরে রয়েছে। আকাশটা যেন একটা প্রকাণ্ড নীলকান্ত-মণি,—কঠিন পাথরখানা কুঁদে' ভিতরটা ওই রকম গোল করে তুলেছে! চল, বেরিয়ে প'ড়ে ঐ রাত্রির রূপে অবগাহন করা যাক। ব'সে ব'সে মনের সঙ্গে খেলা করা বড়ই চমৎকার লাগে বটে, কিন্তু না ভেবে-চিন্তে যে-কোন একদিকে বেরিয়ে পড়া আরও রোমাঞ্চকর।

আ—তোমার মত খেয়ালী মানুষ দেখিনি! আমি আজ তোমায় ছাড়ছিনে, ঐ আলোচনাটা তোমাকে শেষ করতেই হবে। তুমি যে বললে, গ্রীকরা সকলেই ছিল আর্টের সমজদার—আচ্ছা, সমজদারীর কি প্রমাণ তারা রেখে গেছে?

গি—কি জানো বন্ধু, গ্রীকরা যদি তাদের সেই সমালোচনা-শক্তির কিছুমাত্র নিদর্শন রেখে না-ও যেতো, তবু বলতে হবে যে, তারা যেমন আর সব বিষয়েরও শাস্ত্র রচনা করে' গেছে, তেমনি, এই শিল্পকলা-বিচারের শাস্ত্রও তাদের মাথা থেকেই বেরিয়েছিল। আমরা কোন্ বস্তুটির জন্যে গ্রীকদের কাছে সবচেয়ে ঋণী?—সে আর কিছু নয়, ঐ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিটি তারা যেমন—ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, অধ্যাত্ম-বিদ্যা, রাজনীতি, শিক্ষাবিজ্ঞান—সকল বিষয়ে প্রয়োগ করেছিল, তেমনি, আর্টের উপরেও করেছিল; যে দুটো কলাশিল্প সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাদের সম্বন্ধেই অত্যন্ত নির্ভুল শাস্ত্র রচনা করে গেছে তারা।

আ—সে দুটি বস্তু কি?

গি—মানুষের জীবন, আর সাহিত্য; জীবন আর জীবনের নিখুঁত প্রকাশ। মানুষের জীবন সম্বন্ধে গ্রীকরা যে সব নীতি স্থির ক'রে দিয়েছিল, একালে এত মিথ্যার উপাসনা করে' আমরা তার মূল্য বুঝতে পারবো না। কিন্তু অপরটির বিষয়ে যে-সব বিধি তারা নির্দ্দেশ ক'রে গিয়েছে—অনেক জায়গায় তা' এত সূক্ষ্ম যে, আমরা বুঝতেই পারিনে। তারা ঠিকই ধারণা করেছিল যে, যে-শিল্প মানুষের জীবনের অনন্ত বৈচিত্র্যকে আয়নার মত প্রতিবিম্বিত করতে পারে, সেই শিল্পই শিল্পকলার চরম; তাই তারা ভাষাকে নিয়ে সমালোচনার চূড়ান্ত করেছিল। এই ধর—গদ্য। ঐ গদ্যের ছন্দটাকে তারা যে-রকম ক'রে রীতিমত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, বোধ হয়, আজকালকার স্বরশিল্পীরাও তাদের স্বরসঙ্গতি-বিচারে ততখানি সৌন্দর্য্য-বোধের পরিচয় দেয় না। ছাপাখানা সৃষ্টি হওয়ার পর, এদেশের মধ্য ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যে সর্ব্বনেশে বইপড়া-রোগ ক্রমেই বেড়ে উঠল—তার ফলে, সাহিত্যকে কান দিয়ে শোনার অভ্যাস উঠে গেল, সবাই তাকে চোখ দিয়ে গিলতে লাগল। অথচ, কলাশিল্প-হিসেবে কাব্য উপভোগ করবার একমাত্র ইন্দ্রিয় হ'ল—কান; ঐ কানকে খুসী করার যে-সব উপায় আছে, কাব্য রচনা করতে হয় তার দিকে লক্ষ্য রেখে। এখন আমরা লেখাটাকেই একটা রীতিমত শিল্পকলা করে তুলেছি—ঐটেই হয়েছে একরকম নক্সা-বোনার কাজ। গ্রীকরা কিন্তু তা' করেনি; তাদের কাছে লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—কাব্যগুলোকে হারিয়ে যেতে না দেওয়া। তারা রচনার গুণ যাচাই করত তার কথাগুলোর আওয়াজ ধরে'—তার ছন্দ, তার শব্দগুলোর মধ্যে পরস্পরের স্বর-সঙ্গতি কেমন হয়েছে, এই সব দেখত। কণ্ঠস্বরটাই ছিল কাব্যের বাহন, আর কানই ছিল যাচনদার। আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, ঐ যে হোমারের অন্ধ-হওয়ার কথা—ওর একটা রূপক অর্থ আছে; ওই গল্পটা—পরে যখন কাব্যের সমালোচনা আরম্ভ হয়—তখনই তৈরী হয়েছিল। ওর মানে এই যে, খুব বড় কবি যাঁরা তাঁরা যে কেবল দ্রষ্টা—কেবল যে অন্তশ্চক্ষু দিয়েই তাঁরা সব দেখতে পান—তা নয়, তাঁরা গায়কও বটে; তাঁরা তাঁদের গান গ'ড়ে তোলেন স্বরের সাহায্যে, প্রত্যেক লাইনটি তাঁরা বার বার আবৃত্তি করেন—যতক্ষণ না তার অন্তর্নিহিত সঙ্গীতটি কাণে ধরা পড়ে; যে কথাগুলো আলোয় পাখা মেলবে, সেগুলো

তাঁরা অন্ধকারেই সুরময় ক'রে তোলেন। ঠিক এই কথাটা সত্যি না হতে পারে, কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন একটা কারণেই হোক, বা একটা যোগাযোগেই হোক—ইংলণ্ডের মহাকবি অন্ধ-দশাতেই তাঁর শেষ বয়সের কবিতার মহান ছন্দ—সেই অপরূপ সুরের গরিমা লাভ করেছিলেন। মিলটন যখন আর লিখতে পারতেন না, তখনই তিনি গাইতে সুরু করেছিলেন। তিনি যখন অন্ধ হলেন তখন তিনি যে সুর রচনা করতে লাগলেন—কণ্ঠস্বরই ছিল তার একমাত্র সহায়, আর তাই হওয়াই উচিত। এ কথা মানতেই হবে যে, ঐ লেখার অভ্যাসটাই সাহিত্যিকদের কাল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে; আমাদের আবার সেই কণ্ঠস্বরের শরণাপন্ন হতে হবে, তার দ্বারাই সব কিছু যাচাই করতে হবে; তা হলেই, গ্রীকদের শিল্প-সমালোচনায় যে সব সূক্ষ্ম নীতি ছিল, তা আমরা বুঝতে পারব। তুমি কিন্তু আমাকে ফরমাস করে' বোসো না—প্লেটো থেকে প্লোটিনাস পর্য্যন্ত যত গ্রীক সমালোচনা-শাস্ত্র লেখা হয়েছে তাদের ধারাবাহিক বিবরণ দিই। আজকের রাত্তিরটা এত চমৎকার যে, ওসব আলোচনা এখন মোটেই ভাল লাগবে না; ঐ চাঁদও যদি আমাদের এই রকমের আলোচনা শুনতে পায়, তা' হ'লে ওর ওই ছাইমাখা মুখে আরও খানিকটা ছাই মেখে নেবে। শুধু একখানি খুব ছোট্ট রসশাস্ত্রের কথা বলতে পারো—আরিষ্টটলের 'কাব্যবিচার'—তা'তে সবই চূড়ান্ত ক'রে বলা হয়েছে। বইখানার রচনারীতি মোটেই ভাল নয়—যেন একটা বড় বক্তৃতার সূচী-হিসেবে কতকগুলো চিন্তা খুব সংক্ষেপে নোট করে' রাখা হয়েছে; কিম্বা একখানা বড় বই লেখবার আগে তার বিষয়টার কতকগুলো টুকরো-টুকরো অংশ লিখে রাখা হয়েছে। কিন্তু ওর ওই বিচার-পদ্ধতি আর লেখকের মনের সেই ভঙ্গিটি—একেবারে উৎকৃষ্টতম বললেই হয়। শিল্প-কলার দ্বারা সমাজের কি হিতসাধন হয়, তা'তে মানুষের কি রকম চিত্তোৎকর্ষ হয়, এবং চরিত্রগঠনেই বা তার কার্য্যকারিতা কতটুকু—এ সকল আলোচনা প্লেটো প্রায় শেষ করে গেছেন; কিন্তু আরিষ্টটলের এই বইখানিতে আর্টের যে বিচার করা হয়েছে, তা' চরিত্রনীতির দিক দিয়ে নয়,—একেবারে খাঁটি রসবস্তুর দিক দিয়ে। প্লেটোও অবিশ্যি খাঁটি রসের দিকটা বাদ দেন নি; আর্টের নানা অঙ্গ ও উপকরণ সম্বন্ধে তিনিও আলোচনা করেছেন।

তিনিই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম মানুষের প্রাণে সেই বাসনাটি জাগিয়ে দিয়েছিলেন, যে-বাসনা আমরা এখনও পূর্ণ করতে পারিনি—সেই জিজ্ঞাসা —সত্যের সঙ্গে সুন্দরের সম্পর্ক কি? বিশ্ববিধানের মূলে যে একটা চিন্তা-শক্তি এবং মঙ্গল-অভিপ্রায় আছে, তা'তে সৌন্দর্য্যের স্থান কোথায়? তিনি ভাব-বাদ (Idealism) ও বস্তু-বাদ (Realism)-এর যে-সব সমস্যা উত্থাপন ও মীমাংসা করেছিলেন—অধ্যাত্ম-চিন্তার ক্ষেত্রে তার থেকে বিশেষ ফল পাওয়া যায়নি বটে, কিন্তু সেই তত্ত্বগুলোকেই আর্টের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে দেখতে পাবে, তাদের মূল্য এখনও কিছুমাত্র কমে নি। কিন্তু আরিষ্টটল আর্টের 'তত্ত্ব' নিয়ে মাথা ঘামান নি; গ্যেটের (Goethe) মতই, আর্টের নানা-রূপ—যা' রচনায় ফুটে উঠে, তারই ব্যাখ্যা ও বিচার করেছেন—যেমন, তিনি ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে করেছেন। ট্র্যাজেডির প্রধান উপাদান হ'ল তার ভাষা; মানুষের জীবনই তার বিষয়-বস্তু; তার ক্রিয়ার জন্যে চাই একটা ঘটনা-ধারা; তাকে যে উপায়ে প্রকটিত করতে হবে, সে হ'ল রঙ্গমঞ্চ এবং সেই সংক্রান্ত যতকিছু; তার একটা কার্য্যকারণ-সূত্রও থাকা চাই—সেটা হচ্ছে প্লট (Plot) বা গল্পনির্ম্মাণের কৌশল; তারপর, সর্ব্বশেষে, মানুষের প্রাণে তার সেই রসোদ্দীপনের শক্তি; সেটা হবে—ভয় বা অনুকম্পার ভিতর দিয়ে একটা সুন্দর-বোধ। গ্রীক না হ'লে এত সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ আর কেউ করতে পারত? শিল্প-সমালোচনার যা' কিছু—সব আমরা গ্রীকদের কাছ থেকেই পেয়েছি। তাদের রসবোধ যে কত সূক্ষ্ম ছিল, তার একটা প্রমাণ হচ্ছে এই যে, রচনার যে-উপাদানটি তারা বিশেষ পরীক্ষা ক'রে দোষগুণ বিচার করত, সে হচ্ছে —ভাষা; এ কথা আমি তোমাকে আগে বলেছি। যে ছবি আঁকে, বা যে মূর্ত্তি গড়ে, তার শিল্পকর্ম্মের উপাদান—ভাষার তুলনায় অতি সামান্য বলতে হবে। ভাষা বা বাক্ সর্ব্বশক্তিমান; তার দ্বারা বীণা বা বেহালার মত সঙ্গীত উৎপন্ন করা যায়; এমন ছবি আঁকা যায়—যা' স্পেন বা ভেনিসবাসী কোন চিত্রকরের আঁকা অতুল চিত্রপটের চেয়ে চোখকে কম খুসী করে না; এবং তার দ্বারা যে মূর্ত্তি গ'ড়ে দেওয়া যায়—তা'ও ব্রোঞ্জ বা মর্ম্মর-পাথরে-গড়া কোন মূর্ত্তির চেয়ে কম সুঠাম বা সুডৌল নয়। কিন্তু এসকল ছাড়াও, ঐ বাক্যের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় মানুষের ভাবনা, কামনা, তার আত্মার

আকৃতি,—আর কিছু দ্বারা তা' হয় না। কিন্তু না, আর নয়; ঐ দেখ, চাঁদটা একখানা মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ছে—গন্ধকের মত ফিকে-হলুদরঙের একখানা মেঘ। কিম্বা, সিংহের কেশরের যেমন রং, মেঘখানাও সেই রংঙের—সেই কেশরের ভিতর দিয়ে সিংহের একটা চোখ যেন চেয়ে রয়েছে। ওর ভয় হয়েছে, আমি বুঝি কেবল তোমার সঙ্গে কথাই কইব। কিন্তু ভয়ের কোন কারণ নেই, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—যত সব দূর-কালের অস্পষ্ট, অর্দ্ধেক-জানা, নীরস তথ্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি! এখন আমার পক্ষে, দেবতার অমৃতপানের মত যে একমাত্র সুখ-সম্ভোগ—সে হচ্ছে, আর একটা সিগারেট। সিগারেটের অন্ততঃ একটা গুণ আছে—অতৃপ্তিটা নষ্ট হয় না।

আ—আমার সিগারেট একটা দেখ না—কেমন লাগে? এগুলো সত্যিই ভালো—আমি একেবারে কাইরো থেকে আনাই। * * *

আচ্ছা, আমি স্বীকার করছি যে, গ্রীকদের সম্বন্ধে আমি যা' বলেছি তা' ঠিক হয় নি, তুমি যা' বলেছ তাই ঠিক—ওদের জাতকে-জাতই ছিল আর্ট-ক্রিটিক। আমি তা' মেনে নিলাম; অবিশ্যি সেই সঙ্গে তাদের জন্যে একটু দুঃখিতও হচ্ছি, কারণ, বিচারশক্তির চেয়ে সৃষ্টিশক্তি ঢের বড়—ও দু'য়ের মধ্যে তুলনাই হয় না।

গি—ওই যে দুটোকে বিপরীত মনে করা—ওটা নিতান্তই যুক্তিহীন। বিচার-বুদ্ধি না থাকলে কোনরকম শিল্প-সৃষ্টি হইতে পারে না—অন্ততঃ, যে-রচনার কিছু মূল্য আছে। একটু আগেই তুমি বলছিলে যে, শিল্পী তার সূক্ষ্ম নির্ব্বাচনী-বুদ্ধি দিয়ে ও নিজের পছন্দমত জীবনকে আমাদের চক্ষে নতুন করে ফুটিয়ে তোলে—তাকে এক-মুহূর্ত্তের একটা পরম-রমণীয়তা দান করে। তবেই হ'ল, ওই যে বাছাই করে' নেবার সূক্ষ্ম বুদ্ধি, এবং বাদ দেবার নিপুণতা—ওই ত' হচ্ছে মনের একটা বিশিষ্ট বিচার-বৃত্তি। ওই বৃত্তি যার নেই, সে আবার কলা-শিল্পের কোন কাজ করবে কেমন করে'? ম্যাথ্‌-আর্ণলড্‌ যে বলেছিলেন, সাহিত্য হচ্ছে 'জীবনেরই সমালোচনা'—বলার ভঙ্গিটা খুব ভাল হয়নি বটে—কিন্তু ওর দ্বারা প্রমাণ হয়, তিনি সকল সৃষ্টিকর্ম্মের মধ্যে ঐ বিচার-বৃত্তির ক্রিয়াটাও কত গভীর করে' উপলব্ধি করেছিলেন।

আ—আমি হ'লে বলতাম—বড় বড় কবি ও শিল্পীরা একরূপ অজ্ঞানে তাদের কর্ম্ম করে' থাকেন; বলতাম, তাঁরা যে কত জ্ঞানী, তা' নিজেরাও জানতেন না— এমার্সন এই রকম কথাই এক জায়গায় বলেছেন বলে' স্মরণ হচ্ছে।

গি—কথাটা তাই নয়, আর্নেষ্ট। সব রকম সূক্ষ্ম কলা-কীর্ত্তিই সজ্ঞানে, স্পষ্ট অভিপ্রায়ের বশেই সম্পন্ন হয়। গান-গাওয়াটা কবির স্বভাব ব'লেই যে কবিরা গান গায়, তা' নয়—অন্ততঃ যারা বড় কবি তাদের সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। কবিরা যে গান গায় তার কারণ, তাদের গান গাইতে ইচ্ছে হয়। চিরদিন তাই হয়ে আসছে। আমাদের একটা ধারণা আছে যে, কাব্যের আদি জন্মকালে কবিতার সুর এখনকার চেয়ে ঢের বেশি সরল, স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও তাজা ছিল; তার কারণ, যে-জগতে সেই আদিকালের কবিরা বিচরণ করতেন, যে-প্রকৃতির শোভা দেখে তাঁরা মুগ্ধ হতেন, তার নিজেরই একটা এমন রূপ ছিল যা' আপনা-আপনি কবিতা হ'য়ে উঠত—কবিকে আর তা' একটুও মেজে-ঘষে' নিতে হ'ত না। কবিতাদেবীর প্রিয় নিকেতন সেই অলিম্পাস (Olympus) এখন ঘন-তুষারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে; পাহাড়ের উঁচু খাড়া পাশগুলো তৃণহীন, রুক্ষ, নিরানন্দকর হয়েছে; কিন্তু আমরা কল্পনা-চক্ষে দেখতে পাই, সুন্দরী কলা-লক্ষ্মীরা উষাকালে সেই ভূমির উপর বিচরণ করছেন, তাঁদের অমল কোমল পদপল্লব দিয়ে আনিমোনি (Anemone)-ফুলের শিশির মুছিয়ে দিচ্ছেন। আবার, সন্ধ্যাকালে গোধূলির আলোকে সেখানে আপোলো এসে দাঁড়িয়েছেন, মেষপালকদের ডেকে গান শোনাবার জন্যে। কিন্তু এসব আমাদেরই কল্পনা, আমরাই সেই অতিদূর অতীতকে আমাদের মনের-মোহের মাধুরী দিয়ে মণ্ডিত করি। আমরা ইতিহাস মানি নে। যে-সব যুগকে আমরা কবিতার যুগ বলি, তার প্রত্যেকটিই সহজ স্বাভাবিক যুগ নয়; সেই যুগের যে-সব কলাকীর্ত্তি অতিশয় সরল স্বাভাবিক বলে' আমরা মনে করি, তা' আসলে অতিশয় সজ্ঞান-সাধনার ফল। আমার কথা বিশ্বাস কর, আর্নেষ্ট,— এই আত্ম-চেতনা না থাকলে কোন শিল্পকীর্ত্তিই সম্ভব হতে পারে না; আর ঐ সজ্ঞানতারই নাম শিল্পী-মনের বিচার-বৃত্তি।

আ—হাঁ, তোমার কথার অর্থ বুঝতে পারছি—যা' বলছ তা' কতকটা সত্যি বটে। কিন্তু এটাও স্বীকার করতে হবে যে, পৃথিবীর আদি মহাকাব্যগুলো

—যেগুলোকে একখানা কাব্য না বলে' কাব্য-সংগ্রহ বলা যায়, কবিদের নামও পাওয়া যায় না—সেগুলো ত' কোনো একজন কবি সৃষ্টি করে নি, বরং এক-একটা জাতির সমবেত সৃষ্টি বলতে হবে।

গি—যখন তারা সম্পূর্ণ একখানা কাব্য হয়ে উঠেছে, তখন আর তা' বলা যেতে পারে না; তখন যে তারা একটা সুসম্বদ্ধ রস-রূপ লাভ করেছে! কারণ, যার ষ্টাইল নেই তা' আর্ট নয়; যার মধ্যে রচনাগত ঐক্য নেই তাকে ষ্টাইল বলা যেতে পারে না, আর, ঐ ঐক্য মানেই রচনাকারীর ব্যক্তিত্ব। যে-সব বিক্ষিপ্ত উপাদান-উপকরণ ছড়িয়ে ছিল, সেগুলোকে এক ক'রে একটা সুন্দর-রূপ দিয়েছে যে, সে-ই ত' তা'কে নতুন ক'রে সৃষ্টি করেছে—যেমন হোমার করেছিলেন, শেক্‌স্‌পীয়ার করেছিলেন। সেই সব কাব্য এক-একটা গানের সুরে গড়ে উঠেছিল; যা' একটা পরম-ক্ষণের সৃষ্টি তাই চিরদিনের সৃষ্টি হয়ে উঠল! জীবন আর সাহিত্য এই দুটোর পরিচয় যতই করছি, ততই দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে যে, যা-কিছু চমৎকার, যা-কিছু বিস্ময়কর, তার মূলে আছে একটা কোন অসাধারণ পুরুষ। মনে হয়, একটা বিশেষ কালে জন্মেছে ব'লেই কোন মানুষ যে বড় হয়েছে তা নয়, বরং সেই মানুষটাই সেই যুগকে বড ক'রে দিয়েছে। সমালোচনার কথা হচ্ছিল, তাতেই ফিরে আসা যাক। আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে এই। যে-যুগে সমালোচনার অভাব হয়েছে, সে-যুগে, হয় কোন কলাশিল্প ছিল না, নয় যা' ছিল তা' অত্যন্ত বিধিবদ্ধ, প্রাণহীন—কতকগুলো বাঁধা-ছাঁচের নকল বা পুনরাবৃত্তি মাত্র। এমন যুগও ছিল, যেটা সাধারণ অর্থে সৃষ্টির যুগ নয়; সে যুগে মানুষের একমাত্র বাসনা হয়েছে, তার রত্নভাণ্ডারের রত্নগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার; সে তখন সোনা থেকে রূপো, রূপো থেকে সীসেকে পৃথক করে' রেখেছে; দামী পাথরগুলোকে গুণে দেখেছে; মুক্তোগুলোর নামকরণ করেছে। কিন্তু এমন একটাও সৃষ্টির যুগ দেখা যায় না, যখন সমালোচনাও ছিল না। কারণ, সমালোচনাই ত' শিল্পীকে নতুন নতুন রূপ-সৃষ্টির হদিস দেয়। সৃষ্টির ধর্ম্মই এমন যে, তা' থেমে যায় না, ফিরে ফিরে দেখা দেয়। ঐ যে সমালোচনা-বৃত্তি, সৃষ্টিকর্ম্ম ওর কাছেই ঋণী; সমালোচনা আছে ব'লেই শিল্পের নিত্য-নূতন পদ্ধতি দেখা দেয়, সমালোচকই শিল্পীর হাতে নতুন নতুন ছাঁচ এগিয়ে দেয়।

রেনেসান্সের সময়ে য়ুরোপে যখন গ্রীকসাহিত্যের পুনরাবির্ভাব হ'ল, তখন জমিটাও তার জন্যে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এসব ইতিহাসের কচ্‌কচিতে কাজ নেই—যেমন নীরস, তেমনি ভুলে-ভরা; মোটামুটি এই বললেই হবে যে, কলাশিল্পের এই যে বিচিত্র রূপ আমরা দেখতে পাই, সে সবই গ্রীকদের ঐ সমালোচনা-বুদ্ধি থেকে জন্মেছে। তবুও, শিল্পের কোন নতুন ধারা যখনই দেখা দিয়েছে, তখনই তা' সমালোচনার উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছে। অথচ, ঐ নতুন ধারাটা এল কোথা থেকে? যে-সৃষ্টিশক্তির সঙ্গে সমালোচনাও নেই, তার দ্বারা নতুন কিছু গড়া যায় না, আর সবই গড়া যেতে পারে।

আ—তুমি বলছ, সমালোচনা-কাজটা সৃষ্টিকর্ম্মের আনুষঙ্গিক—তারই একটা অত্যাবশ্যক অঙ্গ; আমি এখন তা পুরোপুরি স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু যে-সমালোচনার সঙ্গে সৃষ্টিকর্ম্মের কোন সম্পর্ক নেই, তার সম্বন্ধে তোমার কি মত? আমার একটা বদ্ অভ্যাস আছে—মাসিকপত্রগুলো না পড়ে' পারি নে; তাতে যে সব সমালোচনা থাকে তা' একেবারেই অখাদ্য।

গি—আজকালকার সৃষ্টিকর্ম্মও তেম্‌নি। এক মহা-প্রতিভা আরেক মহা-প্রতিভাকে ওজন করছেন, এক অপদার্থ আর এক অপদার্থের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তবু, আমি বোধ হয় একটু অবিচার করছি। সাধারণতঃ, সমালোচক যারা—আমি অবিশ্যি উচ্চশ্রেণীদের কথাই বলছি—এই যারা সর্ব্বজন-পঠিত, কম দামের পত্রিকায় সমালোচনা লিখে থাকে—তারা যে সব লেখকের সমালোচনা করবার ভার পায়, নিজেরা তাদের চেয়ে পণ্ডিত। তাই হওয়াই সঙ্গত, কারণ, বই-লেখার চেয়ে বই-এর সমালোচনা-করা অনেক বেশি শক্ত—অনেক বেশি পড়াশুনোর দরকার।

আ—তাই নাকি?

গি—নিশ্চয়! যে-কেউ একখানা তিন-খণ্ডে-শেষ-করা নবেল লিখতে পারে; তার জন্যে চাই—জীবন সম্বন্ধেও যেমন, সাহিত্য সম্বন্ধেও তেমনি সমান অজ্ঞতা। এ সব বইএর যারা সমালোচনা করে তাদের মুস্কিল হয় এই যে, ভাল-মন্দর একটা নিরিখ ঠিক রাখতে পারে না। যে-লেখায় ষ্টাইল বলে' কিছু নেই, তার বিচার করা অসম্ভব। কারণ, কখন কখন এমনও শোনা যায় যে, তারা নাকি বইগুলো আগাগোড়া পড়েও না। পড়ে না বটে,

পড়া উচিতও নয়। পড়ার দরকারই বা কি? কোন্ মদ কি থেকে তৈরী হয়েছে, বা কি দামের মদ, তা' জানবার জন্যে জালা-শুদ্ধ পান করতে হয় না। আমি এও জানি, এমন অনেক ভদ্র লেখক ও চিত্রশিল্পী আছেন যাঁরা সমালোচনা আদৌ পছন্দ করেন না। ঠিকই করেন; তাঁরা যা' লেখেন বা আঁকেন তার সঙ্গে এই কালের বুদ্ধিগত কোন যোগ নেই—না আছে একটা নতুন চিন্তাধারা, না আছে কামনা-বাসনার নূতনত্ব, বা সৌন্দর্য্যসৃষ্টির একটা নতুন দিক; তাদের সম্বন্ধে কারো কিছু না বলাই ভালো—পরে সে সব রচনা কেউ মনেও রাখবে না।

আ—কিন্তু মাপ কর, তোমার উচ্ছ্বাসে একটু বাধা দিচ্ছি—সমালোচনার গুণ-গান করতে গিয়ে তুমি একটু বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছ। যতই বল না কেন, একথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, একটা কিছু করার চেয়ে, তার সম্বন্ধে বলা ঢের সহজ।

গি—কি বলছ?—কাজটা শক্ত, তার সম্বন্ধে কিছু বলাই খুব সহজ! একেবারেই নয়! ও একটা মস্ত ভুল, সকলেই তাই মনে করে। একটা কাজ বরং সহজ, তার সম্বন্ধে কিছু বলাটাই সবচেয়ে শক্ত। ইতিহাসে যে সব কীর্ত্তির কথা আছে, তার কর্ত্তা যে-কেউ হতে পারে, কিন্তু ইতিহাস লিখতে পারে ক'জন? কর্ম্মের প্রবৃত্তিই বল, আর হৃদয়ের আবেগই বল—সেখানে মানুষে-পশুতে কোন প্রভেদ নেই; একমাত্র ওই বাক্য, ওই ভাষা আছে বলে'ই মানুষ পশুর চেয়ে বড়, মানুষে-মানুষেও ছোট-বড় ভেদ হয়ে থাকে। আর ঐ ভাষাই সকল ভাব-চিন্তার জননী—ভাব-চিন্তা ভাষার জননী নয়। বাস্তবিক, কর্ম্ম-করাটাই সব সময়ে সোজা; যাদের আর কিছু করবার শক্তি নেই—ও-ই তাদের একমাত্র গতি। না আর্নেষ্ট, কাজকে অত বড় মনে কোরো না। মানুষ যা' কিছু করে—বাইরের কতকগুলো ঘটনা বা অবস্থার তাগিদেই করে—অবশে, অন্ধভাবে; সেই তাড়নার মূলে যে-শক্তি, তার কোন সজ্ঞানতা নেই। কর্ম্ম যারা করে তাদের কল্পনাশক্তিও নেই—যারা স্বপ্ন দেখতে জানে না, তারাই কর্ম্ম করতে বাধ্য হয়।

আ—গিলবার্ট, তুমি দেখছি, মানুষের সারা ইতিহাসটাই উল্টো বুঝতে চাও!

গি—মানুষের ইতিহাস যদি পড়তে হয়, তবে সেটাকে আগাগোড়া সংশোধন

ক'রে নিতে হবে। যাদের বিচার-শক্তি আছে, তারা এই কাজটাই আগে করবে। মানুষের জীবনকে আমরা যখন পূর্ণ বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিতে দেখতে শিখবো, তখনই বুঝতে পারব যে, যে-মানুষ স্বপ্ন ছাখে তার চেয়ে ঢের বেশি ভ্রান্ত যদি কেউ থাকে, তবে সে হচ্ছে তোমার ঐ কর্ম্মনিষ্ঠ মানুষ। যে-জমিতে সে ভেবেছিল আগাছার চাষ করেছে, তার থেকেই আমরা আঙুরের ফসল পেয়েছি। আবার, আমাদের সুখ-সাধনের জন্য যেখানে সে রসাল-ফলের চাষ করেছে বলে' মনে-মনে খুসী হয়েছিল, সেইখান থেকেই যত বিষ-ফলের উৎপত্তি হয়েছে। কোন্ দিকে চলেছে—সে জ্ঞান নেই ব'লেই ত' মানুষ চলবার পথ খুঁজে পেয়েছে!

আ—তুমি তা' হলে বলতে চাও যে, কর্ম্মের ক্ষেত্রে কোন সজ্ঞান উদ্দেশ্য আছে মনে করাই একটা ভ্রান্ত ধারণা?

গি—তার চেয়েও খারাপ কিছু। আমরা যত কাজই করি না কেন, জীবন নামক মহাযন্ত্রটি তাকে গ্রাস করে' নিজের কাজে লাগায়; যাকে পুণ্য-কর্ম্ম বলি, তাকে গুঁড়িয়ে একমুঠো ছাই করে' দেয়; যেগুলোকে আমরা পাপ বলি সেইগুলোকেই একটা নতুন সভ্যতা-সৃষ্টির উপাদান করে' তোলে—হয়ত' সে এক গৌরবময় মহান্ সভ্যতা, তেমন সভ্যতা পূর্ব্বে কখনো ছিল না। কিন্তু মানুষ কতকগুলো কথার দাস বই ত' নয়। এই যে 'জড়বাদ' ব'লে একটা কথা তৈরী করেছে, যার বিরুদ্ধে আক্রোশের অন্ত নেই—জানে না যে, জগতে ঐ জড়বাদই যে সব বিপ্লব ঘটিয়েছে, তারই ফলে মানুষের অধ্যাত্ম-চেতনা আরও উন্নত ও পরিশুদ্ধ হয়েছে; আবার, পৃথিবীতে যখনই অধ্যাত্মবাদ প্রবল হয়েছে, তখনই তার ফলে মানুষের প্রাণ-মনের যত কিছু শক্তি হতাশায়, নিষ্ফলতায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে—অতিশয় মিথ্যা এক-একটা ধর্ম্মবিশ্বাসের নাগপাশে বদ্ধ হয়ে মানুষের মন জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। যার নাম আত্মনিগ্রহ—তার দ্বারা মানুষ শুধু নিজেরই আত্মার উন্নতির পথ রুদ্ধ করে; আর যার নাম আত্মবলি বা আত্ম-বিসর্জ্জন, সে হ'চ্ছে সেই আদিম বর্ব্বরদের নরবলি-প্রথার সামিল—সেই যন্ত্রণাটারই পূজো করা; মানুষের ইতিহাসে ওই ভয়ানক বস্তুটার প্রভাব মোটেই কম নয়; এখনও এই যুগেও, প্রতিদিন কত মানুষ বলি যাচ্ছে, দেশে দেশে

তার জন্যে যূপকাষ্ঠ পোঁতা রয়েছে। পুণ্যকর্ম্মই বটে! কিসে পুণ্য হয় কে বলতে পারে? আমি ত' পারিনে। কেউ পারে না।

আ—গিলবার্ট, তোমার কথাগুলো বড় নির্ম্মম হ'য়ে উঠছে। ওসব কথায় আর দরকার নেই—আমরা আবার সাহিত্যের স্নিগ্ধ-মধুর হাওয়া সেবন করি, এস। তুমি কি বলছিলে? কর্ম্ম-করার চেয়ে বাক্য রচনা করা ঢের বেশি শক্ত?

গি—(একটু চুপ করিয়া থাকার পর)—নয় ত' কি? আমার বিশ্বাস, আমি একটা অতি সহজ সত্য-কথাই উচ্চারণ করেছি। কেমন, এখন বুঝতে পেরেছ—আমার কথাই ঠিক? মানুষ যখন কিছু করে তখন ত' সে একটা কলের পুতুলমাত্র। যখন কিছুর বর্ণনা করে তখন সে হয় কবি। এইটিই হ'ল মূল-তত্ত্ব। ইলিয়নের ঝটিকাক্ষুব্ধ বালু-প্রান্তরে দাঁড়িয়ে যারা তাদের চিত্রিত শরাসন থেকে খাঁজকাটা তীর ছুঁড়েছিল, কিম্বা 'অ্যাশ'-কাঠের তৈরী ছয়ফুট-দীর্ঘ বল্লম দিয়ে আঘাত করেছিল শত্রুর সেই ঢাল-গুলোর উপর—যার কোনটা অতি-কঠিন চামড়া দিয়ে তৈরী, কোনটা বা আগুনের মত ঝক্‌ঝকে পিতল দিয়ে গড়া,—তাদের সেই কাজ খুব শক্ত ছিল না। আবার সেই যে এক ব্যভিচারিণী রাজ-মহিষী তার পতিকে হত্যা করেছিল,—প্রথমে একখানি উৎকৃষ্ট টায়ার-দেশীয় সুকোমল গালিচায় শয্যা রচনা করে' তার সেবা করলে, পরে যখন সেই স্বামী স্নান-কক্ষে মার্ব্বেল-পাথরে বাঁধানো জলাশয়ে দেহ এলিয়ে দিয়েছে, ঠিক সেই সময়ে তার মাথার উপর একটা লাল সুতোর জাল ফেলে, সে যে তার উপপতিকে গুপ্ত স্থান থেকে ডেকে এনে, তাকে দিয়ে সেই জালবদ্ধ অবস্থাতেই স্বামীর সেই বুকটাতে ছুরি বসিয়েছিল—যে-বুক ঔলিসের দেবী-মন্দিরে নিজের মেয়েকে বলি দেবার সময়েও বিদীর্ণ হয় নি,—এইসব যে কাজ, এতেই বা কি বাহাদুরী আছে? আর যারা এ সকলের বর্ণনা করেছে? যারা এইসব ঘটনাকে বাস্তব-রূপ দিয়ে চিরদিনের ঘটনা করে তুলেছে? ঐ-সব নর-নারী বড়, না, যারা তাদের নিয়ে গান রচনা করেছে তারা বড়? "উদার-হৃদয় মহাবীর হেক্টর আর বাঁচিয়া নাই"—কবি লুসিয়ান তাঁর কাব্যে, প্রেতলোকের বর্ণনায়, একজনের মুখে এই কথাটি দিয়েছেন; সেখানে হেলেনের মাথার খুলিটা গড়াগড়ি যাচ্ছে—তার অস্থি নাকি বড়

শাদা দেখাচ্ছে ;—কি আশ্চর্য্য! যার এখন এই বিকট মূর্ত্তি, তারই জন্যে কত রণতরী সাগর-বক্ষে ভেসেছিল! বীরসাজে সজ্জিত কত রূপবান যোদ্ধা তারি জন্যে রণভূমিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করেছে, কত সৌধকিরীটিনী নগরী ধূলিসাৎ হয়েছে! হাঁ, জগতের সবই নশ্বর বটে। তবু আজও শ্বেত মরালীর মত রূপসী সেই লীডা-নন্দিনী হেলেন রাজপুরী থেকে বেরিয়ে দুর্গপ্রাকারের উপরে এসে দাঁড়ান,—দাঁড়িয়ে তেমনি করে'ই নীচে সমর-তরঙ্গের দিকে চেয়ে থাকেন। রাজপুরীর প্রাঙ্গণ-চত্বরে প্রিয়ামের বীরপুত্র, যুদ্ধযাত্রার আগে, অঙ্গে পিতলের অঙ্গত্রাণখানি বেঁধে নিচ্ছেন—রাজবধূ আন্দ্রোমাখীর গৌরবর্ণ দুই বাহু তাঁর কণ্ঠ বেষ্টন করেছে। তিনি মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ খুলে মাটির উপর রাখলেন—শিশুপুত্র পিতার সেই মুখ দেখে ভয় পেয়েছে। এই যে সব নর-নারী, এরা কি কল্পনার মায়া-কায়া? এই সব বীরমূর্ত্তি কি পাহাড়-পর্ব্বতের কুয়াশা দিয়ে তৈরী? না, গানের সুরে ভেসে-ওঠা কতকগুলো ছায়া-ছবি? না, এরা অতিশয় বাস্তব! মানুষ যে কর্ম্মগুলো করে, তাতে আছে কি? তার মূলে যে শক্তির বেগ থাকে সে ত' সেই মুহূর্ত্তেই ফুরিয়ে যায়! সে ত' ঘটনাধীন সত্য—ঘটনার খাতিরে সত্যকে ছোট-করা! কেবল কবিরাই তাঁদের গান দিয়ে জগতের সত্য-রূপটি গড়ে' দেন—যে স্বপ্ন দেখতে জানে, সেই রূপও সে-ই ছাখে।

আ—তোমার কথা শুনতে শুনতে আমারও তাই মনে হচ্ছে।

গি—তা'ই যে সত্যি! ট্রয়ের দুর্গপ্রাচীর জীর্ণ গলিত হয়ে পড়েছে, তার গায়ে যে টিকটিকি বসে' থাকে তার রংটাও সবুজ ব্রোঞ্জের মত। প্রিয়ামের প্রাসাদ-কক্ষ পেচকের বাসা হয়েছে; ট্রয়ের শূন্য প্রান্তরে ভেড়া আর ছাগলের পাল নিয়ে রাখালেরা ঘুরে বেড়ায়; আর, যে-সাগরকে হোমার "তৈলাক্ত, মন্তরঞ্জিত" বলে' বর্ণনা করেছেন,—যে-সাগরবক্ষে সিন্দুর-চিহ্নিত, তাম্র-মুখ পোতমালা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বিস্তৃত হয়ে দেখা দিত, এখন তার জলে একখানা ছোট নৌকোয় একা বসে' মাছ ধরছে কোন ধীবর; জালে-বাঁধা শোলার কাঠিগুলো কি রকম ভেসে ভেসে উঠছে তাই সে একমনে দেখছে। এই ত' বাস্তব জগৎ! কিন্তু এদিকে সব ঠিক তেমনি আছে; প্রতিদিন সকালে পুরীদ্বার খুলে যায়; পদব্রজে

ও অশ্বপৃষ্ঠে, কিম্বা ঘোড়ায়-টানা রথে চড়ে', যোদ্ধদল বেরিয়ে আসে—যুদ্ধে যায় তারা; সমস্ত দিন রণ-কোলাহলে আকাশ বিদীর্ণ হয়, যখন রাত্রি নামে, তখন তাঁবুতে তাঁবুতে মশাল জ্বলে' ওঠে; রাজার সভা-মণ্ডপের মধ্যস্থলে অগ্নিপাত্রে আগুন জ্বালানো হয়। পাথরের মূর্ত্তিতে, কিম্বা চিত্রিত প্রাচীর-গাত্রে—শিল্পীর হাতে যারা জীবন্ত হয়ে উঠে, তাদের জীবন একটা মুহূর্ত্ত-কালে চিরস্থির হয়ে থাকে—যদিও সে একটি অসীম সৌন্দর্য্যের চির-মুহূর্ত্ত! সে-জীবনে একটিবারের চঞ্চলতা, অথবা একই অবস্থার একই রকমের প্রশান্তি আছে। কিন্তু কবিরা যাদের সৃষ্টি করেছেন, তাদের হর্ষ-বিবাদ, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার কি অন্ত আছে! তাদের যুবা-বয়স, প্রৌঢ়-বয়স আছে; শিশুকাল আছে, বার্দ্ধক্য আছে। পাথরে-গড়া মূর্ত্তিতে সৌন্দর্য্যের অনবদ্য একটি রূপকে এক মুহূর্ত্তের একটি অবস্থায় ধ'রে রাখা হয়েছে; পটবস্ত্রের উপর যে ছবিটি রংয়ের দাগ দিয়ে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তারও সেই প্রাণ-ধর্ম্ম নেই—যার প্রধান লক্ষণ হ'চ্ছে বিকাশ বা পরিবর্ত্তনশীলতা। তারা যে মৃত্যুহীন—তার কারণ, তারা জীবনের কিছুই জানে না; জীবন-মৃত্যুর রহস্য কেবল তারাই জেনেছে, যাদের উপর কালের প্রভাব আছে—যাদের শুধু বর্ত্তমান নয়, ভবিষ্যৎও আছে; যাদের উন্নতিও আছে, পতনও আছে। যে সব শিল্পকলাকে 'দৃশ্য' বলা হয় তাদের একটা বড় অসুবিধে এই যে—গতি বা চাঞ্চল্যকে তারা রূপ দিতে পারে না; ও-কাজ একমাত্র কাব্য-সাহিত্যই পারে; কেবল সাহিত্যেই দেহের গতিশীলতা ও আত্মার অস্থিরতাকে বাক্যের সাহায্যে প্রকাশ করা সম্ভব।

আ—হাঁ, এখন আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কি বলতে চাও। কিন্তু শিল্পীকে, স্রষ্টাকে যত বড় করবে, সমালোচককে তত ছোট করা হবে নাকি?

গি—তা' কেন হবে?

আ—কারণ, সমালোচক যা' লেখে, সে হচ্ছে পূর্ণ সঙ্গীতের একটা প্রতিধ্বনি—সুস্পষ্ট রূপ রেখার একটা ছায়াময় প্রতিলিপি মাত্র। যে নতুন জগৎ কবি বা শিল্পী সৃষ্টি করেন তাতে যদি খুব বড় প্রতিভার প্রাণ-স্পর্শ থাকে, তবে সে এমন সম্পূর্ণ সুন্দর হ'য়ে উঠবে যে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দ্বারা তাকে আরও সুন্দর করে' তোলা যাবে না। একথা আমি এখন বেশ বুঝতে পেরেছি

এবং স্বীকারও করছি যে, কিছু করার চেয়ে কিছু বলা ঢের শক্ত। ওটা আর্ট ও জীবনের মধ্যে যে সম্পর্ক—তার সম্বন্ধেই খাটে; কিন্তু আর্ট ও তার সমালোচনা বলতে যা বোঝায়, তাদের সম্পর্কে খাটে না।

গি—আরে, সমালোচনা জিনিষটাই যে একটা আর্ট! শিল্পীর সঙ্গে এই রূপময় দৃশ্যমান জগৎ, বা কামনা-বাসনা-ভাবচিন্তাময় জগৎটার যে সম্বন্ধ, কারুসৃষ্টির সঙ্গে সমালোচকের সম্বন্ধও ঠিক তাই। বরং কবি বা শিল্পীর মত, তার সেই কাজটির জন্যে খুব উৎকৃষ্ট বিষয়-বস্তুর দরকার হয় না। দেখ না একটা গেঁয়ো ডাক্তারের স্ত্রী আর তারই অতিশয় নির্ব্বোধ ইতর একটা পরপুরুষকে নিয়ে যে ঢলাঢলি—তাই হয়েছিল গুস্তাভ ফ্লোবেয়ারের অমন একখানা উপন্যাসের বিষয়বস্তু! ওই দিয়ে তিনি ভাষার একটা নতুন ছন্দ সৃষ্টি করে' গেছেন! ক্রিটিকের সৃষ্টিশক্তিও কম নয়; বিষয় যেমনই হোক, তার থেকেই একটা অপূর্ব্ব সাহিত্য রচনা করে' দেবে সে; যে কোন বস্তু বা বিষয় তার মনে প্রেরণা জাগাতে পারে। রচনার ভালমন্দ-বিচার হয়—তার ভঙ্গিটা নিয়ে। কিন্তু এমন কোন বিষয় নেই যা' তার মনকে উস্কে দেয় না, বা খোঁচা দিয়ে উদ্যত করে' তোলে না।

আ—তবু, সমালোচনাকে কি খাঁটি আর্ট বা সৃষ্টিকর্ম্ম বলা যায়?

গি—কেন যাবে না! তারও ত' সৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করবার জন্যে—কিছু একটা গড়বার জন্যে—উপাদান-উপকরণ রয়েছে; সে-ও সেইগুলো দিয়ে একটা সুন্দর এবং নতুন কিছু গ'ড়ে তোলে। কাব্যসৃষ্টিতে কবিরা তার বেশি কি করে' থাকেন? যথার্থ বলতে হ'লে, সমালোচনা যেন সৃষ্টির মধ্যেই আরেক সৃষ্টি। ঠিক যেমন বড় বড় কবিরা—হোমার এস্কাইলাস থেকে শেক্‌স্‌পীয়ার, কীট্‌স্‌ পর্য্যন্ত, সকলেই—নানা পুরাণ, ইতিহাস, কথা কাহিনী ও কিম্বদন্তীকে উপাদান করে' তাঁদের কাব্য সৃষ্টি করেছিলেন; তাঁরা যেমন একেবারে সোজা জীবনের থেকেই সে সব গ্রহণ করেন নি—এবং সেই উপাদানগুলোও নিতান্ত কাঁচা ছিল না, ইতিপূর্ব্বেই তাদের একটা রং ও রূপ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল,—তেমনি, ক্রিটিকরাও যে সব বিষয় নিয়ে তাদের সৃষ্টিকর্ম্ম ক'রে থাকে—সেগুলোও অপরের দ্বারা ঠিক সেই রকম আগে থেকেই যেন পরিমার্জ্জিত করে' রাখা হয়েছে; তারা কেবল তাইতে একটা নতুন রং, নতুন রূপ ফুটিয়ে তোলে। আমি বলি, সমালোচনা সৃষ্টিকর্ম্মের

চেয়ে বড়, যেহেতু ওটাতে বাইরের শাসন একেবারেই নেই। খুব উঁচুদরের সমালোচনায় ব্যক্তির ব্যক্তিগত অনুভূতির পূর্ণ-প্রকাশ থাকে, কাজেই তার মত সৃষ্টিকর্ম্ম আর কিছু হতে পারে না। বাইরের জগৎ বা বাইরের সমাজ,—এ সকলের বন্ধন তাকে আদৌ মানতে হয় না; কবি বা শিল্পীর মত, বাস্তবের সঙ্গে কোনরকম সাদৃশ্য রক্ষা করার দায় তার নেই, সম্ভব-অসম্ভবের ভাবনাও নেই। কাব্যসৃষ্টিকে তুমি বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই করতেও পারো, কিন্তু যা' মানুষের আত্মার সত্য—তাকে যাচাই করবে কি দিয়ে?

আ—আত্মার সত্য?

গি—হাঁ, আত্মার সত্য নয় ত' কি? অতি উচ্চাঙ্গের সমালোচনায় তাই থকে—মানুষ তার আত্মার অনুভূতিকেই বাক্যে প্রকাশ করে। তাই সে কাহিনী ইতিহাসের কাহিনীর চেয়েও মনোমুগ্ধকর, কারণ, তাতে কোন ভেজাল নেই; আবার দর্শনশাস্ত্রের চেয়ে তা সুখপাঠ্য, কারণ, তার বিষয়-বস্তু একটা নিরাকার নির্ব্বিশেষ কিছু নয়, অতিশয় সুস্পষ্ট সাকার সত্তা আছে তার। তাকেই সুসভ্যতম আত্ম-চরিত বলা যেতে পারে; কারণ, তাতে জীবনের কতকগুলো ঘটনার বিবরণ নেই,—অন্তরের কথাই আছে। ক্রিটিক বা সমালোচক যিনি, তিনি আত্ম-পরিচয় দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেন না—তাঁর প্রাণে সেই সব ভাব উদ্রেক করবার জন্যেই চিত্রকর ছবি আঁকে, কবি কাব্য রচনা করে, ভাস্কর পাথর কুঁদে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে।

আ—আমি কিন্তু সমালোচনার কাজ অন্যরকম বলে' শুনেছি।

গি—হাঁ, জানি; একটা কথা চলিত হয়েছে বটে যে, সমালোচনার যথার্থ কাজ হচ্ছে—যেটি যেমন সেটি ঠিক তার মত করে দেখতে পারা। কিন্তু ওটা একটা গুরুতর ভুল; কারণ, যাকে বিশুদ্ধ সমালোচনা বলা যায়, তার রীতিই হচ্ছে অন্তর্মুখীনতা—তার দৃষ্টি নিজের উপরে নিবদ্ধ; পরের অন্তরে কি আছে তার সন্ধান নয়—নিজের অন্তরের রহস্য উদ্ঘাটন করাই তার কাজ। শ্রেষ্ঠ সমালোচনা যখন কোন শিল্পকর্ম্মের পরিচয় দেয়, তখন সেটাকেই দেখাবার চেষ্টা করে না—সেই বস্তুর ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করে

না; তাকে দেখে নিজের মনে যা' হয়েছে তাই প্রকাশ করার নাম সমালোচনা।

আ—সত্যিই কি তাই ?

শি—তা'ছাড়া আর কি ? মিঃ রাস্কিন টার্নারের ছবির সম্বন্ধে কি বলেছেন তা' জান্‌তে চায় কে ? কি এসে যায় তা'তে ? কিন্তু সেই কথাগুলো—যে অপূর্ব্ব, বিরাট-গম্ভীর সুরলয়যুক্ত করে' আবেগপূর্ণ গদ্য-ভাষায় তিনি বলেছেন—সে-ভাষার প্রত্যেক শব্দের, প্রত্যেক বাক্যের, প্রত্যেক উপমার যে সূক্ষ্ম কলা-কুশল পারিপাট্য—তার সেই অরুণবর্ণের অবারিত বাক্যধারা, সেই ত' একটা উচ্চাঙ্গের কারুকর্ম্ম; সাহিত্যকেই আমি শ্রেষ্ঠ আর্ট বলে' মনে করি, অতএব, সেই বাক্যরচনা শুধু আর্ট নয়—উৎকৃষ্ট আর্ট। আবার পেটার (Pater) যদি মোনালিসার ছবিতে এমন কিছু দেখে থাকেন, যা' লেওনার্দোর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, তাতেই বা কি এসে যায় ? যে ওই ছবিখানা এঁকেছিল, তার মনে হাসির ওই বিচিত্র ভঙ্গিমাটাই ছিল সবচেয়ে বড়—এমন কথা কেউ কেউ বলেছে। কিন্তু আমি যখন 'লুভর'-প্রাসাদের স্নিগ্ধশীতল আর্ট গ্যালারীর ভিতর দিয়ে, ঐ অদ্ভুত ছবিখানার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তখন এই কথাগুলোই ক্রমাগত গুঞ্জরণ করি—

"যে পর্ব্বতগুলার মাঝে বসে' রয়েছে ঐ নারী—বয়সে ও তাদের চেয়েও প্রাচীন; যে-সব রক্তপায়ী পিশাচ কবরের মধ্যে মৃতদেহের শোণিত পান করে, এবং যারা বারবার মরে ও বেঁচে ওঠে, ঐ নারী তাদের মতই যেন বহুবার মরেছে, মরে' আবার বেঁচে উঠেছে—মৃত্যুর রহস্য ভেদ করেছে ও। সমুদ্রের অতল জলে ও ডুব দিয়ে এসেছে, সেখানকার সেই স্তিমিত দিবালোক ওর সর্ব্বাঙ্গে বিচ্ছুরিত হচ্ছে; পূর্ব্বদেশ থেকে যে বণিকদল বিচিত্র বয়নের বসন নিয়ে আসে—ও তাদের সঙ্গেও পণ্য-বিনিময় করেছে; ও-ই ছিল সেই হেলেন-জননী লীডা—ট্রয়ের সেই হেলেন; আবার যীশু-মাতা মহাদেবী মেরীর জননীও ছিল ও-ই। এ সকলের স্মৃতি ওর কাছে বীণা-বেণুর মত; সেই সুরের সঙ্গীত-রাগেই ওর মুখের

মাধুরী-রেখা এমন চল-চঞ্চল, ওর আঁখিপুটে ও করপল্লবে এমন কোমল আভা ফুটে উঠেছে !”

এমনি করে'ই ছবিটা আসলে যা,' তার চেয়ে শতগুণ মনোহর হয়ে ওঠে ; যে-রহস্য তার ভিতরে গোপনে বাস করছে—যা' সে নিজেও জানে না—তা' আমাদের কাছে ধরা দেয় ; আর ঐ যে স্বপ্নময়, মোহময় গন্ধ,—ওর সঙ্গীত-ধ্বনি আমাদের কানে তেমনি মধুর লাগে, যেমন মধুর লেগেছিল সেই বাঁশির আলাপ 'লা জোকন্দা'র কানে ; সেই সুর শুনতে শুনতে ওর ওই ওষ্ঠদুটি এমন ভঙ্গিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে—যা' মৃদু-বিষের মতই উন্মাদক। আমাকে যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর—লেওনার্দো যদি শুনতে পেতেন যে, ওই ছবি সম্বন্ধে কেউ এইসব কথা বলেছে,— বলেছে যে, মানুষের যত ভাবনা-কামনা, যত-কিছু পাওয়া না পাওয়ার শক্তি ও অশক্তি—সব যেন গভীরতম ও তীব্রতম হ'য়ে ঐ মুখের প্রত্যেক রেখাটি পরিস্ফুট করে' তুলেছে ; ওতেই রূপের প্রকাশ শেষ যেন হয়ে গেছে—গ্রীসের জীবধর্ম্ম-প্রীতি, রোমের ভোগ-লালসা, মধ্যযুগের তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবাবেশ—সেই অধ্যাত্ম-পিপাসা ও কবিত্বময় প্রেম-স্বপ্ন, রেনেসান্সের জীবন সাধন, বোর্গিয়াদের পাপোন্মাদ ; —যদি শুনতেন তিনি. তা'হলে কি বলতেন ? সে প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব,— তিনি হয় ত' বলতেন, এসব কিছুই তাঁর মনে হয় নি ; ঐ ছবিতে তিনি কেবল রেখা ও আয়তনের একটা নূতনতর বিন্যাস, আর নীল ও সবুজ এই দুই রং মিলিয়ে একটা অপূর্ব্ব বর্ণ-সুষমা সম্পাদন করেছেন মাত্র। ঠিক এই কারণেই, আমি যে-ধরনের সমালোচনার দৃষ্টান্ত দিয়েছি—ঐ হ'ল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমালোচনা। ও রকম সমালোচনায়, কোন একটা কাব্য বা চিত্র বা আর কিছুকে উপলক্ষ্য ক'রে সম্পূর্ণ নতুন-কিছু সৃষ্টি করা হয়। বিষয়বস্তুটার প্রকৃত অর্থ কি, শিল্পী তার-মারফতে কি বলতে চেয়েছে—তাই নিয়ে সমালোচক মাথা ঘামায় না, কিম্বা, শিল্পীর কথাটাকেই শেষ-কথা বলে' মেনে নেয় না ; উচিতও তাই। কারণ, সুন্দর আর্ট-সৃষ্টির মধ্যে যে অর্থটি নিহিত থাকে, তা' যেমন শিল্পীর মনেও ছিল, তেমনি, যে সেটাকে দেখছে তার মনেও আছে। বরং যে ছাখে, সে-ই ঐ সৌন্দর্য্যের হাজার রকম দিক আবিষ্কার করে, আমাদের চোখে তাকে আরও বিস্ময়কর ক'রে তোলে ; প্রত্যেক

যুগের সঙ্গে তার নতুন নতুন সম্পর্ক পাতিয়ে দেয়, তাই সে আমাদের জীবনেরই একটা অঙ্গ হয়ে ওঠে; আমরা যা' চাই, সে যেন তারি একটা ইঙ্গিত ;' কিম্বা যা চাই অথচ পেতে ভয় করি, সে যেন তেমনি একটা-কিছু। যা' সুন্দর তার কোন অর্থ নেই বলে'ই তার প্রকাশ সীমাহীন। সৌন্দর্য্য যখন তার স্বরূপ প্রকাশ করে, তখন তার মধ্যেই আমরা সারা বিশ্বের রূপানল-বিভা দেখতে পাই।

আ—কিন্তু এ রকম রচনাকে কি সমালোচনা বলা চলে ?

গি—সবচেয়ে বড় সমালোচনা ওকেই বলে ; কারণ, এ ত' কোন একটা বিশেষ কলা-কীর্ত্তির পরিচয় দেওয়া নয়, একেবারে মূল সৌন্দর্য্য নিয়েই তার কাজ ; তাই শিল্পীও যা' শেষ করতে পারেনি—যা' সেও বোঝেনি, বা বুঝতে পারলেও সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তুলতে পারেনি, সমালোচক সেটা পূরণ করে' দেয়।

আ—তা' হলে, উৎকৃষ্ট সমালোচনা সৃষ্টিকর্ম্মের চেয়েও বড়—তার সৃষ্টি আরও উঁচুদরের সৃষ্টি ; যেটা ঠিক যেমনটি আছে তাকে তেমনটি না দেখাই সমালোচকের কাজ—তুমি এই বলতে চাও ?

গি—হাঁ, আমি তাই মনে করি ; যে শিল্পকর্ম্মটি সমালোচনার বিষয় হবে, তার থেকে একটা ইঙ্গিতমাত্র নিয়ে সমালোচক নতুন-রকম কিছু রচনা করবে। সে বস্তুর যে সৌন্দর্য্য, তার প্রকৃতি এমনই যে, তাকে যেমন ইচ্ছে তেমনি রূপ দেওয়া যায়, তাকে যেমন ইচ্ছে তেমনি করে' দেখতে পারি। সমালোচকের কানে সে এমন সব গোপন রহস্যের মৃদুগুঞ্জন করে, যা' কোন শিল্পীর মনে উদয় হয়নি ; যে সেই মূর্ত্তি গড়েছিল, বা পটখানা চিত্রিত করেছিল, কিম্বা মণিটাকে নিয়ে তার উপর সূক্ষ্ম কারুকর্ম্ম করেছিল, সে ও সব কথা ভাবেই নি।

এমন কথাও শোনা যায়, শিল্পীর জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি এই যে, সে তার মনের ভাবমূর্ত্তিটাকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারে না। ট্রাজেডি আসলে তা' নয় ; অধিকাংশ আর্টিস্ট তাদের সেই মানসী-প্রতিমাকে এতই অভ্রান্ত, এতই সুনিশ্চিতরূপে প্রতিমূর্ত্ত করতে পারে যে, তাতে আর কোন রহস্য বা বিস্ময়বোধের অবকাশ থাকে না ; এইজন্যেই সঙ্গীতকলাই শ্রেষ্ঠ শিল্পকলা। সঙ্গীতে, অনির্ব্বচনীয় যা' তাকে বচনীয় করা যায় না। সকল

আর্টেই কতকগুলো যে প্রকাশের বাধা থাকে, তা' থাকা আবশ্যক এই কারণেই। দেখ, ভাস্কর-শিল্পী তার পাথরে কোন রং ব্যবহার করতে পারে না; চিত্রশিল্পীও তার চিত্রে আকার-আয়তনের সঠিক রূপটি ধরে' দিতে পারে না; তাতে তাদের আপত্তি নেই, বরং সেজন্যে তারা খুসী; কারণ, ঐ সুবিধেগুলো ত্যাগ করার দরুণ, তারা বাস্তবকে পূরোপূরি ধরে' দিতে পারে না—পারলে সেটা হ'ত নিতান্তই অনুকরণ; আবার, অন্তরের ভাবটাকেও যদি সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারত, তবে সেও একটু অতিরিক্ত রকমের তত্ত্ব-বস্তু হয়ে উঠত। আর্টের এই রকম অসম্পূর্ণতা আছে ব'লেই তার সৌন্দর্য্য এমন নির্দ্দোষ হয়ে ওঠে।

কিন্তু, আর নয়, নৈশ-ভোজনের সময় হয়েছে; উপস্থিত দু'একটি রসনা-রমণীয় বস্তুর শিল্প-সৌন্দর্য্য বিচার করা যাক; তারপর, সমালোচনা কি অর্থে কতখানি ব্যাখ্যার কাজও করে, সে বিচারের অবতারণা করা যাবে।

দ্বিতীয় পর্ব্ব

আ—Ortolan-গুলো বড় চমৎকার রান্না হয়েছিল, আর ঐ chambertin—স্বাদও যেমন, গন্ধও তেমনি! এখন আমাদের সেই আলোচনাটা আবার আরম্ভ করা যাক।

গি—আহা, অমন কাজটি কোরো না। আলাপ-আলোচনা করতে বসে' কেবল একটাকেই ধরে' থাকতে নেই—এটা-সেটা—সবরকমই এসে পড়া চাই। বরং, আমাদের বিষয়টা হোক্, "ধর্ম্মসঙ্গত ক্রোধ—তার কারণ ও আরোগ্যের উপায়"; এ সম্বন্ধে একখানা বই লিখব ঠিক করেছি। কিম্বা যে-কোন অন্য বিষয়ে আলাপ করতে পারো—হঠাৎ যা' এসে পড়ে।

আ—না, আমি ঐ সমালোচক আর সমালোচনার কথাই শেষ করতে চাই। তুমি বলেছ, অতি উচ্চাঙ্গের সমালোচনা বলতে যা' বোঝায়, তা' হচ্ছে একটা সৃষ্টিকর্ম্ম,—সে কর্ম্মও সম্পূর্ণ স্বাধীন; এক কথায় সেও একটা স্বতন্ত্র আর্ট। আচ্ছা বেশ, এখন তা' হ'লে আমাকে বুঝিয়ে দাও, ক্রিটিক্‌রা কি স্রষ্টা না হয়ে কখনো ব্যাখ্যাকার হতে পারে না?

গি—হাঁ, ইচ্ছে করলে, ক্রিটিকরাও ব্যাখ্যার কাজ করতে পারে। কিন্তু তাতেও তারা যে সব-সময়ে কোন কাব্য বা ছবি বা আর-কিছুর অর্থ বুঝিয়ে দেবে, তা' নয়; বরং সেই বস্তুটার রহস্য আরও ঘনীভূত করে তুলবে; সেই শিল্প-সৃষ্টির চারধারে এমন একটা বিস্ময়রসের কুহেলি-গুণ্ঠন টেনে দেবে—যা' দেবতা ও ভক্ত উভয়েরই ভালো লাগা উচিত। সাধারণ মানুষ যারা তারা দেবতাদের কিছুমাত্র সমীহ করে না—কবিদের গা ঘেঁসে চলতে চায়, মূর্খের মত সচ্ছন্দে বলে' বেড়ায় যে, "শেকস্‌পীয়ার-মিল্টন সম্বন্ধে লেখা আর কারো বই পড়তে যাব কেন? তাঁদের নাটক বা কাব্যগুলোই ত' রয়েছে, সেই ত' যথেষ্ট।" একজন শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি ঠিকই বলেছেন যে, মিলটনের কাব্যের রসাস্বাদ করতে পারা—সে হচ্ছে বিদ্বান হওয়ার একটা বড় পুরস্কার। আর, শেকস্‌পীয়রকে যে ঠিকমত বুঝতে চায়, তাকে সেই যুগটাকেও সবদিক দিয়ে বুঝে নিতে হবে। তাকে ইংরেজী ভাষার ক্রমোন্নতির স্তরগুলো জানতে হবে; মিলহীন ও মিলযুক্ত ছন্দের

উদ্বর্ত্তন বা বিবর্ত্তন বুঝে নিতে হবে; গ্রীক নাটক পড়তে হবে—'আগামেম্‌নন' সৃষ্টি করেছেন যে-কবি আর 'ম্যাকবেথে'র স্রষ্টা যিনি, তাঁদের দুজনের কাব্য-রীতির মধ্যে যোগ কোথায়, কতটুকু—তাও দেখে নিতে হবে, এক কথায়, পেরিক্লিসের যুগের এথেন্সের সঙ্গে এলিজাবেথের যুগের লণ্ডনকে যুক্ত করবার বিদ্যা তার থাকা চাই; আর চাই, য়ুরোপীয় এবং অন্যান্য দেশের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে শেকস্‌পীয়রের স্থান কোথায়, তা'ও ভাল করে' বুঝে নেওয়া। দেখ, আর্নেষ্ট, এইখানে একটা মজার কথা আছে। বিদেশী সাহিত্য ও বিদেশী কলাশিল্পের সংস্পর্শে এসেই এক একটা জাতির যেমন সেই আত্ম-চেতনা জাগে, যাকে আমরা বলি জাতীয়তা-বোধ,—তেমনি, ঠিক উল্টো নিয়মে এটাও ঘটে যে, ব্যক্তি-চেতনা খুব তীক্ষ্ণ করে' তুলতে পারলেই অপরের শিল্পকর্ম্মের মূলে যে ব্যক্তিত্ব আছে, সমালোচক সেটা আবিষ্কার করতে পারে; নিজের সেই ব্যক্তি-চেতনা অপরের সৃষ্টি-কর্ম্মের ভিতরে যত গভীর হয়ে প্রবেশ করতে পারে, ততই ব্যাখ্যা আরও সত্য, আরও সম্পূর্ণ ও নিঃসংশয় হয়ে ওঠে।

আ—আমার ত' মনে হয়, ক্রিটিকের ঐ রকম নিজস্ব মনোভাব সে কাজের পক্ষে একটা বাধা হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক।

গি—না, বরং সেইটেই একটা আলোর মত অপর বস্তুকে প্রকাশ ক'রে দেয়। পরের ব্যক্তিত্ব বুঝতে হলে তোমার নিজের ব্যক্তিত্বটা খুব সজাগ ক'রে তুলতে হবে।

আ- তার ফলে কি হয়?

গি—বলছি তোমাকে—বোধ হয়, দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝালে সবচেয়ে ভালো হয়। আমার মনে হয়, সাহিত্য-সমালোচকের স্থানই সকলের উপরে—কারণ কবিদের দৃষ্টিও যেমন দূরপ্রসারী, কাব্যের ক্ষেত্রটাও তেমনই বিস্তৃত, আবার বিষয়টার মাহাত্ম্যও সবচেয়ে বেশি। তবু প্রত্যেক আর্টের এক-একটা পৃথক ক্রিটিক আছে। নাটকের ক্রিটিক হ'ল অভিনেতা; কবির রচনাটিকে সে নানাদিক দিয়ে নূতন করে' দেখায়। প্রত্যেক অভিনেতার নিজস্ব নতুন ভঙ্গিও আছে; নাটকের কথাগুলিকে মাত্র সম্বল ক'রে সে তার ঐ অভিনয়ের দ্বারা—তার অঙ্গভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরের সাহায্যে, এমন একটা জিনিষ গড়ে' তোলে, যা' সম্পূর্ণ নতুন। তেমনি, যে গান গায়, বাঁশি বা বেহালা

বাজায়, সেও সঙ্গীতকলার রসকে উজ্জ্বল ক'রে তোলে, তাই সে-ই হ'ল সঙ্গীতের ক্রিটিক। একখানা রঙীন ছবিকে যে কেবল রেখার সাহায্যে (etching), আরেক রকমের রং-হীন চিত্র করে' তোলে, সে-ও একটা নতুন উপায়ে, সেই মূল ছবির ভিতরকার রং, তার একটা সূক্ষ্মতর রূপ—সেই ছবির ছবিত্ব—আরও ভালো করে' ফুটিয়ে তোলে। অতএব, সেও এক অর্থে ঐ মূল শিল্পকর্ম্মটিকে আর এক রকম ক'রে দেখাতে পারে—সে রূপ ঠিক ঠিক সেই আগের রূপ নয়। এই ধরণের ক্রিটিক যারা, তাদের কাজ দেখে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, ঐ রকম দেখানো বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় কেবল একটা কারণে,—তাদের সেই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি বা ব্যক্তিত্বই সেই কারণ। রুবিন্‌ষ্টাইন যখন বেটোফেনের কোন বিখ্যাত রাগিণী আলাপ করেন, তখন তিনি শুধুই বেটোফেনের প্রতিধ্বনি করেন না—সেই সঙ্গে নিজের প্রাণের সুরও তাতে যুক্ত করেন; তাইতেই আমরা মূল বেটোফেনকে আরও গভীর করে'—নির্ব্বিশেষ করে' পাই। কারণ, তখন আর একজন শ্রেষ্ঠ রসিকের রসচেতনায় তাঁর রচিত সেই সুরটিই আরেক রকম করে' জীবন্ত হয়ে উঠে—যেন আর একটি কবিচিত্তের সংস্পর্শ লাভ করে' আরও অপূর্ব্ব, আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—তা'তেই বেটোফেনের ব্যক্তিত্ব যেন আরও প্রসারিত, তার সত্যটা আরও সত্য হয়ে ওঠে। একজন খুব বড় অভিনেতা যখন শেকস্‌পীয়রের নাটক অভিনয় করেন, তখন আমাদের সেই রকমের অনুভূতি হয়; তিনি সেই চরিত্রটির যে নূতনতর ব্যাখ্যা আমাদের সামনে ধরেন, তার মধ্যে তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব এমন সচ্ছন্দে প্রবেশ করতে পারে ব'লেই, সে যেন শেকস্‌পীয়রকেই আরও প্রসারিত করে দেওয়া। লোকে এমন কথা বলে বটে যে, অভিনেতাদের প্রত্যেকেই নিজের নিজের মনগড়া হ্যামলেট অভিনয় করে, সে হ্যামলেট শেকস্‌পীয়রের নয়। কথাটা আদৌ সত্যি নয়। আসলে শেকস্‌পীয়রের হ্যামলেট-চরিত্রের একটা সুনির্দ্দিষ্ট রস-রূপ থাকলেও, তার আরেকটা দিকও আছে, যেটা জীবনের দিক—অর্থাৎ না-ধরা-দেওয়া দিক, অস্পষ্ট অজানার দিক। মানুষের যত রকম মন-খারাপের ব্যারাম আছে—হ্যামলেটও জগতে ততগুলো আছে।

আ—অ্যাঁ! মনের যত রকম ব্যারাম ততগুলো হ্যামলেট!

গি—আর, যেহেতু ব্যক্তির ঐ ব্যক্তিত্ব-চেতনার থেকেই যত কিছু আর্টের জন্ম হয়, সেইজন্যে শিল্পসৃষ্টির অন্তরতম রূপটিও সেই ব্যক্তির কাছে ধরা দেয়—যার নিজের ব্যক্তিত্ব-চেতনা খুব প্রখর ও বলিষ্ঠ। দুই পক্ষের এই দুই চেতনা যখন পরস্পরকে স্পর্শ করে, তখনই খাঁটি ব্যাখ্যামূলক সমালোচনা সম্ভব হয়।

আ—তা'হলে দেখা যাচ্ছে, ঐ রকম ব্যাখ্যাকার ক্রিটিক যে—সে মূল শিল্পরচনা থেকে যতখানি পায়, দেয়ও ততখানি; শিল্পীর কাছে ক্রিটিক যতখানি ঋণী, শিল্পীও ততখানি ঋণী ক্রিটিকের কাছে।

গি—যত প্রাচীন কলাকীর্ত্তি ক্রিটিকরাই ত' কালে কালে নতুন চিন্তা, নতুন আদর্শের দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করে'—সেগুলোকে চিরজীবী করে রাখে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, মানুষের সভ্যতা যত বৃদ্ধি পাবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন-বুদ্ধি ও প্রবৃত্তিগুলো যত সুমার্জ্জিত ও সুসঙ্গত হয়ে উঠবে, ততই প্রত্যেক যুগের যাঁরা শ্রেষ্ঠ মনীষী ও রসিক, তাঁরা ক্রমশঃ বাস্তব জীবন নিয়ে মাথা ঘামানো ছেড়ে দেবেন, একমাত্র আর্টের দ্বারা যেখানে যা সৃষ্টি হয়েছে তার থেকেই তাঁরা মনের সব-কিছু খোরাক সংগ্রহ করে' নেবেন। কারণ, জীবনের যা' কিছু দেখতে পাও, তার কোন শ্রী-ছাঁদ নেই; যে দুর্ঘটনাগুলো ঘটে, তা'ও ভুল ক'রে ঘটে—ঠিক মানুষটার উপরেও ঘটে না; সুখকর যা কিছু ঘটে তার মধ্যেও একটা বিকট ভয়াবহতা থাকে; ট্রাজেডিগুলো ত' প্রহসনে পরিণত হয়!

আ—হায়! হায়! জীবনের কি দুর্দ্দশা! মানুষের কি বিড়ম্বনা! জীবনের যে করুণ রস, যে রসকে একজন রোমান কবি জীবনের সারবস্তু বলেছেন, তাতেও কি তোমার প্রাণটা একটু সাড়া দেয় না?

গি—বরং বড্ড বেশি তাড়াতাড়ি সাড়া দিয়ে ফেলে। কারণ, তখন অতীতের দিকে ফিরে তাকাই, সেই সব নিবিড় গভীর হৃদয়াবেগের কথা ভাবি, সেই সব ক্ষণগুলো—সেই আনন্দে বিভোর বা সুখে মাতোয়ারা হয়ে ওঠা! তখন মনে হয়, সে যেন স্বপ্ন, মিথ্যা মোহমাত্র। যে-সব কামনা এককালে আগুনের মত দহন করেছিল, তাদের মত অবাস্তব কিছু আছে? সব চেয়ে অবিশ্বাসের বস্তু কি?—না, যা' একদিন সারা প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করেছিলাম। সব চেয়ে অভাবনীয় অসম্ভব কি?—

না, যা' একদিন নিজ হাতে করেছি। না, আর্নেষ্ট, জীবন আমাদের কেবল ঠকিয়েই চলেছে—সে যেন পুতুলনাচের বাজিকর! আমরা তার থেকে সুখ চাই, সেও দেয় বটে, কিন্তু তারই সঙ্গে নিতে হবে দারুণ হতাশার দুঃখ। যদি বা এমন একটা মহৎ দুঃখ পাই—যার সেই মহিমা আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনকে ট্র্যাজেডির রাজপোষাকে মণ্ডিত করেছে বলে' আশ্বস্ত হই, তাকেও বেশি দিন ধরে' রাখতে পারিনে—তার চেয়ে ঢের ছোট একটা কিছু সেই স্থান অধিকার করে' বসে। কোন এক সকালবেলার মেঘলা-ধূসর আলোয়, কিম্বা শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে কোন এক পুষ্পগন্ধময় নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়, আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করি যে, যে-সোনালী কেশগুচ্ছটিকে এত যত্নে সোনার কৌটোয় তুলে রেখেছিলাম—যাকে একদিন পাগলের মত বুকে চেপেছি, চুমু খেয়েছি, সে আর প্রাণে এতটুকু সাড়া জাগায় না, তার পানে চেয়ে চোখে আর এতটুকু ঘোর লাগে না!

আ—তা'হলে জীবন একেবারে নিষ্ফল বলতে চাও?

শি—যারা আর্টের উপাসক তাদের চক্ষে ত' বটেই! জীবনটা তাদের কাছে মূল্যহীন হ'য়ে যাওয়ার একটা বড় কারণ—তার ব্যবহারটা অতি নীচ কৃপণের মত। একবার তুমি প্রাণে যে জিনিষটি গভীরভাবে অনুভব করেছ, ঠিক তেমনটি আর কখনো আর একবার অনুভব করতে তোমাকে সে দেবে না। কিন্তু আর্টের জগতে ঠিক এর বিপরীত। ঐ যে শেল্‌ফের উপর 'ডিভাইন কমেডি'খানা রয়েছে—আমি জানি, যদি ওর কোন একটা জায়গা খুলে পড়তে বসি, তা'হলে তখনই আমার প্রাণে ভীষণ বিদ্বেষের সঞ্চার হবে এমন একজনের উপর, যে কখনো আমার কোন অনিষ্ট করেনি; কিম্বা হয়ত' এমন একজনের প্রেমে আমার প্রাণ ভরপূর হয়ে উঠবে, যাকে আমি কখনো দেখিনি, দেখবো না। এমন কোন ভাবের আবেগ নেই যা' আর্ট আমাদের প্রাণে সৃষ্টি করতে পারে না। কখন্ কোন্ রকমটি উপভোগ করব, তা'ও আগের থেকে ঠিক ক'রে নিতে পারি—দিনটি, ক্ষণটি পর্য্যন্ত। নিজের মনে নিজেই বলব—কাল খুব ভোরবেলায় আমরা ভার্জিলকে সঙ্গে করে' বেড়িয়ে আসব মৃত্যু-তটিনীর ছায়াচ্ছন্ন উপত্যকায়। ঠিক তাই হবে। ভোর হ'তেই অন্ধকার

বনপথে গিয়ে পৌছব, দেখব পথের পাশে মাণ্টুয়াবাসী মহাকবি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সেই নদীতীর-ভূমি যে-ঘাসে আর ফুলে ভ'রে গেছে তার কি রং!—কাটা-মরকতমণির চেয়ে সবুজ, ভারতীয় দেবদারুর চেয়ে সুন্দর! সিঁদুর কিম্বা রূপোর চেয়ে চোখ-ঝলসানো সেই সব ফুল! সেখানে মৃত্যু-নদীর সেই ছায়াচ্ছন্ন উপকূলে যারা গান করে' বেড়াচ্ছে তারা এই পৃথিবীতে রাজা হ'য়ে রাজত্ব করেছিল একদিন। তারপর, আমরা সেই যাদুমন্ত্রময় সোপানাবলী আরোহণ করে' ক্রমে উর্দ্ধ হ'তে উর্দ্ধলোকে উঠতে থাকব, তারাগুলো আরও বড় দেখাবে, রাজাদের সেই গান অস্পষ্ট হয়ে আসবে। শেষে আমরাও মর্ত্ত্যের সীমানায় সেই স্বর্গপুরীতে গিয়ে পৌছব, যেখানে সাতটি স্বর্ণময় তরু দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেখানে গ্রিফিন বাহিত রথের উপরে একজনের দেখা পাব—তার কপালে অলিভ-পাতার মুকুট, সর্ব্বাঙ্গ শাদা ওড়নায় ঢাকা, বহির্ব্বাসখানি সবুজ, আর আংরাখার রং জ্বলন্ত পাবকশিখার মত! তাকে দেখবামাত্র বুকের ভিতর সেই চিরন্তন বাসনাবহ্নি আবার জ্বলে' উঠবে, শিরায় শিরায় দুরন্ত হ'য়ে উঠবে রক্তস্রোত। তখনি তাকে চিনতে পারব। সে সেই বিয়াত্রিচে—সেই নারী, যে-নারীকে আমরা চিরদিন আমাদের প্রাণের পূজা নিবেদন করেছি। যে তুষার আমাদের বুকে জমাট বেঁধেছিল এতদিন, এখন তা' নিমিষে গলে' গেল; আর্ত্ত-হৃদয় ভেদ করে উথলে উঠল সেই অশ্রু—অঝোরে ঝরতে লাগল। তখন তার সামনে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানালাম আমরা; কারণ তখনই জ্ঞান হল যে, আমরা সত্যিই পাপী। তারপর যখন প্রায়শ্চিত্ত করে' আমরা শুচি হ'লাম, বিস্মরণী-কুণ্ডের জল অঞ্জলি ভরে' পান করলাম, 'ইউনো'-নদীতে অবগাহন করে' প্রাণ-মন শুদ্ধ হল,—তখন আমাদের হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী সেই দেবী হাতে ধরে' তুলে নিলেন একেবারে উর্দ্ধতম স্বর্গপুরীতে। সেখানে বিয়াত্রিচে তাঁর চোখদুটিকে পরমেশ্বরের মুখের উপরে স্থিরনিবদ্ধ করে' রইলেন—সে চোখ তেমনই চেয়ে রইল। আমরা সেই পরম-দর্শনের পরমানন্দ লাভ করলাম—যে-প্রেম আকাশের গ্রহতারকাকে গতিমান করেছে, আমরা সেই প্রেমের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করলাম।

হাঁ, ফ্লোরেন্সের সেই মহাকবির সঙ্গে আমরাও একপ্রাণ হয়ে যেতে

পারি ; একই মন্দিরে তাঁর সঙ্গে নতজানু হ'য়ে একই দেবতার আরাধনা করতে পারি , তাঁর হৃদয়ের সেই দিব্যোন্মাদ আর সেই দারুণ বিদ্বেষ-বিষ দুইয়েরই অংশীদার হ'তে পারি আমরা। আবার, যদি প্রাচীন কালের এই সকল ভাবকল্পনা আমাদের আর ভাল না লাগে, যদি আমাদেরই কালের এই ক্লান্তি ও অবসাদ, এই অতি-মধুর পাপের উন্মাদনা প্রাণে অনুভব করতে চাই, তা'হলে, তার জন্যেও এমন সব বই রয়েছে—যার দৌলতে, মাত্র একঘণ্টা সময়ে এত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করব, যা' বিশবৎসর অসৎ জীবন যাপন করলেও পাব না। তোমার হাতের কাছে ঐ যে ছোট্ট একখানি বই রয়েছে—সবুজ চামড়ায় বাঁধানো, গায়ে সোনার রেণুর মত নেনুফারের গুঁড়ো ছড়ানো, আর খুব শক্ত হাতির দাঁতের পালিশযন্ত্র দিয়ে পালিশ করা—ওখানা হচ্ছে বোদ্‌লেয়ারের শ্রেষ্ঠ রচনা, গোতিয়ে'র বড় প্রিয় ছিল ওই কাব্যখানি। ওর যেখানে সেই করুণ গানটি আছে সেইখানটায় খোল, সেই যে—

"হোক্ সে কামিনী জ্ঞান-গম্ভীর,
অথবা রূপসী অতি !
বিষাদ-প্রতিমা যদি বা সে হয়,
হোক্‌না—কি তাহে ক্ষতি ?"

—ঐ যে আরম্ভ হয়েছে কবিতাটা ওর সবটা পড়লে, পরের দুঃখকেও এমন মধুর লাগবে—নিজের সুখকেও যা কখনো লাগেনি। তার পর সেই কবিতাটি পড়' যা'তে একজন ইচ্ছে করে' নিজেকে নিজেই যন্ত্রণা দিচ্ছে। ওর ওই ছন্দটা আস্তে আস্তে তোমার মাথায় প্রবেশ করুক, ওর রঙে তোমার মন রঙীন হয়ে উঠুক, তখন দেখবে, একমুহূর্তে তুমিও ঠিক সেই ব্যক্তি হয়ে উঠেছ—ওই কবিতাটি যে রচনা করেছিল। সমস্ত বইখানাও পড়ে' ফেলতে পারো, ওর ভিতরে যে সব গভীর-গোপন অনুভূতির আমেজ আছে, তার একটাও যদি তোমার প্রাণে লাগে, তা'হলে তুমিও পিপাসার্ত হ'য়ে ওই কাব্যের বিষ-মধু পান করতে থাকবে ; তোমার প্রাণ এমন সব উন্মত্ত পাপ-সুখের প্রায়শ্চিত্ত করতে অধীর হয়ে উঠবে, যা' আচরণ করা দূরে থাক—কখনো কল্পনাও করোনি। তার পর, এই রকম বিষ-পুষ্পের সৌরভ যদি আর ভাল না লাগে, তুমি অনায়াসে অন্য ফুলের

মধু আহরণ করতে পারো। তুমি সেই সিরিয়াবাসী কবিকে তার বহুকাল-বিস্মৃত কবর থেকে জাগিয়ে তুলতে পারো—সেই মেলিয়াগের, সুন্দরী হেলিওদোরার প্রণয়ী ছিল যে। সে-ও তার গান শোনাবে তোমাকে; তার গানে ফুলের ছড়াছড়ি,—লাল রঙের আনার-কলি, গুগ্‌গুল-গন্ধী আইরিস, পাপ্‌ড়িতে গোল-গোল দাগ-কাটা ড্যাফোডিল, ঘোর-নীল হায়াসিন্থ, মারজোরাম, আরও কত কি! কবির প্রিয়তমা যখন ফুলের বাগানে বেড়িয়ে বেড়াতেন তখন তাঁর সেই পা দু'খানি পড়ত —যেন এক ফুলের উপরে আর একটি ফুল চেপে বসছে! তাঁর ঠোঁট দু'খানি ছিল ঘুমে-ভরা পপি-ফুলের টুকটুকে পাপড়ির মত, ভায়োলেট ফুলের চেয়ে কোমল—তেমনই সুগন্ধি। তাঁর মুখখানি দেখবে বলে' ঘাসের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে আগুন-রাঙা ক্রোকাস ফুল। তাঁরই জন্যে দীর্ঘতনু নার্শিসাস স্নিগ্ধশীতল বারিবিন্দু ধরে' রেখেছে তার সরু গেলাসটিতে; তাঁরই সঙ্গসুখ পাবার জন্যে ঐ মাটিতে এসে ফুটেছে আনিমোনি-ফুল—সিসিলী-সমীরণের প্রেম-নিবেদন তুচ্ছ করে'! তবু ক্রোকাস, আনিমোনি, নার্শিসাস—এদের কেউই তাঁর মত সুন্দর নয়!

এই যে—একজনের প্রাণে যা' হয় তাই আর একজনের প্রাণেও পৌঁছে দেওয়া—এও কম আশ্চর্য্যের ব্যাপার নয়। কবিদের অসুখগুলো আমাদেরও অসুস্থ ক'রে তোলে। কেউ আপন ব্যথায় আপন সুরে গান গাইছে—সে গান শুনে আমাদেরও প্রাণে সেই ব্যথা জাগে। যে মরে' গেছে তারও মুখের কথা ফুরোয় না; যে-হৃদয় মাটিতে মাটি হয়ে গেছে তার আনন্দ এখনও সাড়া জাগায় আমাদের প্রাণে। রেখে দাও তোমার ঐ জীবনের কথা! আমাদের প্রাণ-মনের কতটুকু অভাব পূরণ করতে পারে সে? জীবনের সব কিছুই বাস্তবের ক্ষুদ্র সীমায় সীমাবদ্ধ; জীবনের যে ভাষা তা অতিশয় খাপছাড়া; তার কোন কিছুতে ভাবের সঙ্গে রূপের সামঞ্জস্য নেই—যা' না থাকলে কোন ভাবুক বা রসিকের প্রাণ তৃপ্ত হতে পারে না।

আ—তা' হ'লে আর্ট ছাড়া আমাদের আর গতি নেই দেখছি!

গি—নয় ত কি? কারণ, আর্ট কোথাও ব্যথা দেয় না, আঘাত করে না। নাটকের অভিনয় দেখে আমাদের চোখ দিয়ে যে জল গড়ায়, তার সঙ্গে

কোন ফলাফলের সম্পর্ক নেই; সেই রকম নিফল ভাবাবেশ সৃষ্টি করাই আর্টের কাজ। আর্টও আমাদের কাঁদায় বটে, কিন্তু তাতে বুক ফাটে না; আমাদের শোক হয়—কিন্তু সে শোকে কোন যাতনা থাকে না। বাস্তব-জীবনে মানুষ যে শোক পায়—স্পিনোজা বলেছেন - তার ফলে চিত্তের মলিনতা ঘটে; কিন্তু কাব্য নাটক প্রভৃতি কলাশিল্পের যে করুণরস —তাতে আমাদের চিত্তের মলিনতা দূর হয়, আমরা দ্বিজত্ব লাভ করি; এও সেই গ্রীক সমালোচকদেরই উক্তি। একমাত্র আর্টের সাধনা ক'রেই আমাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'তে পারে; বাস্তব-জীবনের যতকিছু ঘৃণ্য দুর্দ্দশা থেকে একমাত্র আর্টই আমাদের রক্ষা করতে পারে। জীবনের সুখ যতই প্রলুব্ধ করুক, তার দুঃখ হৃদয়কে যতই ক্ষত-বিক্ষত করবার চেষ্টা করুক, আমাদের তাতে আর তখন কিছু এসে যায় না। আমরা সত্যিকার আনন্দ পাব সেই সব মানুষের কাহিনী থেকে—যারা কোনকালে পৃথিবীতে ছিল না; কেবল তাদেরই শোকে অশ্রুবর্ষণ করব—কর্ডেলিয়া কিম্বা দেস্‌দিমোনার মত যারা কোনকালে মরে না, মরবে না।

আ—একটু থামো। আমার মনে হচ্ছে, তোমার এসব কথার মূলে কোন নীতি-ধর্ম্ম নেই।

গি—মানি। কারণ, আর্টের দ্বারা যে-সব ভাবের উদ্রেক হয় তাতে আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না—ঐ ভাবগুলোই যথেষ্ট। আর, বাস্তব জীবনে—তা' সে ব্যক্তির জীবনই হোক, আর সমাজ-জীবনই হোক—সকল ভাবাবেগের একটা উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন আছে—সে হচ্ছে কোন একটা কর্ম্মে প্রবৃত্ত করা। সমাজ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ নীতি-ধর্ম্মের জন্ম হয়েছে; কারণ, মানুষের শক্তিকে সংহত করবার জন্যই সমাজ; সেই সমাজকে স্থায়ী ও মজবুত করতে হ'লে, সমাজের সকলের হিতার্থে প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে যে কিছু-না-কিছু কর্ম্ম দাবী করা হয়, তা' খুবই ন্যায়সঙ্গত। কর্ম্ম তার চাইই; এমন কি, দুষ্কর্ম্মাকেও সে ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু নিষ্কর্ম্মার ক্ষমা নেই। অভিপ্রায়টা খুবই সাধু সন্দেহ নেই। কিন্তু এরই একটা কথা বুঝিয়ে দেওয়া উচিত, সে হচ্ছে এই যে, যারা ভাবুক বা ধ্যানী, অর্থাৎ কোন কর্ম্ম করে না, সমাজনীতির দিক দিয়ে তারাই সবচেয়ে অপরাধী

হ'লেও—শ্রেষ্ঠ সাধনার দিক দিয়ে, ঐ ধ্যান-চিন্তা ও কল্পনাই হচ্ছে একমাত্র বৃত্তি যা' মানুষকে শোভা পায়।

আ—ধ্যান-চিন্তা !

গি—হাঁ, ধ্যান-চিন্তা। কিছু আগে আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, কোন কর্ম্ম করার চেয়ে তার সম্বন্ধে কিছু বলা ঢের বেশি শক্ত। এখন আরও বলি যে, কিছু-না করাই সবচেয়ে দুঃসাধ্য এবং অতি গভীর জ্ঞান-সাপেক্ষ। যে প্লেটোর জ্ঞানপিপাসা প্রবল ছিল, তিনিও বলেছেন, ঐ ধ্যান করার শক্তিই সবচেয়ে বড় শক্তি। আবার বিজ্ঞানের এতবড় ভক্ত ছিলেন যে আরিষ্টটল তাঁরও ঐ এক মত। মধ্যযুগের যোগী-সন্ন্যাসীরাও নিষ্কাম জীবন যাপন করতে যে এত উৎসুক ছিলেন তা'ও ঐ শক্তি অর্জ্জন করবার জন্যে।

আ—তা' হলে কিছু না-করার জন্যেই আমরা বেঁচে আছি।

গি—যে-জন সুখাসনে বসে' স্থিরদৃষ্টিতে সব কিছুর পানে চেয়ে থাকে, ভাব-মগ্ন হ'য়ে যে নির্জ্জনে পাদচারণা করে, তার দৃষ্টি যেমন অবাধ তেমনই অভ্রান্ত। কিন্তু আমরা যারা সেই চমৎকার যুগ পার হ'য়ে যাবার পর জন্মেছি—আমাদের মন এত বেশি সজাগ, আমাদের বিচারবুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ, অতি-সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সুখের জন্য আমরা এত উৎসুক যে, জীবনকে ভোগ না করে' তার সম্বন্ধে বড় বড় তত্ত্বের ধ্যান করতে আমরা মোটেই রাজি নই। অধ্যাত্ম-বিদ্যা আমাদের ধাতে সয় না, ভক্তের ভাব-সমাধিও নিতান্ত সেকেলে হ'য়ে পড়েছে। তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতেরা যে-জগতে বাস করেন বলে' তাঁরা ত্রিকালদর্শী হয়ে ওঠেন, সেটা আসলে ভাবসৌন্দর্য্যের জগৎ নয়—সূক্ষ্ম-চিন্তার জগৎ। সে জগতে প্রবেশ করলে, চিন্তা-গণিতের সেই অতি নীরস তাপহীন বায়ু সেবন করে' আমাদের একেবারে উপবাসী হয়ে থাকতে হবে। না, আর্নেষ্ট, সে আমরা পারব না, আমরা ফিরে আবার সাধু-সন্ন্যাসী হতে পারব না; বরং যারা পাপ করে, তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখবার ইচ্ছে আছে। যারা রূপ-রসিক, তাদের কাছে ঐ সব অস্পষ্ট ধোঁয়া-ধোঁয়া জিনিষ অতিশয় অরুচিকর। গ্রীকরা যে এমন একটা রূপরসিক শিল্পীর জাত ছিল, তার কারণ, অনন্ত অসীম বা ভূমার অনুভূতি থেকে তারা নিষ্কৃতি পেয়েছিল। আরিষ্টটলের মত—কিম্বা কাণ্ট-

দর্শন পড়ার পর গ্যেটের মত, আমরাও রূপ চাই, দেহ চাই; তা'ছাড়া আর কিছুতেই আমাদের পিপাসা মিটবে না।

আ—তা' হলে, তোমার মতটা এখন কি দাঁড়াল?

শি—আমার মনে হয়, এই রকম সূক্ষ্ম ভাব-দৃষ্টি যত বাড়বে ততই আমরা শুধুই নিজেদের জীবনটাই আমাদের চেতনায় নিজস্ব করে' নিতে পারব; সেই হবে সত্যিকার আধুনিকতা—আমাদের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বাংশে আধুনিক হয়ে উঠবে। নিজের সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে হ'লে আর সকলকেও তেমনি করে' জানতে হবে। এমন কোন ভাবাবস্থা নেই, আমার পক্ষেও যা' সম্ভব হবে না; জীবনকে ভোগ করার এমন কোন প্রাচীন রীতি নেই যাকে আমরা পুনর্জ্জীবিত করতে না পারব। সে কি অসম্ভব? আমার বিশ্বাস, অসম্ভব নয়। জীবনকে ঐ কর্ম্মনীতির বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারলে, আমাদের ধ্যান করবার, কল্পনা করবার শক্তি বেড়ে যাবে। এর পক্ষে একটা বড় সমর্থন আমরা পেয়েছি আধুনিক বিজ্ঞানের "বংশধারা"র ঐ তত্ত্বটি থেকে; তাতে দেখা যাচ্ছে, আমরা যা কিছু করি, তাতে আমাদের ব্যক্তিগত কর্ত্তৃত্ব কিছু নেই—সেই বংশানুক্রমের যে নিয়তি, তারই বশে সকল কর্ম্মই আমরা যন্ত্রবৎ করে' থাকি। ঐ বিজ্ঞান বলে' দিয়েছে যে, আমরা যখন কিছু করি, তখনই আমরা সবচেয়ে বদ্ধ। ঐ বিজ্ঞানের আলোয় আমরা সেই বন্ধন রজ্জুটা দেখতে পেয়েছি সে যেন শিকারীর পাতা ফাঁদের মত আমাদের চারদিক আটক করে' রেখেছে; আমাদের শেষ পরিণাম যে কি, তা'ও তার থেকে বুঝতে পারি।

তবু বাইরের জগতে কর্ম্মের স্বাধীনতা, অর্থাৎ মনোমত জীবন-যাপনের অধিকার হরণ করলেও, ঐ নিয়তি আমাদের একটা বড় উপকারও করেছে। আমরা যখন মনোজগতে বাস করি, তখন আমাদের অন্তরাত্মার সুমুখে তার ভয়াল মূর্ত্তিটা এসে দাঁড়ায় বটে, কিন্তু সেই-ই আবার আমাদেরকে কত অমূল্য ধনে ধনী করেছে! যেহেতু আমাদের এই জীবন একার জীবন নয়, বহু মৃত-পুরুষের জীবনধারা তার তলে তলে প্রবাহিত হচ্ছে; যেহেতু আমাদের এই অন্তর-পুরুষটা একটা পুরুষ নয়—বহু পুরুষ, এবং সেই বহু পুরুষ কত ভয়ানক স্থানে বিচরণ করেছে, অতীতের কত কবরখানায়

ছিল তার আস্তানা—সেইজন্যে, আমাদের মনের মধ্যে সেই বহু পুরুষের বহু ব্যাধি ভিড় করেছে এসে, কত জীবনের কত পাপ আমাদের স্মৃতির অতলে মূর্চ্ছিত হয়ে রয়েছে। আমরা সজ্ঞানে যতটুকু জানি, অজ্ঞানে তার চেয়ে বেশি জানি; সেই জ্ঞান বিষময়। সেই যে আমাদের ভিতরকার আর একটা আমি সেই 'বহু আমি'—সে আমাদের প্রাণে কত দুরূহ দুরাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে, যা কখনো পাবো না জানি, তারি পিছনে আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। আবার সেই কারণেই সে আমাদের একটা মহা উপকার করতে পারে, আর্টে,—এই একঘেয়ে অতি-পরিচিত বাস্তবের বাঁধন থেকে মুক্তি দিতে পারে। ওরই কল্যাণে, আমরা আমাদের এ-জন্মের এ-কাল থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারি, কত অতীত যুগের অ-দেখা জগতে ফিরে যেতে পারি —সে যুগ, সে জগৎ আমাদের অপরিচিত বলে' মনে হবে না। ওরই কল্যাণে, আমরা এ জীবনের এই ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করে' মহত্তর জীবনের মহিমা লাভ করতে পারি। কবি লেওপার্দ্দি যে বেদনায় অধীর হ'য়ে সারা জীবন আর্ত্তনাদ করেছিলেন, সেই মহা-বেদনা আমাদের বুকেও তেমনি বেজে ওঠে; থিওক্রিটাস তাঁর বাঁশিতে ফুঁ দিচ্ছেন—তাই শুনে' মাঠের রাখালদের সঙ্গে, বনের বনদেবীদের সঙ্গে, আমরাও প্রাণের আনন্দে কলহাস্য করে' উঠি; আমরাও ল্যান্সেলটের মত আপাদ-মস্তক যোদ্ধবেশ প'রে প্রণয়িনী রাজমহিষীর বিলাসকক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হই; আমরাও, আবেলার্ডের মত, সন্ন্যাসীর বহির্বাসে মুখ ঢেকে গোপনে মৃদুস্বরে প্রেম-নিবেদন করি; আবার কবি 'ভীয়োঁ'র (Villon) মত, সদ্য কোন পাপকর্ম্ম করে' এসে, সেই পাপকে গানের সুরে মধুময় করে' তুলতে পারি; আমরাও কবি শেলীর চোখ দিয়ে উষার অকলুষ রূপমাধুরী পান করি; আবার, যখন এণ্ডিমিয়নের সঙ্গে পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করি, তখন আকাশের ঐ জ্যোৎস্না-রূপসী আমাদেরই যৌবন-লাবণ্য দেখে লালসাতুর হয়ে ওঠে। তুমি কি মনে কর, এই যে অসংখ্য জীবনের হর্ষ-বিষাদ আমরা ভোগ করি, সে কেবল কল্পনার জোরে? তা' বলতে পারো—কল্পনাই বটে; কিন্তু সে কল্পনা ঐ বংশানুক্রম থেকেই জন্মেছে—জন্মজন্মান্তরব্যাপী গোষ্ঠ-গত জীবনের যত কিছু স্মৃতি ঐ কল্পনার আকারে ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছে!

আ—কিন্তু এতে বিচার-বুদ্ধির কাজ রয়েছে কোথায়?

গি—এই যে বহু-জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার থেকে একটা ভাবাবস্থার সৃষ্টি হয়, সেটাকে ঐ বিচার-বুদ্ধি দিয়েই ত' শোধন করে নেওয়া সম্ভব;—তাই বা কেন? ঐ ভাবুকতাই এক রকমের বিচার-বুদ্ধি। কারণ, সত্যিকার উঁচুদরের ক্রিটিক ত' সে-ই—যার অন্তরে অতি দীর্ঘ পুরুষ-পরম্পরায় কত স্বপ্ন, কত ভাবচিন্তা, কত অনুভূতি সঞ্চিত হয়ে আছে; যার কাছে কোন ভাব, কোন চিন্তাই অপরিচিত নয়। এই কারণে, সে-সবগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করে', তাদের পার্থক্য বিচার করে', তার এমন একটি মনোভাব গড়ে ওঠে যে, কিছুতেই আর বিচলিত হয় না সে—সবগুলোকে নির্ব্বিকারভাবে উপভোগ করতে পারে। এইরকম অনাসক্ত ভাবে সব কিছুকে উপভোগ করতে পারাই ত' দেবতাদের সমকক্ষ হওয়া।

সত্যি, আর্নেষ্ট, এই যে ধ্যানীর মত জীবন যাপন করা—যে জীবনে কিছু করা নয়, কেবল 'আছি' এইটেই অনুভব করা যায়, এবং শুধুই 'আছি' নয়, ভিতরে ভিতরে ক্রমেই এগিয়ে চলেছি, উন্নত হচ্ছি—এই যে জীবন, এ কেবল ঐ ক্রিটিক বা রসবিচার-নিপুণ ব্যক্তি ছাড়া আর কারো পক্ষে যাপন করা সম্ভব নয়। স্বর্গের দেবতারাই কেবল এমন জীবন যাপন করে' থাকেন,—আরিষ্টটলের মতে, তাঁরা কেবল নিজেদের মহিমা-ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন; এপিকিউরাসের কল্পনা আরও চমৎকার—তিনি বলেছেন, দেবতারা তাঁদের সৃষ্ট এই জগতের যত কিছু হাসিকান্না নিরুদ্বিগ্ন হৃদয়ে, শান্ত অপলক দৃষ্টিতে কেবল চেয়ে দেখেন, কোন রকম ভাবান্তর হয় না তাঁদের। আমরাও এই আধ্যাত্মিক শান্তিসুখ লাভ করতে পারি, যদি কর্ম্মবন্ধন একেবারে ত্যাগ করি; শক্তির ঐ নেশা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারলে আমরাও তেমন দেবত্বের অধিকারী হতে পারি, আমরাও ধ্যান-চিন্তার অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করে' এই জগতের পানে তেমনি করে' চেয়ে থাকতে পারি। রসপান তৃপ্ত ক্রিটিক যিনি—তিনি আত্মস্থ আত্মচরিতার্থ ও নিরুদ্বিগ্নভাবে এই জগৎ দৃশ্যের রহস্যধ্যান করেন; তাঁর মনের সেই বর্ম্মখানির কোনখানে একটু জোড় বা ফাঁক থাকে না, যেখান দিয়ে বাইরের কোন তীর এসে তাঁকে বিদ্ধ করতে পারে।

একমাত্র তার জীবনই নিরাপদ—কেমন করে' আদর্শ-জীবনযাপন করতে হয়, তা' কেবল সেই জানে।

তুমি হয়ত' বলবে, এ রকম জীবন ধর্ম্মবিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ; তা' ঠিক। যতকিছু শিল্পকর্ম্ম আছে সবই নীতিবিরুদ্ধ, কেবল কতকগুলো ছাড়া—সে-সব আর্ট অতিস্থূল ইন্দ্রিয়ঘটিত, বা নীতি-উপদেশ-মূলক আর্ট। তাদের অভিপ্রায় হচ্ছে, মানুষকে কোন সৎ বা অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেওয়া, কারণ, কর্ম্মমাত্রেই নীতি শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। আর্ট ত' কোন কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেয় না—মনে একটা ভাবাবস্থার সৃষ্টি করে মাত্র। তুমি বলবে, এ রকম জীবন বাস্তবতাবর্জ্জিত—ব্যাবহারিক কোন মূল্যই এর নেই, অর্থাৎ অত্যন্ত অকেজো! হায়, হায়, অকেজো হওয়া যে মোটেই সহজ নয়, পাকা সংসারী যারা তারাই তা' মনে করে বটে। তা' যদি হ'ত, তাহ'লে অন্ততঃ ইংলণ্ডের পক্ষে খুব ভালই হ'ত। পৃথিবীতে এমন আর একটি দেশ নেই যেখানে অকেজো লোকের দরকার এত বেশি। আমাদের স্বভাব এমনি যে, বিশুদ্ধ চিন্তাবস্তুও আমাদের পাল্লায় পড়ে' বিশুদ্ধ থাকতে পারে না—কার্য্যকারিতার তাগিদে তাকেও একটা কাজে লাগানো চাই। প্রত্যেক কর্ম্ম বা বৃত্তির সঙ্গে এক-একটা ক্ষুদ্র সংস্কার অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছে। কর্ম্ম-জীবনে সাফল্য লাভ করতে হ'লে তোমাকে কোন-না-কোন পক্ষ অবলম্বন করতে হবেই। আমরা যে যুগে বাস করছি সেটা হচ্ছে অতি-পরিশ্রম ও অল্প-শিক্ষার যুগ,—এমন হাড়ভাঙা খাটুনির ফলে মানুষের বুদ্ধি একেবারে ভোঁতা হয়ে যায়। কথাটা শুনতে একটু নিষ্ঠুর হ'লেও আমি বলব, এ সব মানুষের ঐ রকম শাস্তি হওয়াই উচিত। জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়ে থাকার সবচেয়ে সোজা উপায়—নিজেকে কাজের লোক ক'রে তোলা।

আ—তোমার এই মতবাদটি বড়ই চমৎকার!

গি—তা আমি ঠিক বলতে পারিনে,—তবে চমৎকার যদি নাও হয়, তবু ওর একটা ছোট রকমের গুণ আছে—ওটা সত্য। পরহিতৈষণার যত কুফল আছে তার মধ্যে সব চেয়ে কম কোন্‌টা জানো?—ঐ অসংখ্য বেরসিক বর্ব্বরের দল সৃষ্টি করা। মানবপ্রেমের বশে যে সব দয়া-দাক্ষিণ্য করা হয়ে থাকে, সে যে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী—তাতে করে' যে অনুপযুক্ত

অক্ষমগুলোকেই বাঁচিয়ে রাখা হয়—এ কথা চিন্তা করলে, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরাও যে ঐ রকম নির্ব্বিচার-ধর্ম্মকর্ম্মকে ঘৃণার চক্ষে দেখবেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যাঁরা ভাবুক ও চিন্তাশীল তাঁদের চক্ষে এই ধরণের ভাবাবেগ-প্রসূত পরোপকার আর এক কারণে নিন্দনীয়—ওর দ্বারা মানুষের জ্ঞানবৃত্তিকে চেপে রাখা হয়, এবং তার ফলে, একটাও সামাজিক সমস্যার সমাধান হয় না। অতএব, আর্নেষ্ট ইচ্ছে করে' চোখ বুজে থেকে লাভ নেই; যতদিন না ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যের সঙ্গে সেই উৎকৃষ্ট ভাবরাজ্যও যুক্ত হবে, ততদিন এ দেশ সভ্য হবে না। আমাদের সবচেয়ে প্রয়োজন হয়েছে সেই সব মানুষের, যারা দিনগত পাপক্ষয়ের চিন্তাই করে না—যাদের দৃষ্টি বর্ত্তমানকে ছাড়িয়ে আরও অনেক-দূর প্রসারিত হয়। জনগণের নেতৃত্ব করে যারা, তারা জনগণের দাসত্ব করে ব'লেই নেতা হতে পেরেছে; কিন্তু দেবতাদের চলবার উপযুক্ত পথ যদি তৈরী করতে হয়, তবে, ঐ জনতার কথা—ঐ জানোয়ারদের কথা নয়, যে-একজন মাত্র মানুষ অরণ্যে রোদন করেছে, তার কথাই শুনতে হবে।

হয়ত' তুমি ভাবছ যে, দেখার সুখের জন্যই দেখা, বা ধ্যান-সুখের জন্যই ধ্যান-করা—এ সবের মধ্যে একধরনের আত্ম-পরায়ণতা আছে। তোমার মনে যদি তাই হয়, মুখে তা' না বলাই ভাল। দেখ, ঐ যে ত্যাগ-ধর্ম্মকে, —আত্মবিসর্জ্জনের মহত্বকে—এত বড় করে' তোলা, ওটা আমাদের এইযুগের পক্ষেই স্বাভাবিক; কারণ, এমন স্বার্থপরতার যুগ ত' কখন ছিল না। ওই যে সব ভাব-প্রবণ পরোপকার-ব্রতীর দল—ওরা নিজেদের উদ্দেশ্য নিজেরাই ব্যর্থ করে; ওরা দিবারাত্রি সেই এককথাই বকে' চলেছে,—কিনা, পরের প্রতি তোমাদের কর্ত্তব্য সর্ব্বদা স্মরণ কর। কিন্তু তা'তে ত' মানুষের সত্যিকার কল্যাণ হবে না; কারণ, একটা জাতকে বড় করতে হ'লে সমষ্টির নয়—ব্যষ্টির উন্নতিসাধন সর্ব্বাগ্রে দরকার। যে-সমাজে প্রত্যেকে নিজের উন্নতির চেষ্টা করে না, সেখানে জ্ঞানের আদর্শ বড্ড ছোট হয়ে যায়, শেষে একেবারেই লুপ্ত হয়। যদি কোথাও খেতে বসে' এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে তোমার আলাপ হয়, যিনি আজীবন নিজেকে নিজেই সুশিক্ষিত ক'রে তুলেছেন—এমন লোক অবিশ্যি আজকালকার দিনে প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না, কচিৎ কখনো চোখে পড়ে—তা' হলে, তোমার মনে হবে,

আলাপের শেষে তুমি যেন একটা মূল্যবান কিছু সঞ্চয় করলে ; স্পষ্ট অনুভব করবে, যেন বড় একটা কিছুর স্পর্শ লাভ করে' ধন্য হয়েছ, তোমার সারা জীবনে যেন একটা শুচিতার সঞ্চার হ'ল। কিন্তু—বাপ! যদি এমন একজনের পাশে বসতে হয়ে থাকে, যে সারাজীবন কেবল পরকে শিক্ষা দিয়েই কাটিয়েছে !—মনে করলেও শিউরে উঠতে হয়! নিজের মত গুলো জাহির ক'রে বেড়ানো একটা মারাত্মক কু-অভ্যাস, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম কি জানো ?—ভয়াবহ মূর্খতা!

আ—তুমি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছ, গিলবার্ট ; সম্প্রতি তেমন কোন ঘটনা ঘটেছে নাকি ?

গি—ও রকম ঘটনা ত' অনিবার্য্য বললেই হয়। না, আর্নেষ্ট, মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মই হচ্ছে নিজ আত্মার উন্নতিসাধন। এ কথা আমি অস্বীকার করিনে যে, জ্ঞানের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা খুবই দুরূহ ; আরও স্বীকার করি যে, ওর জন্যে জনগণের কোন মাথাব্যথা নেই—অন্ততঃ এখনও বেশ কিছুকাল তারা ও কথা ভাবতেই চাইবে না ; লোকের দুঃখে সহানুভূতি করা তাদের পক্ষে যত সহজ, কোন চিন্তা বা ভাববস্তুকে বরণ করে' নেওয়া তেমনই দুঃসাধ্য। চিন্তা জিনিষটা যে কি, সে সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণা এমনই যে, যদি কোন মতকে তারা বিপজ্জনক মনে করে, তা'হলেই তার আর কোন মূল্যই রইল না ; অথচ, ঐ রকম বিপজ্জনক যা কিছু, চিন্তাহিসেবে তারই ত' একটা মূল্য আছে। যে-তত্ত্ব আদৌ মারাত্মক নয়—সে ত' একটা তত্ত্বই নয়।

আ—গিলবার্ট, তুমি আমার মাথা খারাপ করে' দেবে, দেখছি। এখনি আমাকে বললে যে, সব আর্টই মূলে নীতিহীন ; এখন আবার বলছ যে, তত্ত্বহিসেবে যা খাঁটি তা'ও মূলে অত্যন্ত অশান্তিকর।

গি—হাঁ, ব্যাবহারিক জগতে তাই ঘটে। দেখ, সমাজ টিঁকে আছে দুটি জিনিষের জোরে ; একটি হচ্ছে, লোকাচার ; আর একটি হচ্ছে, মানুষের মনের কতকগুলো অজ্ঞান-সংস্কার ; তার মানে, সমাজবাসী নরনারীর স্বাধীন বুদ্ধি-বিচার না থাকাটাই দরকার। কিন্তু ব্যাবহারিক জীবনের কথায় আর কাজ নেই—ঐ সব দুঃশীল পরহিতব্রতীদের নিয়ে আর নয়, এ

রকম আলোচনা বড়ই ক্লান্তিকর ; আমি এখন সেই আর এক রাজ্যে ফিরে যেতে চাই—যেখানে মানুষের চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির অবাধ স্বাধীনতা আছে।

আ—অর্থাৎ, খাঁটি চিন্তারস-রসিকতার রাজ্যে ?

গি—হাঁ। তোমার মনে আছে, আমি বলেছিলাম যে, সমালোচকও তার নিজের ধরণে, শিল্পীর মতই রূপ-সৃষ্টি করে ; কেমন ? কথাটা তোমার তখন পূরো বিশ্বাস হয় নি, না ? হয়ত দোষ আমারই, আমি তোমায় কথাটা ভালো বুঝতে পারিনি।

আ—আমি যে ঠিক অবিশ্বাস করেছিলাম তা নয় ; তবে একটা বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ক্রিটিকরা তেমন কিছু সৃষ্টি করলেও, সে রচনা তাদের নিজেদেরই মনোগত ভাবের রচনা না হয়ে পারে না—আত্মভাবটাই তাতে প্রবল হয়ে ফুটে উঠে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যা' কিছু হয়েছে, তাতে শিল্পীর আত্ম-মনোভাব যেন মুছে গেছে, নিজেকে একটুও ধরা দেয় নি তা'তে ; নিজের সঙ্গে যার কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই, সেই রকম একটা বহির্গত বস্তুকে ঠিক তার মত রূপ দিতে পারাই ত' শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্ম ?

গি—যত সৃষ্টিকর্ম আছে সবই আত্মভাবমূলক—শিল্পীর আত্মপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। গ্রীক বা ইংরেজী নাটকে যে সব বড় বড় চরিত্র দেখতে পাও, যাদের দেখে মনে হয়, প্রত্যেকের একটা স্বাধীন অস্তিত্ব আছে—নাট্যকার যেন তাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, তাঁর নিজের ভাব একটুও তাদের মধ্যে নেই—সেগুলোকে যদি খুব ভাল করে' ভিতরে তাকিয়ে দেখ তবে দেখতে পাবে, তারা কবিদেরই এক-একটা সূক্ষ্ম আত্ম-প্রতিকৃতি। তারা নিজেদের যা' বলে' মনে করত তাই অবশ্যি আঁকে নি—নিজেরা যা' নয় বলে' তাদের ধারণা ছিল, তাই তারা এঁকেছে ; এবং একটা আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক নিয়মের বশে—অন্ততঃ সেই মুহূর্ত্তের জন্যও—ঐ যা নয়, সত্যিই তাই হয়ে যেত তারা। কারণ, একটা কথা মানতেই হবে যে, কোন মানুষ কখনো তার ঐ 'অহং'টাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। এজন্যে কোন সৃষ্টির মধ্যেই এমন কিছু থাকতে পারে না যা' স্রষ্টার ভিতরে ছিল না। শেকস্‌পীয়ারের নাটকের যে সব অপ্রধান চরিত্র—সেগুলো তিনি হয়ত'

বাইরে থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন, লণ্ডনের রাস্তার ধুলোও তাদের গায়ে লেগে আছে; কিন্তু হ্যামলেট তাঁর আত্মার অতল থেকে উঠে এসেছে, রোমিওকে তিনি এঁকেছেন নিজেরই কামনার অগ্নিবর্ণ দিয়ে। তাঁর প্রকৃতিতে তারা যেন এক একটা পৃথক ধাতুর মত বিদ্যমান ছিল, তিনি সেই ধাতু দিয়ে ঐ মূর্ত্তিগুলোকে গড়েছেন; বাস্তব-জীবনের অধোভূমিতে তিনি তাদের দাঁড় করান নি, তুলে ধরেছিলেন আর্টের সেই উর্দ্ধলোকে—যেখানে প্রেমকে জয়মাল্য পরিয়ে দেয় মৃত্যু, যেখানে সকলই সম্ভব। পর্দ্দার আড়ালে লুকিয়ে যে বৃদ্ধ আড়ি পাতে, তাকে খুন করা খুব সহজ; সদ্য-খোঁড়া কবরের ভিতরে দাঁড়িয়ে দু'জনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে কিছুমাত্র বাধে না; পাপ করেছে যে রাজা, সে নিজের হাতেই নিজের তৈরী বিষপাত্রে চুমুক দেয়; পুত্রও তার পিতার প্রেতাত্মার দেখা পায়—লৌহবর্মে আপাদমস্তক ঢাকা সেই মূর্ত্তি, ম্লান চন্দ্রালোকে, দুর্গ-প্রাসাদের কুয়াসা ধূসর প্রাকারের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত পাদচারণা করে' বেড়াচ্ছে! শেকস্-পীয়ার তাঁর বহির্জীবনে কোন কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন নি ব'লেই—সব চেয়ে কীর্ত্তিমান হয়েছেন; তেমনি, তাঁর নাটকগুলিতে তিনি নিজের সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি ব'লেই, তাঁর অন্তরের আসল 'আমি'টার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় ঐ নাটকেই। একথা খুব সত্যি যে, শিল্পকর্ম্মের বাইরের রূপটা যতই আত্মভাববর্জ্জিত হোক, তার ভিতরের বস্তুটা আত্মময়। মানুষ যখন নিজের জবানীতে কথা কয়—তখনই তার আসল পরিচয় সে দিতে পারে না; একটা মুখোস দাও তাকে—দেখবে, সহজেই সে সত্যি কথাটা বলবে।

আ—তাই যদি হয়, তা'হলে. যেহেতু ক্রিটিকের হাতে ঐ রকম মুখোস বেশি নেই, তাকে সব সময়ে কেবল নিজের কথাই বলতে হবে,—অতএব, যারা কবি ও শিল্পী, যারা নানা রকম মুখোস ব্যবহার করতে পারে—অর্থাৎ যারা তাদের রচনায় অতি সহজেই বাইরের থেকে একটা রূপ যোগাড় করে' নিতে পারে, তাদের চেয়ে ঐ ক্রিটিকরা আত্মপ্রকাশের সুবিধে ঢের কম পায়, বল্‌তে হবে।

গি—এমন কোন মানে নেই; বরং মোটেই তা' সত্য হবে না—যদি সেই ক্রিটিক বুঝতে পেরে থাকে যে, কোন একটা-কিছুকে ধরে' থাকাই তার ধর্ম্ম নয়;

যদি এইটে মেনে নিতে তার মনে কোন বাধা না থাকে যে, প্রত্যেক উৎকৃষ্ট রসনিবেদন-কর্ম্ম এক একটা সাময়িক রসাবেশের ফল। অতএব কোন একটা ভঙ্গিকে ধরে' না থাকাই সত্যিকার রস-নিষ্ঠা। যিনি রসের সাধনা করেন, তিনি ত সকল বস্তুর মধ্যে সেই এক রসতত্ত্বকেই স্বীকার করেন, সেই রসেরই নূতনতর স্বাদের সন্ধান করেন; আর্টের যত বিভিন্ন পন্থা তার প্রত্যেকটির থেকে মনোহরণের রহস্যটি আবিষ্কার করে' নিজের কাজে লাগান। যে মানুষ কেবল পিছনের দিকে তাকায়—কবে কোন্ জিনিষের আদর করেছিল তাই মনে রেখে তার উল্টো কিছুকেই আমোল দিতে চায় না—তার মনের গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে; সে অতীতের মানুষ, ভবিষ্যৎ বলে' তার আর কিছু নেই। যতক্ষণ কোন একটা ভাবাবস্থা আছে, তাকে ধরে' প্রকাশ করে' দাও; প্রকাশ হয়ে গেলেই চুকে গেল, তার সঙ্গে আর সম্পর্ক কি? তুমি হাসছ? কিন্তু আমি যা বলছি, তা মিথ্যা নয়। ধর, কাল আর্টের বাস্তব-পন্থাই ভাল লেগেছিল, তার থেকে বেশ একটা নতুন রকমের সাড়া মনে জেগেছিল। সেটাকে বেশ করে' পরীক্ষা করে', ব্যাখ্যা করে' শেষে তার মোহ আর রইল না। বেলা শেষ না হতেই চিত্রকলার এক নতুন রীতি, কাব্যের নতুনতর একটা ঢঙ্ দেখা দিলে; রাশিয়ায়—আহত-হৃদয় রাশিয়ায়—হঠাৎ সেই মধ্যযুগীয় ভাবধারা উদ্বেল হয়ে উঠল; অবিশ্যি, ঐ ভাব কোন কালের অধীন নয়—মানুষেরই প্রাণের অবস্থার উপর নির্ভর করে; তার ফলে, আমরা আবার কিছুক্ষণের জন্য মনুষ্যজীবনের যে যাতনা-বেদনা—তারই ভীষণ-রমণীয় সৌন্দর্য্যে আকুল হয়ে উঠলাম। আবার, আজ সবাই রোমান্সের নামে পাগল হয়ে উঠেছে, আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বত-পাদদেশের বীথিকাগুলিতে তরুপল্লবের কাঁপন সুরু হয়েছে; বেগুনী-রঙের গিরিচূড়ায় রূপলক্ষ্মী আবার তাঁর সুকুমার স্বর্ণাভ পা-দু'খানি নিয়ে বিচরণ সুরু করেছেন। রসসৃষ্টির পুরোনো ঢঙ্ একেবারে লোপ পায় না; কিন্তু রসের সমালোচনা—রসের আস্বাদন-রীতি ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে, রসিকচিত্তও সঙ্গে সঙ্গে পরিপুষ্ট হয়ে উঠছে।

আবার, ক্রিটিক যে কেবল তার নিজের জবানীতেই লিখতে পারে, তা' নয়; কথোপকথনের ভঙ্গিতে যেমন, তেমনই গল্প বা বিবৃতির ভঙ্গিতেও

লিখতে পারে। কথোপকথনের মত এমন অপূর্ব্ব ভঙ্গি আর নেই—প্লেটো থেকে লুসিয়ান, লুসিয়ান থেকে রুসো ঐ ভঙ্গিটিকে অমর করে' গেছেন। যাঁরা সত্যিকার স্থষ্টিধর্ম্মী সমালোচক তাঁরা ওই রকম রচনার দ্বারা আত্মগোপন ও আত্মপ্রকাশ দুইই করতে পারেন—সব রকমের খেয়ালী কল্পনাকে রূপ দিতে পারেন, মনের প্রত্যেক অবস্থাকে প্রত্যক্ষ ক'রে তুলতে পারেন। ওরই সাহায্যে তিনি তাঁর ভাববস্তুটির সকল দিক ঘুরিয়ে দেখাতে পারেন,—ভাস্করের তৈরী মূর্ত্তিকে যেমন দেখাতে পারা যায়।

আ—হ্যাঁ। আরও তিনি পারেন—একটা কাল্পনিক প্রতিদ্বন্দী খাড়া করতেও পারেন; তারপর কতকগুলো অদ্ভুত যুক্তি ও কুতর্ক তার মুখে বসিয়ে দিয়ে তাকে নিজের দলে টেনে আনতেও পারেন।

গি—দুঃখের কথা এই যে, পরকে নিজের মতে আনাটাই সহজ,—নিজের মতটা পরিবর্ত্তন করাই যে সবচেয়ে শক্ত। নিজের বিশ্বাসটা যে ঠিক কি, তা জানতে হ'লে পরের মুখ দিয়ে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করাতে হয়; সত্যকে জানতে হ'লে সহস্র মিথ্যার স্থষ্টি করতে হয়। আসলে সত্য জিনিষটা কি? ধর্ম্ম-বিষয়ে যে-মতটা শেষ পর্য্যন্ত টিকে গেছে, তাই সত্য। বিজ্ঞানের সত্য হচ্ছে—সেই বস্তু, যা ইন্দ্রিয়গুলির সর্ব্বশেষ অনুভূতি; রসাস্বাদ বা রসস্থষ্টির ক্ষেত্রেও তেমনি—আমাদের মনের সর্ব্বশেষ ভাবাবস্থা যেটা, সেইটেই সত্য। এখন তা হ'লে দেখতে পাচ্ছ, শিল্পীরও যেমন, ক্রিটিকের হাতেও তেমনি, ভাবপ্রকাশের সেই সবগুলো ভঙ্গিই আছে— যেগুলোকে তুমি আত্মনিরপেক্ষ রচনাভঙ্গি বলছ। রাস্কিন তাঁর শিল্পসমালোচনাকে ভাবময় গদ্যের ছাঁচে ঢেলেছিলেন; তাতেও বিপরীত চিন্তা এবং দিক্-পরিবর্ত্তনের অপরূপত্ব রয়েছে। ব্রাউনিং তাঁর নিজস্ব ভাবচিন্তা অমিত্রাক্ষর-ছন্দে গেঁথে গিয়েছেন; তাতে কবিও যেমন, চিত্রকরও তেমনি, তাদের অন্তর-দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছে। রেনাঁ তাঁর রচনায় কথোপকথনের ভঙ্গি আশ্রয় করেছেন; রসেটি সনেটের কাব্যচ্ছন্দেই বর্ণচিত্রীদের বর্ণ ও রেখাচিত্রীদের রেখার যত কিছু রস রূপান্তরিত করেছিলেন—তাঁর নিজের আঁকা ছবি ও রেখাচিত্রকেও বাদ দেন নি;

যেহেতু তিনি শিল্পকলার সবরকম ভাষাকেই আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন, তাই তাঁর শিল্পী-মন বুঝতে পেরেছিল যে, কাব্য-সাহিত্যই শিল্পকলার পরাকাষ্ঠা—আর, রসানুভূতির পূর্ণতম ও সূক্ষ্মতম প্রকাশ হয় বাক্যে।

আ—আচ্ছা, এখন তাহলে স্থির হয়ে গেল, ক্রিটিকের হাতেও সব রকমের রচনাভঙ্গি রয়েছে; এর পর তোমাকে আরও একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই—খাঁটি ক্রিটিক হতে হলে কি কি গুণ থাকা দরকার?

গি—এ বিষয়ে তোমার মত কি?

আ—আমার মতে, ক্রিটিকের সবচেয়ে বড় গুণ—অপক্ষপাত।

গি—না হে, না। সাধারণতঃ অপক্ষপাতী বলতে যা বোঝায়, ক্রিটিক তা' হতেই পারে না। যে-বস্তু আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে না, অর্থাৎ যার প্রতি আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন—ভাল-মন্দ কিছুই মনে করিনে—তার সম্বন্ধেই আমরা সম্পূর্ণ অপক্ষপাত প্রকাশ করতে পারি; ওই জন্যেই যে-সব মতামত পক্ষপাতহীন, তাদের কোন মূল্যই নেই। যে-মানুষ কোন বিষয়ের দুটো দিকই দেখে, সে কিছুই দেখে না। আর্ট জিনিষটাই হচ্ছে হৃদয়াবেগের ব্যাপার, ওখানে সকল চিন্তা সকল তত্ত্বই আবেগের রঙে রঙীন হয়ে উঠে, ভাবাবেশে টলমল করে,—কাজেই, কোন কঠিন আকার ধারণ করতে পারে না; বিজ্ঞানের ফরমূলায় তাকে বাঁধা যায় না, অবশ্য-স্বীকার্য্য বলে' ধর্ম্মমতগুলোর যে গৌরব আছে, সে গৌরব তার নেই। অবিশ্যি, কোন রকম অকারণ বিদ্বেষ থাকাও উচিত নয়; কিন্তু, প্রায় একশো বছর আগে সেই এক ফরাসী লেখক যে বলেছিলেন—এসব বিষয়ে মানুষের নিজস্ব ভাল-মন্দ লাগার প্রয়োজন আছে, তা যদি সত্যি হয়, তা' হলে পক্ষপাত না থাকবে কেমন করে'? যে-ব্যক্তি নিলামের ঘণ্টা বাজায়, সেই কেবল অপক্ষপাতে সবরকম শিল্পদ্রব্যের সমান প্রশংসা করতে পারে। না, ও কথা ঠিক নয়; অপক্ষপাতী হওয়াটা খাঁটি ক্রিটিকের গুণ নয়। এমন কি, অপক্ষপাত নইলে সমালোচনাই সম্ভব নয়, একথাও মিথ্যা। কোন শিল্পসৃষ্টির—কাব্য বা চিত্র বা আর কিছুর—মর্ম্মকথাটি বুঝে নিতে হ'লে, সমস্ত মনপ্রাণ তাঁকে অর্পণ করতে হবে, সে সময়ে আর কিছুর চিন্তা মনে আসাই উচিত নয়—আসেও না।

আ—খাঁটি ক্রিটিক যিনি তাঁর অন্ততঃ বিচার-বুদ্ধি থাকা চাই——না, তাও নয়?

গি—বিচার বুদ্ধি! দেখ আর্নেষ্ট, আর্টকে অশ্রদ্ধা করবার দুটো উপায় আছে—এক হচ্ছে, সোজাসুজি পছন্দ না করা; আর একটা হচ্ছে, তাকে বিচার করে' পছন্দ করা। কারণ, প্লেটোও একথা বুঝতে পেরেছিলেন, পেরে সুখী হ'ন নি—যে, ঐ সৌন্দর্য্যরস—শ্রোতাই হোক, আর দর্শকই হোক—সকলকে কেমন একটা দিব্যোন্মাদের বশীভূত করে। আর্ট আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির সেবা করে না—সে সম্পূর্ণ অন্য একটা বৃত্তি। আমরা যখন সুন্দরের উপাসনা করি, তখন আমাদের মাথাটা সুস্থ থাকে না; তার গরিমা এমন যে, মনটাকেই সে হরণ করে। যাদের জীবনে ঐ সৌন্দর্য্য-বোধ কিছু প্রবল, জগতের চক্ষে তারা একরকম উন্মাদ বই ত' নয়!

আ—আচ্ছা বেশ, কিন্তু তা'হলেও ক্রিটিককে অকপট হতে হবে ত'?

গি—সত্যিকার রসজ্ঞ যারা, তারা সৌন্দর্য্যের মূল-নীতিটাকে অন্তরের সহিত স্বীকার করবে, সেখানে তারা মিথ্যাচারী হ'বে না নিশ্চয়; কিন্তু তাই বলে' তারা—অভ্যাসের মত—কোন চিন্তা বা ভাবের দাসত্ব করবে না৷ বহু প্রকার ও আকারের ভিতর দিয়েই তারা আত্মোপলব্ধি করবে—রসানুভূতির নিত্যনূতন আস্বাদ এবং নব নব দৃষ্টিভঙ্গি তাদের কৌতূহলকে জাগিয়ে রাখবে; ঐ বহুর ভজনাই তাদের রস-জীবনের একনিষ্ঠা। দেখ, আর্নেষ্ট, তুমি কতকগুলো কথা শুনে ভয় পেয়ো না; লোকে যার নাম দিয়েছে মিথ্যাচার, একনিষ্ঠতার অভাব—সেটা আর কিছু নয়, আমাদের এই ব্যক্তিত্বটাকে 'এক'-এর বদলে 'অনেক' ক'রে তোলা।

আ—এখন দেখছি, আমি যা' বলেছি তা যুক্তিসঙ্গত হয় নি।

গি—তুমি যে তিনটি গুণের উল্লেখ করেছ তার মধ্যে দুটো গুণ—একনিষ্ঠা আর ন্যায়পরতা—ঠিক চরিত্রগত গুণ না হলেও, প্রায় নৈতিক সাধুতার কাছাকাছি এসে পড়ে; কিন্তু একটা কথা সকলের আগে মনে রাখতে হবে ক্রিটিকের—সে হচ্ছে এই যে, আর্টের জগৎ আর নীতিশাস্ত্রের জগৎ একেবারে স্বতন্ত্র, ও দুটোর মধ্যে কোন সম্পর্কই নেই। আমাদের আধুনিক নীতিবাদীরা তাঁদের ঐ অদ্ভুত শুচিবায়ুর ধমক দিয়েও সুন্দর-

বস্তুর সৌন্দর্য্য নষ্ট করতে পারেন না, কিছুক্ষণের জন্যে তার গায়ে একটু কলঙ্ক ছিটিয়ে দেন মাত্র। এ কথা আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, কেবল সাময়িক সাহিত্যের পৃষ্ঠাতেই তাঁদের মতামত প্রকাশ করার সুবিধে হয়। দুঃখের কথা এই জন্য যে, ঐ সাময়িক-সাহিত্যের পত্রিকাগুলো দিয়ে আজকাল একটা উপকারও হচ্ছে,—দেশের অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিদ্যে-বুদ্ধির যে পরিচয় ওইগুলোতে প্রকাশ পায়, তাতেই সমাজের মূর্খতা যে কত গভীর তার একটা হদিস আমরা পাই, সে-বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা দূর হয়। যা' অতিশয় তুচ্ছ তারই আলোচনা ছাড়া ঐ সব পত্রিকায় প্রায় আর কিছু থাকে না ব'লেই, আমরা খুব সহজে বুঝতে পারি—প্রকৃত কালচারের পক্ষে কোন্ জিনিষগুলো দরকার, আর কোন্‌গুলো নয়। ঐ সব সাংবাদিক-লেখকেরা আর যাই করে করুক, আর্টের সম্বন্ধে তাদের কোন কথা বলা উচিত নয়। একজন ঐ জাতের লেখক যখন খুব গম্ভীরভাবে—শিল্পীর বিষয়বস্তু কি হবে, আর কি হবে না—তাই নির্দ্দেশ করে দেয়, তখন না হেসে থাকা দুষ্কর; ওরকম প্রসঙ্গই হাস্যকর। যাক, এই সব নচ্ছারদের কথায় আর কাজ নেই, এখন সেই আলোচনাই হোক —সত্যিকার ক্রিটিক হ'তে হ'লে রসিকতার কোন্ কোন্ লক্ষণ থাকা চাই।

আ—আমি ত' তাই জানতে চাই, তুমিই বল।

গি—এক ধরণের একটি বিশেষ মানস-প্রকৃতিই হচ্ছে ক্রিটিকের পক্ষে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—মনের সে এমন একটি ধর্ম্ম যে, সৌন্দর্য্যের মৃদুতম স্পর্শেও সাড়া দিয়ে ওঠে। আমাদের সকলের মধ্যেই একটা পৃথক ইন্দ্রিয় আছে, তাকে সুন্দর-বোধের ইন্দ্রিয় বলা যেতে পারে। এরই কারণে, কেউ বা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে, আর কেউ বা সৌন্দর্য্যকে কেবল ধ্যানে আস্বাদন করে। আমার মতে, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর যারা তারাই আরও বড় দরের রসিক। কিন্তু সেই ইন্দ্রিয়টিকে নির্দ্দোষ এবং পূর্ণ-শক্তিমান করে' তোলবার জন্যে একটা খুব মনোহর প্রতিবেশের মধ্যে তাকে রেখে দেওয়া দরকার, তা' না হ'লে সেটা শুকিয়ে যাবে, তার সে শক্তি আর থাকবে না। তোমার মনে আছে, প্লেটো এক জায়গায় ভারি চমৎকার ভাষায় কি লিখেছেন! সেখানে তিনি ঐ প্রতিবেশের উপরেই বিশেষ ক'রে জোর দিয়েছেন—বলেছেন যে,

শ্রুতিমধুর ও নয়নরঞ্জন যতকিছু আছে বালকটিকে যেন সেই সকলের মধ্যে রেখে মানুষ করা হয়; বাইরের ইন্দ্রিয় দিয়ে বহির্জ্জগতের সৌন্দর্য্য পান করতে করতেই, তবে না তার অন্তর-ইন্দ্রিয় বিকশিত হয়ে উঠবে, তবেই না সে অন্তর্জ্জগতের সৌন্দর্য্য অনুভব করতে শিখবে। এমনি ক'রে যার অন্তর-পুরুষ সুশিক্ষিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে, তার রসদৃষ্টি এমন স্বচ্ছ ও অভ্রান্ত হবে যে—প্রকৃতিই হোক, আর আর্টই হোক—কোথাও কোন দোষ থাকলে তার চোখে পড়বেই; কোন-কিছুর প্রশংসা করতে গিয়ে সে ভুল করবে না; যা' ভালো তাতেই সে সুখ পাবে—সেই ভালো তার হৃদয়ে প্রবেশ করে' হৃদয়টাকেও মহৎ ও সুন্দর করে তুলবে; সেই বয়সেই সে মন্দকে মন্দ বলবে, ভালকে ভাল বলবে—কেন ভাল, কেন মন্দ, সে-বিচার-শক্তি হবার আগেই। তারপর যখন বয়সে তার আত্মজ্ঞান হবে, বিচারবুদ্ধি জাগবে, তখন সে তার সেই বুদ্ধিকেও চিনতে পারবে, বন্ধুর মত তাকে বিশ্বাস করবে—কারণ, তার শিক্ষার গুণে ঐ বুদ্ধির সঙ্গে অনেক আগে থেকেই যে তার পরিচয় ছিল। যারা টাকা-আনা-পাই ছাড়া আর কিছু বোঝে না, তাদের কাছে যদি বলা যায় যে, শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনে সৌন্দর্য্যপ্রীতির উন্মেষ করা, এবং সে শিক্ষার উপায় সংক্ষেপে তিনটি—ঐ রকম মানস-প্রকৃতি গ'ড়ে তোলা, রসবোধ বা রুচির উৎকর্ষ-সাধন, আর ঐ ভাল-মন্দ-বিচারের বুদ্ধিটি তৈরী করে দেওয়া—তা' হলে তাদের সেই পালিশকরা মুখগুলো যে কি রকম হাসিতে ভরে' উঠবে তা আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি।

ঐ যে মানস-প্রকৃতির কথা বললাম, ওটা গড়ে' তোলবার জন্যে কারুশিল্পের শরণাপন্ন হতে হবে—অর্থাৎ সেই সব শিল্পকর্ম্ম, যা আমাদের মনকে কিছু বোঝায় না, কেবল দেখায়। আধুনিক চিত্রকরদের আঁকা ছবিগুলো দেখতে খুবই ভালো, অন্ততঃ কতকগুলো ত' বটেই; কিন্তু তাদের নিয়ে বেশিদিন ঘর-করা অসম্ভব—বড়-বেশি বুদ্ধির প্যাঁচ, সূক্ষ্ম চিন্তা আর বক্তব্যের স্পষ্টতা থাকে কিনা। তাদের ছবিগুলোর ভাবার্থ বুঝে নিতে বেশি সময় লাগে না; তারপর, অতি-পরিচিত আত্মীয়-স্বজনের মত, সেই সব ছবির সঙ্গ আর সুখকর বোধ হয় না। যে-আর্ট কেবল কারু-কলা ছাড়া আর কিছুই নয়, তাকে নিয়েই বাস করা চলে। দৃষ্ট

বলতে যত কিছু কলাশিল্প আছে, তার মধ্যে ঐ একটা শিল্প আমাদের মনে কেবল একটা ভাবাবস্থাই সৃষ্টি করে; আবার, রসাস্বাদের জন্যে যে মানস-প্রকৃতির প্রয়োজন সেটাও তৈরী করে দেয়। এর কারণ, ঐ কারুশিল্পের দুটি গুণ আছে; প্রথম, তার সৌন্দর্য্যের আদর্শ প্রকৃতির আদর্শ নয়; দ্বিতীয় সাধারণ চিত্রকরেরা যা-কিছু আঁকে তা একটা কিছুর প্রতিলিপি বা অনুরূপ; কারুকলার পদ্ধতি তা' নয়। এই জন্যে ঐ শিল্প আমাদের অন্তরে সৌন্দর্য্যের ছন্দটিকে ধরিয়ে দেয়; কোন ভাব বা অর্থ নয়, কেবল ভঙ্গিটি, ছাঁদটি—যাকে কেবল সুষমা বা রূপ বলে, তারই একটা বোধ সঞ্চার করে দেয়। সেই বোধটাই রসসৃষ্টি ও রসাস্বাদ দুইয়েরই মূলে বিদ্যমান্ থাকে। ঐ ছাঁদটা, রূপের ঐ ভঙ্গিটাই—সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সৃষ্টিকর্ম্মের আদি-প্রেরণা; পরে একটা আবেশময় অনুভূতি বা ভাব-বস্তু এসে হাজির হয়। ভাবটাকেই প্রথমে মনোগত করে' পরে সে বলে না—আমি এই ভাববস্তুটাকে একটা বিচিত্র ছন্দের চৌদ্দ-লাইনে ঢেলে দেবো; বরং, প্রথমে সে সনেটের গঠন-সুষমায় আকৃষ্ট হ'য়ে ছন্দ এবং মিলের কয়েকটা ভঙ্গি মনে-মনে ভেবে নেয়, তারপর কি দিয়ে সেটা ভর্ত্তি করবে, তা ঐ ছাঁদটাই তাকে বলে' দেয়; তখন সেই শিল্প-বস্তু ভাবচিন্তায় এবং আবেশে আপনা হতেই সম্পূর্ণ হয়ে উঠে। প্রথমেই কোন ভাববস্তু বা ভাবাবেশ নয়,—একটা নতুন কোন সুষমার ছাঁদটি মাত্র তার প্রাণে প্রেরণা জাগায়—তাকেই বলে খাঁটি শিল্প-প্রেরণা; বাস্তবজীবনের কোন হৃদয়াবেগ যদি তাকে অভিভূত করে, তবেই সর্ব্বনাশ। যেটা জীবনে আমরা সত্যিই অনুভব করি, আর্টের পক্ষে তা' মাটি হয়ে যায়। যত নিকৃষ্ট কবিতা দেখতে পাও, সে সবের জন্ম হয়েছে ঐ রকম সত্যিকার হৃদয়াবেগের মুখে। যা' স্বাভাবিক তাকে ত' আমরা সহজেই বুঝতে পারি—যা' সহজে বুঝি তাতে রস কোথায়?

আ—তুমি যা' বলছ, তা কি তুমি সত্যি বিশ্বাস কর?

শি—তোমার এমন সন্দেহের কারণ কি? দেহটাই যে আত্মা! এ শুধু আর্ট বলে' নয়, জীবনের যে দিকেই দেখ—ঐ আকার, ঐ রূপটাই ত' সৃষ্টির মূলে রয়েছে। প্লেটো বলেছেন, নাচের সময়ে দেহের যে ছন্দোময় লীলায়িত ভঙ্গিমা দেখা যায় তাহাতেই আমাদের চিত্তে ছন্দ এবং সুষমা-

বোধ জাগে। নিউম্যানের হৃদয়ে মাঝে মাঝে যে অপূর্ব্ব সত্যের প্রেরণা জাগত, যে পরম-অনুভূতি তাঁর হ'ত—যার জন্যে মানুষটার প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক হয়—সেই নিউম্যানও তেমনি একটা প্রেরণার বশে বলে' উঠেছিলেন,—বিশ্বাসের জন্যে একটা মূর্ত্তি, একটা সাকার কিছু চাই। বড় সত্য কথাই তিনি বলেছিলেন—যদিও সে যে কি ভয়ানক সত্য, তা তিনিও জানতেন না। হাঁ, ঐ আকার বা মূর্ত্তির চেয়ে বড় আর কিছু নেই—সৃষ্টির গভীরতম রহস্য ঐ মূর্ত্তিরই রহস্য। দুঃখকে যদি একটা রূপ দিতে পারো তবে দুঃখও রমণীয় হয়ে উঠবে। সুখকে একটা কিছু দ্বারা যদি ব্যক্ত করতে পারো, তবে সুখও একটা আনন্দ-ঘন রসাবেশ হয়ে উঠবে। কোন দারুণ দুঃখে তোমার হৃদয় যদি জর্জ্জরিত হয়, তা হ'লে হ্যামলেট বা কুইন কনষ্ট্যান্সের (Constance) মুখ থেকে তাদের সেই ভাষা শিখে নাও, বেদনার সেই বাণীতে প্রাণটা অভিষিক্ত কর, তখন দেখবে যে, ভাষায় রূপ দিতে পারলেই অত বড় দুঃখেও সান্ত্বনা পাওয়া যায়; ঐ যে রূপ—ওতেই বেদনার যেমন প্রকাশ, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তার বিনাশও হয়ে যায়। আর্টের বেলাতেও তাই,—ঐ আকার বা রূপের সাধনা করলেই দেখবে, রসসৃষ্টির এমন কোন মন্ত্র নেই যা তোমার কাছে ধরা দেবে না।

আ—তুমি যে শিক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কার করেছ তা বড়ই প্রীতিকর বটে। কিন্তু ঐ রকম চমৎকার প্রতিবেশের মধ্যে যে সব ক্রিটিক তৈরী হবে তাদের প্রভাবটা কি রকম হবে শুনি? তুমি কি বিশ্বাস কর যে, যারা সৃষ্টি করে সেই সব শিল্পীরা ক্রিটিকের কথায় কিছুমাত্র কান দেয়?

গি—ক্রিটিকরা অবিশ্যি আর্টের ধারা নিয়ন্ত্রিত করতে চাইবে। কিন্তু তার জন্যে কোন ব্যক্তিবিশেষের দিকে তারা নজর দেবে না, সেই যুগটারই চৈতন্য-সম্পাদন করতে চাইবে; নতুন রকমের পিপাসা, নতুন কামনা জাগিয়ে তুলবে—নিজেদের বৃহত্তর দৃষ্টি, ও মহত্তর মনোধর্ম্ম দিয়ে তাকে এমন সমৃদ্ধ করবে যে, সে যুগের আর্ট তা'তে সাড়া না দিয়ে পারবে না।

আ—তবু, এইটে কি ঠিক নয় যে, কবিরাই তাদের কাব্যের গুণদোষ সবচেয়ে ভাল বোঝে - চিত্রকর তার ছবির বিচার নিজেই যেমন করতে পারে তেমন

আর কেউ পারে না? প্রত্যেক শিল্পকলায়, শিল্পকর্ম্মটির গোড়াকার অনুবেদন হয় সেই শিল্পীরই মনে, অতএব তার বিচারটাই হবে সবচেয়ে মূল্যবান্।

গি—তা ত' বটেই! শিল্পীই শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ সমালোচক, এ কথা সত্য হওয়া দূরে থাক, কোন সত্যিকার বড় কবি বা শিল্পী কখনো পরের রচনা বুঝতেও পারে না, নিজের রচনারও সঠিক বিচার করতে পারে কিনা সন্দেহ। কল্পনার যে একাগ্র-দৃষ্টি না হলে কেউ শিল্পী হতে পারে না, তারই তন্ময়তায় শিল্পীদের সূক্ষ্ম রসগ্রাহিতা-শক্তি কমে যায়। সৃষ্টি-কামনার প্রবল আবেগে সে কেবল নিজের লক্ষ্যটির পানে অন্ধভাবে ছুটে চলে। তার সেই রথচক্রের ধূলিজালে চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে যায়; এই কারণে মহারথীরা—সেই সব দেবতারা—কেউ কাউকে দেখতে পান না; কেবল ভক্তগুলোকেই চোখে পড়ে—ব্যস, ঐ পর্য্যন্ত।

আ—তুমি বলতে চাও, খুব বড় কবি-শিল্পী যাঁরা তাঁরা, তাঁদের থেকে ভিন্ন যে সব কবি-কর্ম্ম তার সৌন্দর্য্য বা রসরূপত্ব স্বীকার করেন না?

গি—সেটা তাঁদের পক্ষে অসাধ্য—অসম্ভব। কীট্‌সের 'এণ্ডিমিয়ন' পড়ে' ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেছিলেন, "চিন্তালেশহীন রূপ-পিপাসার বেশ একটু কবিত্ব আছে বটে"; শেলী সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম-নীতির বিরোধী ছিলেন বলে' ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নতুন ধর্ম্ম-মন্ত্রে কান দেন নি, তার কারণ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার রূপ-সৌষ্ঠব মোটেই ছিল না, তার বাঁধুনি তেমন ভাল নয়। আর বায়রন—যিনি ছিলেন একটা বিরাট অথচ আধখানা মানুষ—যাঁর মনুষ্যসুলভ হৃদয়বৃত্তি ছিল অপ্রমেয়—সেই বায়রন, ব্যোমবিহারী কবিকেও যেমন, হ্রদকূলচারী কবিকেও তেমনই, শ্রদ্ধা করতে পারেন নি; কীট্‌সের কবিতার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য তাঁর চোখেই পড়েনি। মিলটন কাব্যের উদাত্ত-গম্ভীর আদর্শ-ই উৎকৃষ্ট মনে করতেন বলে' শেকস্‌পীয়ারের কাব্য-রীতি বুঝতে পারেন নি। অ-কবি যারা তারাই পরস্পরের কাব্যের গুণকীর্ত্তন করে' থাকে, এবং তাই হ'ল তাদের মতে উদারতার পরিচয়। কিন্তু সত্যিকার স্রষ্টা কবি-শিল্পী যাঁরা তাঁরা তাঁদের নিজের ভঙ্গিতে নিজের দৃষ্টিতে যেমন ক'রে জীবনকে দেখেছেন, তার থেকে অন্য রকম করে' দেখানো বরদাস্ত করতে পারেন না। স্রষ্টার যত-কিছু বিচার-বুদ্ধি

ঐ সৃষ্টি-কর্ম্মেই ব্যাপৃত হয়ে থাকে, সে-বুদ্ধিকে অপরের সৃষ্টিকর্ম্মে প্রয়োগ করবার অবকাশ না পাওয়াই সম্ভব। যে নিজে কিছু করে না, সে-ই কর্ম্মের বিচারক হবার উপযুক্ত।

আ—তুমি কি সত্যিই তাই মনে কর?

গি—কারণ, সৃষ্টিকর্ম্মে দৃষ্টিটা সঙ্কীর্ণ, গণ্ডিবদ্ধ হয়ে পড়ে; আর, ধ্যান-চিন্তায় সেটা প্রসারিত হয়।

আ—তা' হলে' টেক্‌নিকের সম্বন্ধে কি বলবে? প্রত্যেক আর্টের এক একটা স্বতন্ত্র টেক্‌নিক আছে তা'তো মানো?

গি—নিশ্চয়। প্রত্যেক কলা-শিল্পের ব্যাকরণ আছে, তার করণ-উপকরণও আছে। ও-তুটোর সম্বন্ধে তুর্ব্বোধ্য কিছু নেই; যাদের আসলে কোন যোগ্যতা নেই তাদের ঐ টেক্‌নিকটাই খুব নির্ভুল হতে পারে। কিন্তু ওর ঐ নিয়মগুলো খুব নির্দ্দিষ্ট ও নিঃসন্দেহ হ'লেও, কল্পনার যোগে সেগুলোকে এমন সুন্দর ও সার্থক ক'রে তুলতে হয় যে, মনে হবে, তাদের প্রত্যেকটাই যেন অপূর্ব্ব। টেকনিক জিনিষটা আসলে শিল্পীরই ব্যক্তিত্ব। বড় কবি যিনি তাঁর ছন্দোরীতি তাঁর নিজেরই। যিনি বড় চিত্রকর তিনি এক-বই-তুই রীতি মানেন না, সেও তাঁর নিজেরই রীতি।

আ—যাক্, আমার যা জিগ্যেস করবার ছিল তার সবই করা হয়েছে। এখন আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে—

গি—আহা! আমি বলছিনে, তুমি আমার সব কথা মেনে নাও। লোকে যখন আমার কথা মেনে নেয় তখনই আমি বুঝতে পারি যে, আমার মতটা ঠিক নয়।

আ—যদি তাই হয়, তাহ'লে আমি আর তোমাকে জানতে দেবো না—তোমার কথা আমি মেনে নিয়েছি কিনা। কিন্তু আরও একটা কথা জিগ্যেস করবার আছে। তুমি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছ যে, সমালোচনাও এক রকম সৃষ্টিকর্ম্ম। ওর দ্বারা বড়-কিছু আশা করা যায়?

গি—এর পর যা' কিছু বড় কাজ তা ঐ সমালোচনার দ্বারাই হবে। সৃষ্টির কাজ ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে—বিষয়বস্তুও যেমন, বৈচিত্র্যও তেমনি কমে আসছে। আমার ত' মনে হয়, সৃষ্টি বলতে যা' বোঝায়, তার দিন ফুরিয়েছে। যে আবেগ থেকে ওর জন্ম হয় সেটা বড়ই আদিম, বড়ই সরল

বা স্বাভাবিক। সে যাই হোক, এটা খুবই সত্যি যে, সৃষ্টি করবার বিষয়-বস্তু যেমন একদিকে কমে আসছে, তেমনি আরেক দিকে সমালোচনার বস্তু দিন দিন বেড়ে উঠছে। মানুষের মনোভাব যেমন বদলাচ্ছে, তেমনি দৃষ্টিভঙ্গিরও অন্ত নেই। জগৎ যত এগিয়ে চলেছে, ততই অবিন্যস্ত বস্তু-রাশিকে একটা রূপ দেবার প্রয়োজন বাড়ছে বই কমছে না। সমালোচনার কাজ এখন যেমন আবশ্যক হয়েছে এমন আর কখনো হয়নি। তুমি আমাকে জিগ্যেস করেছিলে—সমালোচনার কোন প্রভাব আছে কিনা। আমার মনে হয়, তার জবাব আমি এর আগেই দিয়েছি, কিন্তু আরও একটা কথা বলবার আছে। এই যে সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, এই যে ভাবগ্রাহিতা ও রস-বিচার, এর থেকেই আমাদের চিত্তের প্রসার হয়—দেশ বা জাতির সঙ্কীর্ণ সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারি। এক দল ছিলেন যাঁরা মানুষে মানুষে আত্মীয়তা-স্থাপনের জন্যে সবাইকে বুঝিয়েছিলেন যে, বিবাদ করলে ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষতি হবে। আমাদের কালে আর একদল উঠেছেন, এঁরা মানুষকে প্রেমিক হতে বলেন, অথবা এমন একটা ধোঁয়াটে রকমের নীতি-কথার দোহাই দেন, যা' সূক্ষ্ম তর্কের বস্তু, এবং সাধারণের কাছে একটা ছেঁদো-কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। এঁদের নানারকম শান্তি-সমিতি ও শান্তিবাহিনী আছে,—ভাবপ্রবণ মূর্খেরা তাতেই মেতে ওঠে; যারা কখনো ইতিহাস পড়েনি তাদের বড় ভাল লাগে এই সব। কিন্তু ওরকম হৃদয়া-বেগের কর্ম্ম নয়—কারণ, তার কোন স্থিরতা নেই, তার মূলে রয়েছে ভাবালুতার আতিশয্য। যারা ঐ রকম শান্তিপূর্ণভাবে বিবাদ-বিসম্বাদ মিটিয়ে দিতে চাইবে, তাদের বিচারে যা' স্থির হবে—তা কিছুতেই তামিল করা যাবে না; কাজেই সে বিচার নিষ্ফল হবে। অন্যায় ও অবিচারের চেয়েও মন্দ যদি কিছু থাকে তবে সে হচ্ছে—সেই রকমের সুবিচার যার হাতে কোন দণ্ড নেই। ন্যায়-ধর্ম্ম যদি বলহীন হয়, তবে তার মত অকল্যাণ আর কিছু নেই।

না, ওই সব হৃদয়-ধর্ম্ম দিয়ে কিছু হবে না, ওর দ্বারা বিশ্বকে আত্মীয় করা যাবে না; জাতি-দেশের সঙ্কীর্ণ মনোভাব দূর করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, ঐ মানসিক রসগ্রাহিতার উৎকর্ষ-সাধন। তাতে করে' পরজাতি-বিদ্বেষ নষ্ট হবে—সকল জাতির সকল রকম বৈশিষ্ট্য, মানুষের মনের যত

বিচিত্র ভঙ্গি, সব ঐ রসগ্রাহিতার ঐক্য-বোধে মধুর হয়ে উঠবে; পরিপূর্ণ জ্ঞানের থেকে প্রাণে যে শান্তি লাভ করা যায়, আমরা সেই শান্তির অধিকারী হব। লোকে পাপীকে এত গালিগালাজ করে,—কিন্তু পাপী তো নয়, মূর্খরাই মনুষ্য-সমাজের কলঙ্ক, মূর্খতার মত পাপ আর নেই।

কিন্তু রাত্রি আর বেশি নেই, বাতির আলোও ভাল জ্বলছে না। কেবল আর একটিমাত্র কথা আমি না বলে' পারছিনে। কলাশিল্পীরা যা' কিছু সৃষ্টি করুন না কেন, তাঁদের সেই সৃষ্টি সর্ব্বদাই কালের পিছু-পিছু চলে; কিন্তু সমালোচনার মধ্যে যে দৃষ্টিশক্তি থাকে তা' ক্রমাগত সামনের দিকেই এগিয়ে নিয়ে যায়। তা' হলে, জগৎ-মন আর ঐ সমালোচনার অন্তর্নিহিত যে-মন—ও দুটো একই, বলতে হবে।

আ—তার, ঐ মন যার আছে, সে কিছুই করবে না—নৈষ্কর্ম্ম্যই হবে তার পরম ধর্ম্ম, এটাও তা হ'লে ঠিক?

গি—আহা, সেই যে পার্সিফোনির কথা ল্যাণ্ডর বলেছেন—মধুর ভাবনায়-ভরা তার মুখ, মৃত্যুপুরীর নির্জ্জন পুষ্পোদ্যানে সে বসে' রয়েছে, তার শুভ্র চরণ-দুখানির চারিপাশে আস্ফোডেল আর অমরন্ত-ফুল ফুটে উঠছে! ভাবরস-পিপাসু ক্রিটিক যারা তারাও বসে' থাকবে তেমনি অনুদ্বিগ্ন চিত্তে, পান করবে সেই গভীর নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি-সুখের অমৃত-রস—যাকে মরণধর্ম্মী মানুষই অবজ্ঞা করে, কিন্তু যা' দেবভোগ্য! হাঁ, আমি স্বপ্নবিলাসী বটে, কারণ, স্বপ্ন-দেখা যার স্বভাব সে জ্যোৎস্নার আলোকেই পথ চলে, আর তার শাস্তি হয় এই যে, সকলের আগে উষার আলো দেখতে পায় সে-ই।

আ—শাস্তি?

গি—পুরস্কারও বটে। কিন্তু ঐ দেখ, এরি মধ্যে ভোর হয়ে গেছে। পর্দ্দা সরিয়ে জানলাগুলো বেশ ক'রে খুলে দাও। আঃ, ভোরের বাতাস কি মধুর লাগছে! নীচের দিকে তাকিয়ে দেখ, পিকাডিলি যেন একটা লম্বা রূপালী ফিতের মত পড়ে রয়েছে। দূরে পার্কের গাছগুলোর উপর একটা খুব ফিকে বেগুনীরঙের কুয়াসা ঝুলছে, শাদা বাড়ীগুলোর ছায়া গাঢ় হয়ে উঠছে—সেও সেই রঙের। এত দেরী করে' আর ঘুমোনো চলে না। তার চেয়ে চল, কভেণ্ট গার্ডেনে গিয়ে গোলাপ দেখা যাক। চল, আমি শ্রান্ত হয়ে পড়েছি, আর কথা কইতে ভাল লাগছে না।

সভ্যতা

[ক্লাইভ বেল-লিখিত উপাদেয় ইংরেজী সন্দর্ভের বাংলা সংক্ষিপ্ত-সার অনুবাদ। বাংলা 'সভ্যতা' শব্দটি ইংরেজী Civilization-এর প্রতিশব্দ, ঐ অর্থে ঐ শব্দ আমাদের ভাষায় কখনো প্রচলিত ছিল না, এক্ষণে আমরা উহার বহুলপ্রয়োগ করিয়া থাকি। অথচ উহার অর্থ সম্বন্ধে আমাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই। ইংরেজ লেখকও ঐ শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, ঐ দেশেও সভ্যতা বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহা বলা কঠিন। এই প্রবন্ধে তিনি একটা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই সংজ্ঞা অনুসারে আমাদের সম্বন্ধেও ঐ 'সভ্যতা' কথাটির প্রয়োগ বুঝিয়া লইবার সুবিধা হইবে। এই কারণে, প্রবন্ধটির বাংলা অনুবাদ অতিশয় প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছি।]

কোনগুলি সভ্যতার লক্ষণ নয়

একের সম্পত্তিতে অপরের অধিকার নাই—এই নীতি যে সভ্য সমাজেরই নীতি এমন কথা বলা যায় না। এ কথা সত্য যে, পশুদের মধ্যেও এমন নীতি নাই, কিন্তু তাহারা কোনরূপ অস্ত্র ব্যবহারও করে না; আদিম অসভ্য সমাজের মধ্যে দুয়েরই প্রচলন আছে—তাহাতে পশু হইতে তাহারা পৃথক বটে, কিন্তু তজ্জন্য তাহারা সভ্যতা দাবী করিতে পারে না। প্রস্তর-নির্ম্মিত অস্ত্রাদি ব্যবহার এবং ঐ সম্পত্তি-জ্ঞান সভ্যতার সোপান হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া ঐ দুইটাকে সভ্যতার বিশিষ্ট লক্ষণ বলা চলে না। অনেক ধনী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি ইহার বিপরীত মত পোষণ করেন, কিন্তু ওয়েষ্টারমার্কের মত বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, এমন বহুতর অসভ্য জাতি আছে যাহাদের নিজস্ব ও পরস্ব-বোধ একজন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট অপেক্ষা সূক্ষ্মতায় ন্যূন নহে। উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ যে চুরি করিতে জানিত না—এমন কথা বলা যাইতে পারে, অবশ্য যতদিন না তাহারা শ্বেতকায় জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছিল; এই সঙ্গে ইহাও স্বীকার না করিলে অন্যায় হইবে যে, এই শ্বেতজাতিরাই উহা সংশোধনের চেষ্টাও করিয়াছে। সে-পাপ তাহারাই যেমন সংক্রামিত করিয়াছিল তেমনই তাহারাই আবার উহা নিবারণ করিবার জন্য মিশনারীও পাঠাইয়াছে—ভগবানের দশাজ্ঞার

অষ্টম আজ্ঞাটি লঙ্ঘন করিলে কিরূপ অনন্ত নরক ভোগ করিতে হইবে, ঐ সকল জাতিকে তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহাও মনে করা ভুল হইবে যে, ভগবানে বা পরলোকে বিশ্বাস করা কেবল সভ্যজাতিদের মধ্যেই আছে;—সভ্যতার আদি লক্ষণও ইহা নহে। বরং অধিকাংশ অসভ্য জাতির ভগবানে বিশ্বাস কেবল কথাতেই নয়, কার্য্যেও প্রকাশ পাইয়া থাকে; তাহারা একটা ভগবান তৈয়ারী করিয়া তাঁহাকে ভক্ষণ না করিয়া নিরস্ত হয় না। অষ্ট্রেলিয়ার 'বুশম্যান'—যাহারা অসভ্য জাতির মধ্যেও অসভ্যতম, তাহাদের বিশ্বাস, একজন সর্ব্বোচ্চ পুরুষ আছে যে ন্যায়-অন্যায়ের নিয়ন্তা ও বিচারকর্ত্তা। এমন কি, এই পুরুষকে তাহারা পিতা বলিয়া ডাকে, এবং একজন প্রবীণ বয়স্ক ব্যক্তির রূপে তাঁহার অর্চ্চনা করে। অসভ্য মানুষেরা প্রায় নাস্তিক হয় না, আমাদের মতই তাহারা "সকল নিষ্ফলতার উপরে একটা সফলতা"র আশা রাখে।

সভা-সমিতিতে আমি প্রায় মহিলাদিগকে বলিতে শুনি যে, যে সমাজে নারীর সম্মান যত অধিক সেই সমাজ তত সভ্য—এই সম্মানের অনুশাসনেই সমাজের সভ্যতা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কিন্তু ইহা সত্য নহে। ওয়েষ্টারমার্ক বলেন, যে সকল জাতি বর্ব্বরতায় অগ্রগণ্য, যেমন, বুশম্যান, আন্দামান দ্বীপের অসভ্যগণ এবং ভেদ্দা জাতি—যাহাদের মত পশুপ্রকৃতি মানুষ দেখা যায় না, তাহাদের হাতেও স্ত্রীজাতি যেটুকু মর্য্যাদা পাইয়া থাকে, আরিষ্ট্টলের সময়ে আথেনীয় সমাজের নারীগণও তেমন মর্য্যাদা পায় নাই। একদিকে যেমন বহু অসভ্য জাতি নরখাদক হইলে কি হয়—তাহাদের স্ত্রৈণ-স্বভাব পুরুষেরা স্ত্রীগণকে প্রায় নিজেদের সমান বলিয়া গণ্য করে, তেমনই অপরদিকে, চীনের তাঙ্ ও সুঙ্ বংশীয় রাজগণের রাজত্বকালে—সেই অতিখ্যাত সভ্যতার যুগেও, চীন জাতি নারীকে গৃহস্থের গো-ধন অপেক্ষা অধিক মর্য্যাদা দেয় নাই। অসভ্য জাতির সত্যবাদিতাও অনেক ভ্রমণকারীকে বিস্মিত করিয়াছে। সিংহলের ভেদ্দা জাতিকে সত্যবাদিতার আদর্শ বলা যাইতে পারে; অপর পক্ষে, সুসভ্য গ্রীক ও ক্রীট-বাসীদের এ বিষয়ে বরং একটা অখ্যাতিই ছিল, আবার য়ুরোপ-মহাদেশের অধিবাসিগণ ব্রিটিশ-দ্বীপের জনগণকে "ঘোরতর মিথ্যাচারী"—এই বিশিষ্ট উপাধিতে ভূষিত করিয়াছে। কেবল সত্যবাদীই নয়—অনেক অসভ্য জাতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও বটে, তাহারা দিনে দুই তিনবার স্নান করে এবং স্নানকালে সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে মার্জ্জিত করে। অথচ, রোম সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়

হইতে রাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন-আরোহণ পর্য্যন্ত যে দীর্ঘকাল, সেইকালে কয়জন য়ুরোপীয় সভ্য মানুষ বৎসরে একবারও সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিয়াছে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

ইন্দ্রিয়-সংযমের মত একটা এতবড় ব্যাপারেও অনুন্নত জাতিদের আচরণ আমাদের ঈর্ষার উদ্রেক করিতে পারে। ব্রেজিলের অরণ্যে অথবা কালিফোর্ণিয়ায় এমন কয়েকটি জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা প্রাণান্তেও একাধিক বিবাহ করিবে না। কার্ডক নামে যে জাতি আছে তাহারা তাহাদের কুলপতিকে দুই বিবাহের অধিকার দেয় না; ইহাদের মধ্যে যাহারা ধনী তাহারা সাধ্যমত বহুসংখ্যক দাসী কিনিয়া গৃহে রাখিতে পারে, কিন্তু একাধিক স্ত্রীজনের সহিত সহবাস করিয়া নিন্দার ভাগী হইতে চাহিবে না। কার-নিকোবার দ্বীপের অধিবাসীদিগকে এ বিষয়ে সত্যই নিষ্কলঙ্ক বলিতে হইবে। কিন্তু সভ্যজাতির আচরণ ইহার বিপরীত। অতি সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তি ও ভাবুকতার জন্য বিখ্যাত যে সকল জাতি ইতিহাসের এক এক যুগ আলোকিত করিয়াছে তাহারাও পরস্ত্রী-গমনের ঘোরতর পাতককেও তুচ্ছ মনে করিত। দার্শনিকপ্রবর প্লেটো নারীজাতিকে সাধারণের সম্পত্তি করিবার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। মনে হয়, চীন-জাতি যখন সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তখনও তাহাদের আচরণ এবিষয়ে অধিকতর প্রশংসনীয় ছিল না। অতএব, কার-নিকোবারের ঐ অসভ্য জাতি ব্যভিচারকে যখন এতবড় একটা পাপ বলিয়া জ্ঞান করে—তখন এমন সিদ্ধান্ত করিতেই হয় যে, সতীত্ব সভ্যতার একটা বিশিষ্ট অঙ্গ নহে।

স্বদেশ-প্রেম যে কেবল সভ্যজাতিরই ধর্ম্ম এমন গর্ব্বও আমরা করিতে পারি না। পশ্চিম আফ্রিকার ইওরুবা জাতির সম্বন্ধে মিঃ ম্যাক্‌গ্রেগর লিখিয়াছেন— "কোন জাতিই ইহাদের তুল্য স্বদেশভক্ত নহে"—অথচ ইহারাও মিশনারীদিগকে ধরিয়া খাইয়া ফেলে। মিঃ উইলিয়ম লিখিয়াছেন, একদা এক ফিজি-দ্বীপবাসী বর্ব্বর আমেরিকা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিলে, তাহার দলপতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, ঐদেশের মানুষ কোন্ কোন্ গুণে তাহাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। সে যখন একে একে গুণগুলি বলিয়া যাইতে লাগিল, তখন তাহার স্বজাতীয়গণ বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিল। ইহাদের নিকটে আধুনিক সভ্যজাতির এ বিষয়ে শিক্ষা করিবার কিছু থাকিতে না পারে, কিন্তু সুসভ্য প্রাচীন জাতিগণ ঐ অসভ্য জাতির শিষ্য হইবার যোগ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কনফুসিয়াসের

আমলের চীনা-সমাজ তাহাদের ধর্ম্মগুরুর নিকটে এই শিক্ষা পাইতেছিল যে, জগতের সকল মানুষকে সমভাবে ভালবাসিতে হইবে; হিন্দুদের পঞ্চতন্ত্রে আছে—যাহারা ক্ষুদ্রচেতা তাহারাই এমন চিন্তা করিয়া থাকে যে, এই ব্যক্তি আপন, ঐ ব্যক্তি পর (অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্)।

আমার মনে হয়, অতঃপর আর কোন সংশয় রহিল না যে, নিজস্ব ও পরস্ব-বোধ, সত্যবাদিতা, দৈহিক পরিচ্ছন্নতা, ভগবানে ও পরকালে বিশ্বাস, নারীজাতির প্রতি সম্মান, সতীত্ব এবং স্বদেশপ্রেম—ইহাদের কোনটাই সভ্যতার বিশিষ্ট লক্ষণ নহে। সভ্যতা নিশ্চয়ই এমন একটি বস্তু যাহা আদিম বর্ব্বর সমাজ দাবী করিতে পারে না; অতএব যে সকল গুণ আদিম অবস্থাতেও বর্ত্তমান তাহা সভ্যতার অঙ্গ হইতে পারে না। গত দুইশত বৎসর যাবৎ সভ্য ও অসভ্য বলিয়া যে ভেদ আমাদের মনের একটা সংস্কার হইয়া আছে, তাহাতে এই কথাটি মানিয়া লইতে হয় যে, সভ্যতা একটা প্রাকৃতিক ধর্ম্ম নহে। উহার সহিত সেই দুইটি বস্তুর বিশেষ সম্পর্ক আছে—যাহা মানবজাতি অনেক বিলম্বে অর্জ্জন করিয়াছে; তাহার একটি আত্ম-চেতনা, অপরটি—বিচার বুদ্ধি; শিক্ষার দ্বারাই উহা লাভ করা সম্ভব। সভ্যতা একটি তৈয়ারী-করা বস্তু।

একদল অর্দ্ধশিক্ষিত, দাম্ভিক মতবাদী আছে—তাহারা বিজ্ঞানের বুলিও কিছু কিছু মুখস্থ করিয়াছে, ইহাদের মতে সভ্যতা বলিতে প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তিতা বুঝায়; 'সব প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া দাও'—ইহাই তাহাদের ধর্ম্মমন্ত্র। বৃক্ষলতা ও পশুপক্ষীই আদর্শ জীবন যাপন করে। যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনে বাধা দিয়াই মানুষ যত অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে। যতদিন না আমরা দুর্ব্বলকে বাঁচাইবার চেষ্টা ত্যাগ করি এবং শক্তিমানের অধিকারকেই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্বীকার না করি, ততদিন আমরা সভ্য হইতে পারিব না। যাহারা যোগ্যতম তাহারাই পৃথিবী ভোগ করিবে, কথাটা সত্য; কিন্তু যোগ্যতার অর্থ কি? স্তন্যপায়ী জীবদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কৃশ ও দুর্ব্বল যে মানুষ, সেই ত' প্রাচীন অতিকায় জন্তু অপেক্ষা জীবন-যুদ্ধে অধিকতর জয়ী হইয়াছে। এখন যেমন দেখা যাইতেছে—যদি যুদ্ধই মনুষ্য-সমাজের নিত্য-কর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়, তবে সেই সকল দুর্ব্বল ও ধূর্ত্ত জাতিগণই টিকিয়া থাকিবে যাহারা যুদ্ধে না যাইবার ফন্দি-ফিকির যত উত্তমরূপ উদ্ভাবন করিতে পারিবে। আমাদিগকে—সেই দুর্ব্বলদিগকে তখন এই বিজ্ঞান-গর্ব্বীরা বলিবে—"তোমরা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছ;" আমরাও উত্তরে বলিব—

"এরূপ লঙ্ঘন করাই আমাদের প্রকৃতি।" তখন হারিয়া গিয়া তাহারা চরিত্র-নীতি বা কর্ত্তব্যবাদের শরণাপন্ন হইবে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে 'হয়' মাত্র আছে, 'হওয়া উচিত' বলিয়া কিছু নাই। তাহারা বলিবে, ঐ নিয়ম যদি পালন না কর তবে শান্তিস্বরূপ ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাহাতে আমাদের উত্তর এই যে, যদি বাঁচিয়া থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য হয় বংশবৃদ্ধি, এবং তাহা দ্বারা ব্যক্তির কোন উপকার না হইয়া সমষ্টির উপকার হয়, তবে আমার তাহাতে কি যায় আসে? হয় বল, যাহা যেমন আছে—ঠিক আছে, তাহার কোন ভাল-মন্দ বিচার নাই, নয় স্বীকার কর, মানুষ প্রকৃতি অপেক্ষা জ্ঞানী। যদি প্রথম কথাটা সত্য হয়, তবে অভিযোগ করিয়া লাভ নাই; যদি দ্বিতীয়টা সত্য হয়, তাহা হইলে জীববিদ্যা-বাগীশেরা তাঁহাদের অভিযোগের কারণ আরও ভালো করিয়া নির্দ্দেশ করুন।

আরও এমন দুই একটি বিষয়ের উল্লেখমাত্র করা যাইতে পারে, যাহা সভ্যতার বিশিষ্ট লক্ষণ নহে। যথা, অতি নিপুণ যন্ত্রনির্ম্মাণ বিদ্যা—ইহাও সভ্যতার প্রমাণ নহে। এমন কথা কেহ বলিবে না যে, প্রাচীন এথেন্স-নগরী অপেক্ষা আধুনিক মেলবোর্ণ শহর সভ্যতায় উচ্চতর; এমন কি, উক্ত বিজলী-দীপালোকিত, বাষ্পীয়-শকট ও বৈদ্যুতিক-ট্রাম-পরিসেবিত মহা-নগরীর বহু বিদ্যাবান্ অধিবাসীরাও সে ভুল করিবে না।

গত রুশ-জাপান যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই আমি সোহো (Soho)র একটি রেস্তোরাঁয় আহার করিতেছিলাম; ঐ স্থানে প্রতি সপ্তাহে জন-ছয় অতিশিক্ষিত যুবক, ব্রিটিশ সেনাবিভাগের এক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সহিত আলাপ করিতে আসিত। ভদ্রলোকটির স্বভাব বড়ই নম্র ছিল, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, তিনি অতি দীর্ঘকাল এমন এক জগতে বাস করিতেছেন, যেখানে সকল চিন্তাশক্তি ও বিদ্যাবত্তা বর্জ্জন করিতে পারাই তাঁহার কর্ত্তব্য—কখনও যে বিদ্যাবুদ্ধি ছিল, তাহা ভুলিয়া যাওয়াই উচিত। এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য যাহা সেই বিষয়েই আমরা সেদিন আলোচনা করিতেছিলাম—"সভ্যতা কাহাকে বলে?" আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, যে সমাজে দরিদ্র, চিররোগী ও বাতুলদের ভরণ-পোষণের জন্য রীতিমত ব্যবস্থা নাই তাহাকে সভ্য বলা যাইতে পারে না; অপর কেহ (সভায় দুই একজন মহিলাও ছিলেন) বলিলেন, সভ্য সমাজে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর ভোটাধিকার থাকা অত্যাবশ্যক। কাহারও বিশ্বাস—সেই সমাজই সভ্য, যেখানে

প্রত্যেক কবি ও শিল্পী বাৎসরিক পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা বৃত্তি পাইয়া থাকেন, এবং যাহাদের প্রত্যেক মফঃস্বল শহরে একটি করিয়া চিত্রশালার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমাদের সৈনিক-বন্ধু বলিলেন "সভ্যতা কি বস্তু তাহা আমার জানা নাই বটে, কিন্তু কোন্ দেশ সভ্য হইয়াছে তাহা আমি বলিতে পারি। যাঁহারা এ বিষয়ে পারদর্শী তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি, শত শত বৎসর ধরিয়া জাপান অতি সূক্ষ্ম ও পেলব চিত্র-শিল্পের সাধনা করিয়াছে, তাহার সাহিত্য নিতান্ত তুচ্ছ নহে, তথাপি আমাদের সংবাদপত্রগুলি কখনও বলে নাই যে, জাপানীরা অতিশয় সভ্য জাতি। কিন্তু যেমন তাহারা একটি অতি সম্ভ্রান্ত ও শক্তিমান য়ুরোপীয় জাতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিল, অমনি সভ্যজাতি বলিয়া গণ্য হইল।" ইহার মধ্যে যে বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা অতিশয় যথার্থ হইলেও, সেই বীর সেনাধ্যক্ষও কখনই স্বীকার করিতেন না যে, যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শিতাই সভ্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যাঁহারা মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচনের স্পৃহা এবং তদনুযায়ী কার্য্যকেই সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা যন্ত্র-বিজ্ঞানের উন্নতি ও তদ্দ্বারা মানুষের সুখসাধনকেও তদ্রূপ মনে করিতে বাধ্য হইবেন। যাঁহারা সমাজের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বা নারীর ভোটাধিকারকেই সভ্যতার পরিচয় বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এ মত আলোচনার যোগ্যও নহে; রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার সহিত সভ্যতার একটা বাহিরের যোগ থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে, কিন্তু উহাদের মূলে সভ্যতার কোন প্রেরণাই নাই—শাসন-প্রণালীর প্রকার-ভেদ যে কারণে হইয়া থাকে, সভ্যতার মূল তদপেক্ষা গভীর।

সভ্যতার বিশেষ লক্ষণ কি?

এতক্ষণে আমি সেই সকল গুণ ও লক্ষণকে বাছিয়া পৃথক করিতে পারিয়াছি যেগুলিকে অনেক সময় সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া অনেকেই ভুল করিয়া থাকেন। কোন্গুলি সভ্যতার লক্ষণ, সে বিষয়ে আলোচনা করিব, এবং ইহার জন্য জগতের ইতিহাসে যে সমাজগুলিকে সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া সকল পণ্ডিত ব্যক্তি স্বীকার করেন, সেই কয়েকটি সমাজের মধ্যেই ঐ লক্ষণগুলির সন্ধান করিব। তাঁহাদের মতে বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে এমন তিনটি মাত্র সমাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল।

প্রথমটি আথেন্স-নগরীর গ্রীক সমাজ, এবং বিশেষ করিয়া পেরিক্লিসের যুগ।

দ্বিতীয়টি রেনেসাঁস-যুগের ইতালীয় সমাজ; এবং তৃতীয়, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যকাল হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ফরাসী সমাজ।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে – পেরিক্লিসের সময়ে সমাজ-জীবনের সৌন্দর্য্য প্রায় পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেও, কেহ কেহ ষষ্ঠ শতাব্দীর এথেন্সকেও সেই গৌরব দান করিয়া থাকেন; যদিও ইহা সত্য যে, ঐ কালে (ষষ্ঠ শতাব্দী) ভাস্কর্য্য-কলায়, গ্রীকজাতির রূপ-সৃষ্টির প্রতিভা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, এবং ঐ সময়ে তাহাদের জ্ঞান-বৃত্তিরও চরম উন্মেষ হইয়াছিল; এবং আধুনিক কালের যত কিছু গভীর তত্ত্ব-চিন্তার জন্ম হইয়াছিল ঐ যুগের ঐ সমাজে। তথাপি উহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সমাজই সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল— এমন কথা বলাই সঙ্গত। এরূপ উক্তির একটি গভীর অর্থ আছে; কোন যুগের সভ্যতার পরিমাপ করিতে হইলে কেবল সুন্দরতম কলাকীর্ত্তি অথবা বিস্ময়কর চিন্তা-সম্পদকেই প্রাধান্য দেওয়া যাইবে না। খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতকের এথেন্স, রেনেসাঁসের ইতালি, এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সকেই আমরা সভ্যতার লীলাভূমি বলিয়া গণ্য করিব। বর্ব্বর অবস্থা হইতে সভ্যতায় আরোহণ করিবার সর্ব্বপ্রথম সোপান—আত্ম-চেতনার উন্মেষ, ও সেই সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়ে চিন্তা করিবার প্রবৃত্তি। ইহাই সত্য যে, আত্ম-চেতনার ও বিচার-বৃত্তির ঐকান্তিক অভাবই বর্ব্বরতা ও সভ্যতার মধ্যে নিম্নতম ভেদরেখা। সভ্যতার পূর্ণতম অবস্থায় দুইটি গুণের বিকাশ হইতে দেখা যায়—একটিকে বলা যায় বিবেক-বুদ্ধি, বা শ্রেয় ও প্রেয়, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের মধ্যে প্রথমটিকে গ্রহণ ও দ্বিতীয়টিকে বর্জ্জনের একটি সহজ প্রবৃত্তি—অর্থাৎ, অভ্রান্ত মূল্য-জ্ঞান, যেমন, অগোচর ও সুচিরলভ্যকে লাভ করিবার জন্য অতিশয় সুগোচর ও অচিরলভ্যকে ত্যাগ করিতে পারা। যাহারা কুসংস্কারের বশে বা স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে নয়—কেবল সৌন্দর্য্যনিষ্ঠার জন্য দেহ-সুখ বিসর্জ্জন দিতে পারে, তাহাদেরই এই মূল্য-জ্ঞান আছে। কোন প্রকার কার্য্যকরী শিক্ষার পরিবর্ত্তে যে শিক্ষার সাহায্যে মানুষ জীবনকে পূর্ণ-উপভোগ করিতে পারে সেই শিক্ষার প্রতি যে অনুরাগ, তাহা এই সভ্যতম মনোবৃত্তির ফল। সভ্যতার আর একটি অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ—যুক্তিপরায়ণতা। সমাজে ইহার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা তখনই হয়, যখন প্রায় সকলেই এমন মত পোষণ করে যে, প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক কার্য্যের যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা চাই—তাহাদের মূলে ঔচিত্যবোধ থাকা চাই। অসভ্য

সমাজের জীবন-যাত্রায় এইরূপ যুক্তির শাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, তাহার কতকগুলি কারণ আছে,—একটি কারণ সহজেই অনুমান করা যাইবে—উহাদের জীবন-ধারণ সর্ব্বদাই সঙ্কটপূর্ণ, তাহার জন্য এত কষ্ট করিতে হয় যে নিজের ও পরিবারবর্গের প্রাণরক্ষার যে পশু-সুলভ সহজাত প্রবৃত্তি তাহার উপরে উহারা উঠিতে পারে না, যুক্তিবিচারের অবকাশ কোথায়? যেখানে জীব-সংস্কারই প্রবল, সেখানে বিচারশীলতা জন্মিতেই পারে না। ঠিক এই কারণে, বর্ব্বর জাতির কোনরূপ সূক্ষ্ম মূল্য-জ্ঞানও নাই; কোন এস্কিমো কখনও ধারণা করিতেই পারিবে না যে একটা সদ্যদগ্ধ ডিমের তুলনায় একটি সনেট বহুগুণে মূল্যবান্। ঐ ডিমটা তাহার নিকটে অতিশয় প্রত্যক্ষ, তাহার তৎকালীন প্রয়োজনীয়তা আরও সত্য। যে সূক্ষ্ম-গভীর সুখ মনেরই আস্বাদন-যোগ্য—তাহার জন্য দেহটা নিরাপদ হওয়া চাই। যে অসভ্য মানুষ নিজ সমাজের আচার-প্রথার দোষ-গুণ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে হয় আর বেশীদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না, নয় তাহার অসভ্যতার অন্ত হইয়াছে—সভ্যতার পথে সে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। যে জন অতিশয় অস্পষ্টভাবেও অনুভব করিতেছে যে, বস্তুসকলের প্রকৃত মূল্য বস্তু বলিয়াই নহে, তাহাদের দ্বারা যেটুকু সময় সুখ উৎপন্ন হয় তাহাই,—সে জনেরও অসভ্য-অবস্থা ঘুচিয়াছে। কিন্তু যতদিন মানুষ প্রকৃতির সন্তান হইয়া প্রকৃতিদত্ত সহজাত সংস্কারগুলি পালন করে ততদিন সে সভ্যতার অভিমুখে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে না। সভ্যতা শিক্ষাসাপেক্ষ—উহা আত্ম-চেতনা ও আত্মচিন্তার ফল, উহা স্বাভাবিক নয়—কৃত্রিম।

মূল্যজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি এই দুইটিকে সভ্যতার আর সকল লক্ষণের মূল বলা হইয়াছে। এই দুইটিই সভ্যতম প্রাচীন সমাজ—আথেনীয় সমাজে বিশেষ-ভাবে লক্ষিত হয়। গ্রীক্‌দিগের জীবনে, তাহাদের আর্ট ও চিন্তাধারায়, একটি অমায়িক সুবুদ্ধিশীলতা (sweet reasonableness) এবং শ্রদ্ধা (appropriate seriousness) এই দুইটি সদ্‌গুণ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। উহার একটি আর কিছুই নহে—মূল্যজ্ঞানের দ্বারা সুরসায়িত বিচারবুদ্ধি; অপরটি—বিচারবুদ্ধি দ্বারা শাণিত ও নিঃসংশয়িত মূল্যজ্ঞান। প্রাচীন-গ্রীক-সাধনার এই গুণটি যে বস্তুর মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, তাহাকেই 'ক্লাসিক্যাল' আখ্যা দিয়া থাকি; ঐ শব্দটির দ্বারা কেবল দুইটি লক্ষণ বুঝায়—ঔচিত্যবোধ এবং মাত্রাজ্ঞান।

মূল্য-জ্ঞান

আথেনীয় সমাজে বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চ্চার যে আদর ছিল তাহার খ্যাতিই সর্ব্বাধিক। যে-কোন বিষয় তাহাদের চিন্তাকে অধিকার করিত তাহাকেই অতিশয় মুক্ত ও স্বাধীন চিত্তে, অতি সূক্ষ্ম ও নির্ম্মম তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার দ্বারা মীমাংসা করিয়া লওয়াই ছিল তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য। লাইসিস্ট্রাটা (Lysistrata) নামে সেই নাটকখানির কথা কে না স্মরণ করিবে? তখন আথেন্স-নগরী যুদ্ধে অতিশয় বিব্রত, প্রায় জীবন-মরণ সমস্যা বলিলেও হয়—চারিদিকে রণোন্মাদ। সেইকালেও গ্রীক-সমাজ এমন একখানি নাটকের জন্য রঙ্গালয়-নির্ম্মাণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইল না—যে-নাটক দেশ-প্রেমকে পরিহাস করিয়াছে, যুদ্ধ-করাকে গালি দিয়াছে। তার কারণ, নাটকখানির বিষয়-বস্তু যাহাই হউক না কেন, উহা নাটক হিসাবে উৎকৃষ্ট কিনা, ইহাই ছিল তাহাদের একমাত্র জিজ্ঞাস্য। ইহাকেই বলে—সামাজিক ব্যাপারেও অতি সূক্ষ্ম মূল্যজ্ঞান। আবার যে সমাজ এমনই অনাড়ম্বর বিলাসিতাহীন জীবন যাপন করিত—যাহা একালের কোন ব্রিটিশ কয়লা কুঠির মজুরও মর্য্যাদাহানিকর বলিয়া মনে করিবে—তাহারাই নাটক-অভিনয়ের জন্য অকাতরে অর্থদান করিত। পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে কোন্‌গুলি সভ্যতার লক্ষণ নয় তাহা বলিয়াছি, কিন্তু তাহাতে একটা বস্তুর উল্লেখ করা হয় নাই—তাহা দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য-পিপাসা। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, দৈহিক কষ্ট করিবার ইচ্ছাটাই সভ্যতার লক্ষণ। যে আথেন্সবাসীরা অতি সুকুমার হৃদয়বৃত্তি এবং গভীরতর চিন্তাশক্তির এমন পরিচয় দিয়াছে—তাহাদের জীবনেও বিলাসিতার অভাব প্রায় শ্রীহীনতায় পৌঁছিয়াছিল! সভ্যতা বলিতে আধুনিক বিপণি-বিহারীরা যাহা বুঝে, আথেনীয়গণ তেমন সভ্যতার ধার ধারিত না। যাহাদিগের জন্য ইতালি দেশে রেনেসাঁস সম্ভব হইয়াছিল তাহাদেরও অতি উচ্চ মানস-বিলাস এবং সর্ব্ব বিষয়ে একরূপ মহিমা-প্রীতি ছিল, কিন্তু দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যসুখের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না! একালে মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বস্তুটি দেখা দিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী অভিজাত সমাজেও ষ্টাইল বা ভদ্র-রীতির পুরাতন আদর্শ লোপ পায় নাই, তাহারাও ইংরেজী রুচির স্বাচ্ছন্দ্য-নিষ্ঠাকে দূরে পরিহার করিয়াছিল। দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যসুখের জন্য এই যে ষ্টাইল-ত্যাগ না করার সভ্য-মনোবৃত্তি, ইহারও মূলে আছে খাঁটি মূল্যজ্ঞান।

আথেনীয় সমাজের ঐ সত্য-পিপাসা ও সৌন্দর্য্যসাধনার সঙ্গে তুলনায় ইতালীয়-গণের চরিত্রে একটা গুণ কম প্রশংসনীয় নয়। তাহাদের সমাজে কবি ও চিত্রকর, বিদ্বান ও ভাবুকের যে সম্মান ছিল তাহা সত্যই বিস্ময়কর। ষোড়শ শতকের আরম্ভ সময়ে, রাফায়েল-আঞ্জেলোর প্রতিভাকেই, অন্ততঃ রোম ও ফ্লোরেন্সবাসীরা তাহাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব বলিয়া মনে করিত। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সে কালের ইতালীয় সমাজের ঐ প্রতিভা-পূজা অতিশয় ন্যায্য ও অকপট হইলেও, কিছু অতিরিক্ত বটে। এক একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তাহারা প্রায় দেবতা করিয়া তুলিয়াছিল। তথাপি ব্যক্তি-মানবের মহিমা ঘোষণায় এই যে বাড়াবাড়ি, ইহা সেকালের পক্ষে স্বাভাবিক বলিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া য়ুরোপকে এমন একটা ধর্ম্ম-মতের দ্বারা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল, যাহার বশে মানুষকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, মানুষ পাপী ; সত্য-চিন্তা, সত্য-অনুভূতি, ও সত্য-আচরণ তাহার সেই পাপ-প্রকৃতির পক্ষে অসম্ভব। তাহার ঐ মনুষ্যত্বই ঘৃণার্হ, তাহার ব্যক্তিত্বাভিমানও একটা ঘোরতর পাপ। এক্ষণে গ্রীক শিল্পকলা ও গ্রীক-দর্শনের সহিত আকস্মিক পরিচয়ের ফলে তাহাদের প্রতীতি হইল যে, মানুষের তুলনায় আর সকলেই ক্ষুদ্র, মানুষের উপরে আর কিছুই নাই। সত্য-মিথ্যার একমাত্র বিচারকর্ত্তা মানুষ ; মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা, মানুষই সকল শাস্ত্র ও সকল নিয়মের স্রষ্টা ও সংহারকর্ত্তা ; বিশ্বের যে-নিয়ম অখণ্ডনীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল, মানুষই তাহা ইচ্ছাশক্তির বলে খণ্ডন করিতে পারে। এই জন্য রেনেসাঁস-যুগের ইতালীয়গণ শক্তিমান ও প্রতিভাবান্ মানুষের এমন পূজা করিয়াছিল। মূল্যজ্ঞানের যে আদি ও উৎকৃষ্ট নিদর্শন— কলাবিদ্যা ও উচ্চ চিন্তার প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি, তাহাতে ঐ যুগের ইতালীয়গণ আথেন্সবাসীর সমকক্ষ ছিল।

ফরাসীর অষ্টাদশ শতাব্দী এইরূপ চিত্তোৎকর্ষ বিষয়ে রেনেসাঁস অথবা পেরিক্লিসের যুগের সহিত তুলনীয় হইলেও, একটা বিষয়ে সাদৃশ্যের অভাব লক্ষিত হয়। ঐ অষ্টাদশ শতাব্দীর সৃষ্টিপ্রতিভা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, বরং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তদশ শতাব্দী এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিল। ইহা হইতে সভ্যতার আর একটি অসন্দিগ্ধ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, তাহা এই যে, প্রকৃত সভ্য-সমাজ ততটা সৃষ্টিকুশল নয়, যতটা রসগ্রাহী ; অসভ্য জাতিগণই ভীষণ বেগে সৃষ্টি করিয়া থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর

ফরাসী সমাজ আর্টের মূল্য বুঝিত; ধনিগণ সৌন্দর্য্য-চর্চ্চায়, শুধু অর্থ নয়—সময় ও যত্ন নিয়োগ করিত, নর-নারী নির্ব্বিশেষে সৌন্দর্য্যবোধের অনুশীলন করিত। দরিদ্র বলিতে যে অশিক্ষিত ও স্বেচ্ছাশক্তিহীন সমাজ বুঝায়, তাহাদের সহিত সভ্যতার এইটুকুমাত্র সম্পর্ক যে, তাহারা কায়িক পরিশ্রমের ভার না লইলে সভ্যতার অবকাশই মিলিত না, ইহাই তাহাদের সাক্ষাৎ সহায়তা; একরূপ গৌণভাবেও তাহারা সহায়তা করে, কারণ. তাহাদের আচারে-ব্যবহারে, অভ্যাসে-বিশ্বাসে, এবং তাহাদের ভাবোচ্ছ্বাসে সভ্যতার যে রং লাগে, তাহাতেও সভ্যতার গৌরববৃদ্ধি হয়। আথেন্সের ক্রীতদাস অথবা ফ্রান্সের কৃষি-জীবীদের মধ্যে খাঁটি সভ্যতার কোন লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর্টের আদর থাকিলেও, বিশুদ্ধ তত্ত্বপিপাসাই ঐ কালের প্রধান লক্ষণ। এইরূপ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার ঐকান্তিকতা—মূল্যজ্ঞানের এই অত্যুৎকৃষ্ট পরিণতি—হইতেই যে ফললাভ হইয়াছিল, তাহাতেই ঐ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সমাজ জগৎ বরেণ্য হইয়াছে। ঐ সমাজের সকল মার্জ্জিতরুচি ও অধ্যয়নশীল নরনারী সাহিত্যে দুইটি দোষ বরদাস্ত করিতেন না—উচ্ছৃঙ্খল রীতি ও পাণ্ডিত্য-বিস্তার। সে সমাজে সকল বিষয়ে একটা উৎকর্ষ-প্রমাদ, বা উৎকর্ষেরও একটা সীমাজ্ঞান ছিল, তাহা অতিক্রম না করাই ছিল বাঞ্ছনীয়। ইহা কেবল গদ্যরচনাতেই নয়,—জীবনের সকল ব্যাপারেই একটা মাত্রা নির্দ্ধারিত ছিল। এমন কি কেহ দেখে নাই যে, অতিশয় অভব্য-রকমের অতি-সজ্জিত ভোজনালয়ে, বহু-আলোকিত কক্ষে, অতিশয় দুর্মূল্য এবং প্রচুর আহার্য্যে আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া, এবং তাহাতেই কৃতার্থ বোধ করিয়া, কোন ব্যক্তি যখন ভোজন শেষ করিয়াছে, তখন তথাকার এক অপরিচ্ছন্ন বেশধারী ভৃত্য চুরুটের পাত্র হইতে সবচেয়ে বড় চুরুটটি তুলিয়া দিলে সে বলিয়া উঠিল—"হাঁ উহাতেই হইবে, বাজারে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট আমি কেবল তাহাই চাই"? মানুষ যখন সকল বিষয়েই উৎকর্ষের মাত্রাজ্ঞান হারায় তখনই তাহার এমন অবস্থা ঘটে। যে-ব্যক্তি তাহা হারায় নাই, তাহার নিকটে, বাজারে যাহা উৎকৃষ্ট তাহা উৎকৃষ্ট হইতে পারে না, তাহার নিজস্ব একটা পছন্দ আছে; সে জানে ঠিক কেমনটি তাহার চাই, তাহা ভিন্ন আর কোনটাই সে লইবে না। আধুনিক ইংরেজ ভদ্রলোকের এ বালাই নাই; সবচেয়ে বাহার-দেওয়া দোকানে প্রবেশ করিয়া সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুটি ক্রয়

করিয়াই তাহারা সন্তুষ্ট। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও বাড়ীর গৃহিণীরা কোথায় কোন্ জিনিষটি ভাল পাওয়া যায়, তাহার সন্ধান রাখিতেন, এবং সেই জিনিষ সেইখান হইতেই ক্রয় করিতেন। এখন সে প্রথাই উঠিয়া গিয়াছে। একালের গৃহিণী যাঁহারা তাঁহারা আর সে কষ্ট করেন না—'ষ্টোরস্' নামক বিশ্ব-পণ্যশালার শরণাপন্ন হন। এখন আর কেহ যাহা পছন্দ করেন তাহাই ক্রয় করেন না, যাহা ক্রয় করেন তাহাই পছন্দ করেন; এখনকার খরিদ্দারদিগের পছন্দের বালাই নাই। ঐ পথই বর্ব্বরতার পথ।

সভ্যযুগের মানুষেরা শিল্পকলা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রাচীনের ধারাটিকে রক্ষা করিয়া চলে। অবশ্য এই ধারা রক্ষা করিতে গিয়া অনেক সময়ে কতকগুলি প্রথার দাসত্ব করিতে হয়। প্রাচীন ধারা আর কিছু নয়—বহুকালব্যাপী ভূয়োদর্শনের অতিশয় কল্যাণকর পদ্ধতি; আর ঐ প্রথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু—কোন এক অর্ব্বাচীন পূর্ব্বযুগে কতকগুলা যে সুচতুর ও সহজসাধ্য আচার পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছিল তাহাই বহুলোকের অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সভ্য-যুগের নরনারীগণ এইরূপ লোকপ্রচলিত অন্তঃসারশূন্য প্রথাকেই সেই সম্মান দিবেন না যাহা প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রাপ্য। যাঁহারা গুণী ও রসজ্ঞ তাঁহারা পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইতে পারেন না, উহা তাঁহাদের স্বভাববিরুদ্ধ। পুরাতনের প্রতি আক্রোশ রস-চেতনারই অন্তরায়; যাহারা প্রথম হইতেই উহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে তাহাদের রস-চেতনা ক্রমেই জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। যে সমাজ সভ্যতার শীর্ষে আরোহণ করে সে সমাজের শিল্পী ও রসিকজন ঐ প্রাচীন ধারাকে অস্বীকার করেন না, উহার বিরুদ্ধে কোন বিরুদ্ধভাবও পোষণ করেন না; বরং তাহা হইতেই অনেক সুযোগ ও সুবিধা করিয়া লন। যে-সমাজে যথার্থ মূল্যজ্ঞান, অর্থাৎ প্রকৃত ইষ্টবোধ জন্মিয়াছে, সে-সমাজ শিষ্টাচারকেও একটি আবশ্যক সুখসাধন বলিয়া মনে করে। কিন্তু শিষ্টাচার শুধুই মূল্যজ্ঞানের নয়—উহা সেই সহজ বিচারবুদ্ধিরও একটি অবশ্যম্ভাবী ফল। কারণ, ধীরবুদ্ধিসম্পন্ন হইলে প্রাণও উদার হয়, এবং উদারতার ফলে মানুষ অপরের মত ও মনোভাব ধীর ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করে, তাই আত্মম্ভরী হইতে পারে না—অপরের উপরে জোর করিয়া নিজ মত চাপাইয়া দিবার প্রবৃত্তি হয় না।

যে-সমাজে মানুষকে এইরূপ স্বাধীনতা দেওয়া হয় না, সে সমাজের মূল্যজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি অতি নিম্নস্তরের হইয়া থাকে. অর্থাৎ সে সমাজ প্রকৃত সভ্য নয়। এমন

সমাজে, যে সকল ব্যক্তির প্রকৃতি কিছু উন্নত তাহারা স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ হয়। এই জন্য ইংরাজদের মধ্যে যে নারী বা পুরুষ একটু উচ্চমনা হয় তাহাকেই ঐ প্রতিকূল সমাজের মধ্যে বাস করিয়া, নিজের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব অতিশয় দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করিতে হয়। ফরাসী জাতির মধ্যে এখনও সভ্যতার একটা সংস্কার আছে—অন্ততঃ সে বিষয়ে একটা চক্ষুলজ্জা আছে, তাই সেখানকার সমাজে ঐরূপ ব্যক্তিকে কোনরূপ প্রতিকূলতা সহ্য করিতে হয় না, তাহাকে একক ও সহায়হীন হইতে হয় না। ইংরেজের পক্ষে সে সুবিধা নাই, তাই তেমন মানুষ বালক বয়স হইতেই অতিশয় অসামাজিক ও ব্যক্তি-সচেতন হইয়া উঠে। ক্রমে সে অতিশয় খেয়ালী ও একরোখা হয়, সেই কারণে আর সকলের নিকটে সে একটি 'কিম্ভূত চরিত্র' বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ইংরেজী-সভ্যতা—অথবা যাহাকে ঐ নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহা—এমনই ধোপ-দোরুস্ত ও ভণ্ডামীপূর্ণ, এমন ক্ষুদ্রাশয়, এবং তলে তলে এমন হিংস্র ও নিষ্ঠুর যে, প্রত্যেক উদার স্বভাব ইংরেজ ভদ্রলোককে সমাজের আশ্রয়হীন হইয়া বাস করিতে হয়। এইজন্য, যে-ব্যক্তির সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও রসবোধ আছে, সামাজিক শিষ্টতা-সুখের স্পৃহা যাহার আছে, যাহার গাত্রচর্ম্ম কর্কশ নহে—তেমন মানুষের পক্ষে ইংলণ্ডে বাস সুখকর নহে। আবার ঠিক ঐ কারণেই, এ জাতির মধ্যে এমন মহনীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনচিত্ততার উন্মেষ হইয়াছে, যাহার বলে কয়েকটি বিশিষ্ট প্রতিভাবান্ পুরুষ ঐ ভাষায় সর্ব্বযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে, এবং আধুনিক কালেও, কয়েকটি নূতন, দৃপ্ত, ও গভীর চিন্তা-বস্তুকে আরও বিস্তারিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

যে ব্যক্তির মূল্যজ্ঞান, অর্থাৎ ভোগ্য-বিষয়ে উৎকৃষ্ট-অপকৃষ্টের জ্ঞান খুব উন্নত, সে ব্যক্তি কখনও ক্ষুদ্রচেতা (Philistine) হইতে পারে না। সে কলাশিল্প, উচ্চচিন্তা প্রভৃতির যে আদর করিয়া থাকে তাহাতে ব্যাবহারিক প্রয়োজন-বোধ নাই, নিঃস্বার্থভাবেই করিয়া থাকে। অর্থাৎ, তাহাদের কাছে ঐ সকল বস্তুর একমাত্র মূল্য এই যে, উহাদের দ্বারা একরূপ চিত্তপ্রসাদ জন্মে; ঐ চিত্তপ্রসাদ—মনের একটি সুখকর অবস্থা, উহাই একমাত্র ইষ্ট, আর সকলই উপকরণ মাত্র। যাহাদের প্রকৃত মূল্যজ্ঞান হইয়াছে তাহারা সর্ব্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা আর কোন প্রয়োজনে করে না, একমাত্র প্রয়োজন—মনের ঐ সুখকর পুষ্টিসাধন। অবশ্য সে-সকলের ব্যাবহারিক মূল্যও আছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারাই মোটর-কার নির্ম্মাণ এবং ভাঙা-পা মেরামত করা যায়। সভ্য-পদবীর মানুষ যাহারা তাহারা জ্ঞানকে অতিসূক্ষ্ম

মানস-সুখসম্ভোগের উপায় বলিয়াই বুঝে, তাহার এই সুখ-দান-সামর্থ্যকেই তাহারা দূরতম প্রয়োজন সাধনের উপরে স্থান দিয়া থাকে। ক্ষুদ্রচেতা বর্ব্বরেরাই এমন প্রশ্ন করে যে, আর্ট, তত্ত্বচিন্তা, বা বিজ্ঞান-চর্চ্চার ব্যাবহারিক মূল্য কি? তাহাতে মনুষ্য সমাজের কি প্রত্যক্ষ হিতসাধন হইয়া থাকে? ইহাদের মূল্য-জ্ঞান নাই; ইহারা, লক্ষ্য ও উপলক্ষ্য, উপায় ও উদ্দেশ্য, এমন কি বিভিন্ন উপায়গুলার মধ্যেও উদ্দেশ্যসাধন হিসাবে যে তারতম্য, তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না।

গ্রীকগণ যে তত্ত্বচিন্তা ও সত্যসন্ধান করিত তাহাতে কোন ইতর উদ্দেশ্য ছিল না বলিয়া, যাহারা ঐরূপ ক্ষুদ্রচেতা তাহারা গ্রীকজাতির নিন্দা করিত। গ্রীকগণ বাষ্পীয় শকট নির্ম্মাণ করে নাই, বারুদ আবিষ্কার করে নাই, এমন কি সূতা কাটিবার যে চরকা তাহাও গ্রীকজাতির উদ্ভাবনা নয়। তাহারা কেবল চিন্তার দ্বারা তত্ত্বসন্ধান করিয়াছিল, তাহাও ঐ তত্ত্বকে জানিবার জন্য, চিত্তোৎকর্ষ লাভ করিবার জন্য,—শক্তিলাভ বা সুখসম্পদ-বৃদ্ধির জন্য নহে। আথেনীয়গণ বাহ্য-সম্পদ কামনা করে নাই, তাহারা অন্তরে ধনী হইতে চাহিয়াছিল। এই কারণেই তাহারা ইতিহাসে সভ্যতম জাতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

ঐ আথেনীয়গণও সময়ে সময়ে এমন চিন্তা করিয়াছিল যে—সৌন্দর্য্য ছাড়াও সুন্দরবস্তুর উপাদেয়তার অন্য কারণ থাকা উচিত। ইহার কারণ, ঐ জাতি ছিল সর্ব্ববিষয়ে কারণ-সন্ধানী। রেনেসাঁস-যুগের ইতালীয়গণ এত চিন্তাপ্রবণ ছিল না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী-সভ্যতার মূলে সৌন্দর্য্য-প্রীতি অপেক্ষা তত্ত্বানুরাগ ছিল কিছু বেশী। ইহা রেনেসাঁসের ঠিক বিপরীত। তথাপি স্বার্থলেশহীন বিশুদ্ধ জ্ঞান-সাধনার প্রতি ঐ শেষোক্ত সমাজের ভক্তিও ছিল অকৃত্রিম। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া ব্রাউনিং একটি উদ্ভট কবিতা লিখিয়াছিলেন, যথা—

"ছোটলোক যারা ছোট কাজই শুধু চায়,—
বোঝেও যেমন, সাধিতেও তথা পারে;
বড়লোক শুধু বড়রই পিছনে ধায়—
বুঝিতেও যথা, সাধিতেও তথা নারে।
ছোটলোক যারা—একটি একটি করি'
শতকিয়া তার ত্বরায় পুরিয়া লয়;
বড়লোক যেই—রহিবে কোটি-কে ধরি,'
নারে সে করিতে গোটিকেরো সঞ্চয়।

একজন, তার সবই ইহকালে ; তারো লাগি' পরকাল
আছে কিনা, লোকে ভাল করে' তাহা জানে ;
আরজন, সে যে পরমের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল হাল,—
সে যা' খুঁজেছিল, তরী ভিড়ে সেইখানে ।"

—সে বস্তু আর যাহাই হোক, নীচ বিষয়াসক্তি নহে। সেই যে অন্বেষণ, সেই যে জ্ঞানের সাধনা তাহাতে কোন বৈষয়িক লাভের লোভ নাই। তথাপি কোন একটিমাত্র বিদ্যার অনন্ত-সাধনাও ভাল নহে, ঐরূপ বিশেষজ্ঞ যাহারা তাহারা পূর্ণ-সভ্য নহে।

এই যে মূল্যজ্ঞান ইহার ফলে আর একটি বাসনা জাগে, আর একটির প্রতি গভীর আস্থা জন্মে, তাহার নাম—স্বাধীন-শিক্ষা, অর্থাৎ কোন বাঁধাবাঁধি রকমের শিক্ষা নয়, প্রত্যেকের মনের ক্ষুধা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষালাভ। সকল সভ্য-যুগেই এইরূপ শিক্ষা প্রচলিত ছিল। সভ্যমানুষেরা সেইরূপ শিক্ষাই পাইতে চায় —যাহা গৌণভাবে নয়, মুখ্যতঃ সেই পরম বস্তুর সহায়, সেই একমাত্র ইষ্ট-লাভ যাহাতে হয়। অপর পক্ষে, যাহারা ক্ষুদ্রচেতা (Philistine), যাহাদের মূল্যজ্ঞান নাই, তাহারা এমন শিক্ষাই চায় যাহা ধন অথবা প্রভুত্ব লাভের সেতু, অর্থাৎ যে-বস্তু নিজেই পরমার্থ-লাভের একটা উপায় মাত্র। স্বাধীন-শিক্ষা আমাদিগকে একেবারে সেই সার্থক ভোগসুখের অধিকারী করে ; প্রয়োজনমূলক শিক্ষা তাহার উপকরণগুলি আহরণ করিবার সামর্থ্য দেয় মাত্র, কিন্তু আহরণকারী নিজে তাহার সার্থক ভোগ না করিতেও পারে, অপরেও করিতে পারে।

য়ুরোপে শিক্ষার একটা প্রাচীন ধারা চলিয়া আসিতেছিল, সেই শিক্ষা স্বাধীন-শিক্ষারই মত। শিক্ষার সেই ধারা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল ; যদিও শেষোক্ত কালে, উহাতে জ্যামিতি ও গণিতের চর্চ্চা রীতিমত যোগ করিয়া —অথচ উহার জাতিনাশ না করিয়া, উহাকে কালোপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে উহার উপরে অনেকগুলি ধাক্কা আসিয়া লাগিল। ঐ কালে যন্ত্রশিল্পের প্রাদুর্ভাবে একটা বড় বিপ্লব ঘটিয়া গেল, তাহাতে মধ্যবিত্ত নামে একটা নূতন সমাজের অভ্যুদয় হইল, এবং 'কর্ম্মই ধর্ম্ম' এই নূতন অজুহাতে অর্থোপার্জ্জনই একমাত্র পুণ্যকর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইল। ইহার ফলে, শিক্ষার ঐ আদর্শ ভাঙ্গিয়া পড়িতে সুরু হইল। শেষে, মিঃ এইচ, জি, ওয়েল্‌স্ যাহাকে "গত কয়েক বৎসরের শোকাবহ ঘটনা" বলিয়াছেন, এবং যাহাকে সকল স্বাধীন-

শিক্ষিত নরনারী "যুদ্ধ" বলিয়াই জানে, তাহার প্রচণ্ড আঘাতে ঐ শিক্ষা একেবারে নষ্ট হইয়া গেল।

যাহার মূল্যজ্ঞান আছে, এবং সেই কারণে যে, উপায় ও উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও উপলক্ষ্যের পার্থক্য বুঝিতে পারে—তেমন ব্যক্তি অপর সকল হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র বোধ করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। সে গড্ডালিকা-বৃত্তি আশ্রয় করিবে না। সভ্যতার যে জন্ম-হেতু, যাহার নাম দিয়াছি—বিচার-বুদ্ধির বশ্যতা, তাহাতেও একরূপ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিত্বের গৌরব-বোধ জাগে। ইহাও অতি উচ্চস্তরের সভ্যতার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। অতএব, ইহার সম্বন্ধে এইখানেই কিছু বলা আবশ্যক। মানসিক সুখ বা চিত্তপ্রসাদই যদি মনুষ্য জীবনের ইষ্ট হয়, তবে সেইরূপ চিত্তোৎকর্ষজনিত সুখ যে 'ব্যক্তির' মানসেই পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইতে পারে, অর্থাৎ তাহা যে একটা সাধারণ-সেব্য বস্তু নয়, তাহা যে ব্যক্তিগত—সমষ্টিগত নয়, ইহা, অবশ্য স্বীকার্য্য; কারণ, সকল মনই ব্যক্তির মন, বহুজন-মানস নামে কোন মানস-সমষ্টি থাকিতে পারে না, সেটা একটা কল্পনামাত্র। অতএব ঐ যে মানব জীবনের মহত্তম ইষ্ট উহা ব্যক্তিবিশেষের একক উপলব্ধিই বটে। ঐরূপ ব্যক্তির পক্ষে ইহা স্মরণ না রাখা একটি গুরুতর অপরাধ যে, আমরা যে সকল 'তত্ত্ব' বা সাধারণ নিয়মের স্থাপনা করি তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়া থাকে কোন এক ব্যক্তিরই অভিজ্ঞতায়। তাই রেনোসাঁস-যুগের ইতালীয়-সমাজ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-মহিমাকেই শ্রেষ্ঠ পূজা নিবেদন করিয়াছিল,—একটু বাড়াবাড়িও করিয়াছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহার কুফলও আছে; উহাতে ব্যক্তির অহমিকা এত বৃদ্ধি পায় যে, তাহাও বর্ব্বরতার নামান্তর মাত্র। পেরিক্লিস (গ্রীস) বা ভলটেয়ারের (ফ্রান্স) যুগ যে সভ্যতম তাহার কারণ এই যে, ঐ দুই যুগে সামাজিক শিষ্টাচার এবং আলাপ-আলোচনায় পরমত-সহিষ্ণুতা এমনই অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার দ্বারাই ঐরূপ ব্যক্তিগত হঠতা বা আত্মম্ভরিতা সংযত হইয়া থাকিত। গ্রীক সমাজের ব্যক্তিত্ব-বোধ তাহাদের চিন্তারাজির মধ্যেই প্রকাশ পাইত; অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসীস সমাজও এই ব্যক্তিত্ব-সাধনাকে যে মতবাদ ও যুক্তি-বিচারের দ্বারা পুষ্ট করিয়াছিল তাহাতেই ফরাসী-রাষ্ট্রবিপ্লব আসন্ন হইয়া ওঠে; উহার মূলে ছিল—ব্যক্তিমাত্রেরই স্বাধীনতার দাবী, মানুষ হিসাবে তাহার একটি বিশেষ মর্য্যাদার অনুভূতি।

এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-জ্ঞান হইতেই আর একটি যে মনোভাবের জন্ম হয়, যাহার

নাম—বিশ্বাত্মীয়তা, বা বিশ্বদেশীয়তা (Cosmopolitanism)—তাহার সম্বন্ধেও এখানে কিছু বলা আবশ্যক। কোন স্বাতন্ত্র্যকামী বুদ্ধিমান ব্যক্তিই স্ব-সমাজ বা স্ব-রাষ্ট্রের প্রতি মমতা-সম্পন্ন হইতে পারে না, ঐরূপ হওয়াকে সে বড় জোর একটা বিপজ্জনক আপদ্ধর্ম্ম বলিয়াই মনে করিবে। সভ্যতার উন্নতি ও তাহার পরাকাষ্ঠার লক্ষণ এই যে, ঐ ব্যক্তিত্ববোধই ক্রমে বিশ্বাত্মীয়তার দিকে প্রসারিত হইতে থাকে, মানুষ ক্রমে দল বা গোষ্ঠী-চেতনার পশু-সুলভ সংস্কার হইতে মুক্তি-লাভ করে। গ্রীক জ্ঞানী-সম্প্রদায়ের রচনা হইতে এমন অনেক বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে যাহাতে ঐ বিশ্বাত্মীয়তাবোধের স্পষ্ট ঘোষণা আছে। আবডেরা (Abdera)-বাসী ডিমোক্রিটাসের সেই বাক্য স্মরণ কর—"কোন দেশেই জ্ঞানীর প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়, যাহারা সাধু ও সদাশয় সমস্ত পৃথিবীই তাহাদের পিতৃভূমি।" রেনেসাঁস যুগেও ঠিক ইহাই ঘটিয়াছিল; তার কারণ, মানুষ যেমনই স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে সুরু করে অমনই তাহার স্বাজাত্য-বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। আথেনীয়গণ যে স্বদেশবৎসল ছিল তাহা সত্য; কিন্তু তাহাদের সেই স্বদেশপ্রীতি কোন কুপ্রবৃত্তির দ্বারা কলুষিত হয় নাই; তাহারা যে আথেন্সকে ভালবাসিত তাহা আথেন্সের সত্যকার মহিমার জন্য—কেবল তাহাদের বাসভূমি বলিয়াই নহে, সেরূপ পশু মনোভাব তাহাদের ছিল না। সেই দেশপ্রেমেরও মূলে ছিল কতকগুলি বিশেষ ও বরণীয় গুণের প্রতি বুদ্ধিসঙ্গত শ্রদ্ধা; একটা নাম বা একটা পতাকার প্রতি নির্ব্বোধের অন্ধভক্তি নহে। অতিশয় উগ্র স্বাজাত্য-বোধের আক্রমণে সভ্যতা যখন বিপন্ন হয় তখন এই বিশ্ব-জাতিবোধই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে।

সভ্যতার আরও একটি অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ, হাস্যরস-রসিকতা। এই রসিকতারও মূলে আছে অতিসূক্ষ্ম মূল্যজ্ঞান। আমি অবশ্য ভাঁড়ামি বা বেলেল্লাপনার কথা বলিতেছি না; সিংহলদ্বীপের ভেদ্দা-জাতিও সেরূপ রসিকতা করিতে জানে—তাহারা বসিবার আসনে কাঁটা গুঁজিয়া রাখে; পশ্চিম আফ্রিকার ইয়োরুবা জাতিও অতিশয় অশ্লীল গ্রাম্য রসিকতার দ্বারা পরস্পরের চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে। ইহা সেই হাস্যরস-চেতনা—যাহার জন্য, কোন-কিছুকে অতিরিক্ত রকম বড় করিয়া তুলিলে হাস্যোদ্রেক হয়; এইরূপ রসবোধ তাহাদেরই আছে যাহারা গৌণবস্তুকে মুখ্যের উপরে স্থান দেয় না। যেটা আসলে একটা উপায় মাত্র, অর্থাৎ যাহার নিজস্ব পৃথক মূল্য নাই, তাহাকেই

সর্ব্বস্ব করিয়া তুলিলে ব্যাপারটা অতিশয় হাস্যকর হইয়া উঠে। যেহেতু মানুষ কখনই তাহার মনোগত উচ্চ অভিপ্রায়কে সম্পূর্ণ সফল করিয়া তুলিতে পারে না, এ জন্য একজন সুসভ্য ব্যক্তির চক্ষে সর্ব্বপ্রকার মহৎ প্রচেষ্টা কিঞ্চিৎ হাস্যকর দেখায় বটে, তথাপি প্রেম, সৌন্দর্য্য কিম্বা সত্যের প্রতি প্রাণান্তিক নিষ্ঠা দেখিয়া যাহারা কেবলই উচ্চহাস্য করে, তাহারা যে ঘোরতর মূর্খ তাহাতে সন্দেহ নাই ; তাহারা মহৎ হৃদয়ের মহৎ বাসনা বুঝিতেই পারে না। প্রেমিকের ভাবোন্মাদ, শিল্পীর সৌন্দর্য্য সন্ধান অথবা ধ্যানীর ভূমানন্দ-পিপাসা, এ সকলের বাহ্যিক ব্যবহার যতই কৃচ্ছ্রসাপেক্ষ—এবং সেইজন্য দৃষ্টিকটু হোক, তাহাদের মূল উদ্দেশ্য অতিশয় মহৎ ; আমরা তাহাদের সেই উপলক্ষ্য বা উপকরণগুলিকে যদি অযোগ্য বলিয়া মনে করি, সে ভুল আমাদেরই। ইহার পর, ঐ অভীষ্টের জগৎ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া একবার উপায় ও উপকরণের—অর্থাৎ, যে সকল বস্তু মুখ্য নয়, গৌণ—তাহাদের জগতে দৃষ্টিপাত কর। কেহ বা ব্যবসায়, কেহ বা দেহ-সুখ, কেহ বা খ্যাতি ও প্রতিপত্তির জন্য ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে ; উহাদের একটাও মুখ্য বা অভীষ্ট নয়, প্রত্যেকটাই অভীষ্টলাভের উপায় বা উপকরণমাত্র। উহারা সেই চিত্তপ্রসাদকে গৌণ করিয়া—উৎকৃষ্টকে ত্যাগ করিয়া—নিকৃষ্টকে জীবনের সারবস্তু করিয়াছে। ছোটকে এমন বড় করিয়া তোলা, ইহা দেখিয়া যে একটি সূক্ষ্ম হাস্যরসের উদ্রেক হয়—সভ্যতার পুরস্কারস্বরূপ, সভ্য মানুষই তাহা উপভোগ করিতে পারে।

ঐ যে বিশ্বাত্মীয়তা, এবং ঐ যে হাস্যরস-রসিকতা, উহা ব্যক্তিগত সভ্যতার লক্ষণ—সমাজগত নয়, সে কথা বলিবার সময় এখনও আসে নাই। আমি পরে প্রমাণ করিব যে, সভ্য-সমাজ বলিতে সেই সমাজ বুঝায়—যে-সমাজ মাত্র কয়েকটি বিশিষ্ট সভ্য-মানুষের সংস্পর্শে একরূপ প্রভাবিত হইয়াছে, এবং তাহাদেরই সভ্যতায় অনুরঞ্জিত হইয়াছে। আমার উপস্থিত কাজ তাহা নয় ; এক্ষণে আমি সভ্য নর ও সভ্য নারীর গুণ বর্ণনা করিতেছি না, কেবল যে তিনটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সমাজকে সভ্যতার আদর্শস্থল বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছি তাহাদের বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিতেছি। যেগুলি মূল্যজ্ঞানের আনুষঙ্গিক, এতক্ষণে তাহাদের আলোচনা শেষ করিয়া এইবার আমি সেই লক্ষণগুলি নির্ণয় করিব যাহাদের মূলে আছে অতিসূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির শাসন।

বিচার-বুদ্ধির ঐকান্তিক বশ্যতা

ঐতিহাসিকগণের মতে, আথেনীয় সভ্যতার সারমর্ম্ম নিহিত আছে—পেরিক্লিসের একটি বক্তৃতায়, যে বক্তৃতায় তিনি আথেনীয়গণকে একটা বড় দুঃখের দিনে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। পেরিক্লিসের ঐ বক্তৃতায় একটি সুন্দর ভাব-পরিবেশের আভাস আছে। বক্তৃতাটি খুবই সুন্দর। কিন্তু, সভ্যতার সারমর্ম্ম বলিতে যে অতিশয় সূক্ষ্ম বস্তু বোঝায়, কোন রাষ্ট্রনৈতিক বক্তৃতায় আমি তাহার সন্ধান করিব না। আথেনীয় সাধনার সেই গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইলে পেরিক্লিস, ইসোক্রাতেস (Isocrates) প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়কের বক্তৃতা অপেক্ষা আরিস্তোফানেস্ (Aristophanes), ইয়ুরিপিদিস, প্লেটোর রচনাবলী তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। যে রঙটি—জাফরানের মত—হেলেনীয় সাধনা ও সংস্কৃতিকে স্বাদ এবং সৌরভ দুই-ই দান করিয়াছে, তাহা যদি কোথাও থাকে, তবে কবি, ঐতিহাসিক ও দার্শনিকদিগের লেখাতেই আছে। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, কেবল তাহাদের রচনাতেই উহা মিলিতে পারে, কিম্বা তাহারাই উহার একমাত্র প্রচারকর্ত্তা; বরং আমি এখনই দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, কালচার বস্তুটি এমন কতকগুলি ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে যাহাদের অধিকাংশই, সেই কর্ম্মের কোন বাহ্যিক নিদর্শন, কোন সুস্পষ্ট কীর্ত্তিচিহ্ন রাখিয়া যায় নাই; তাহারা কেবল এমন একটি প্রভাব বিকিরণ করে যাহা সেই-যুগের যুগধর্ম্মরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আর যাহাই হৌক, কোন রাষ্ট্রনৈতিককে জাতির আধ্যাত্মিক বা মানসিক সাধনার প্রবর্ত্তক বলিলে নিতান্তই হাস্যকর হইয়া পড়ে। রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা অথবা ঘোড়দৌড়ের 'জকি'র মত, রাষ্ট্রনৈতিক মহারথীরা কেবল তাৎকালিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া থাকেন; পরে, তাহাদেরই মত, জনগণের স্মৃতি হইতে নির্ব্বাসিত হন, পণ্ডিতগণের গবেষণার বিষয়ীভূত হইয়া উঠেন;—"জীবৎ-কালে উপহসিত এবং মৃত্যুর পরে বিস্মৃত" হইয়া থাকেন। দুইদিন পরেই যাহাদিগকে কেহই স্মরণ রাখিবে না, তাহারাই রাষ্ট্রীয় মন্ত্রিপরিষদে বসিয়া যেরূপ স্বমহিমা প্রচার করে, তাহা অপেক্ষা হাস্যকর আর কি হইতে পারে? বলুন দেখি, আপনাদের বন্ধুগণের মধ্যে কয়জন বলিতে পারেন—ওয়াটার্লু'র যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী কে ছিলেন? অথবা, সে সময়ে 'ফার্ষ্ট লর্ড অব অ্যাডমিরালটি' ছিলেন কে? যদ্যপি অতিশয়

সুশিক্ষিত ইংরাজ নর-নারী সেই নেপোলিয়ন-যুদ্ধ-জয়ী প্রধান মন্ত্রীর নাম বলিতে না পারেন; যিনি তাঁহার সহযোগী মন্ত্রিগণের, তাঁহার অধীনস্থ দুইজনের অধিক যোদ্ধ-পুরুষের, কিংবা তাঁহার নৌ-সেনাপতির একজনেরও নাম না বলিতে পারেন,—তথাপি, প্রত্যেক দ্বিতীয় শ্রেণীর আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট এ সংবাদ দিতে পারিবে যে, ঐ সময়ে শেলী, বায়রণ, কীটস্, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, স্কট, মুর, রজার্স এবং জেন্ অষ্টেন প্রভৃতি—গদ্যে ও পদ্যে সাহিত্য রচনা করিতেছিলেন। ইহার কারণ সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ইঁহারা সেকালে যেমন, একালেও তেমনই, মানুষের মনে একটা প্রত্যক্ষ ভাবধারা সঞ্চার করিয়া থাকেন; ইঁহারা এখনও সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন, এখনও আমাদিগকে নিত্য-নূতন দৃষ্টি দান করিতেছেন, অথবা পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন করিতেছেন; এখনও তাঁহারা জগতের যাবতীয় হিত-চিন্তার সঞ্চিত সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতেছেন। ঐ সকল রাষ্ট্রনেতাগণ বড় জোর সেই শুভ সম্পদগুলি ব্যবহারে লাগাইয়া বহুজন মধ্যে বিতরণ করিতে পারেন—তাঁহারা স্মরণীয় হন, তবে কিছুই সৃষ্টি করিতে পারেন না। যদি তাঁহারা স্মরণীয় হন, তবে সে কেবল কোন বড় ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার জন্য—সেই ঘটনার কোনটাই তাঁহাদের দ্বারা ঘটে নাই।

অতএব আমি পেরিক্লিসের বক্তৃতায় আথেনীয় সভ্যতার তত্ত্ব সন্ধান করিব না। আমি কেবল সেই বক্তৃতার একটি কথামাত্র স্মরণ করিব—তাহাতে আথেনীয় সভ্যতার যাহা প্রধান লক্ষণ, সেই 'পরমত-সহিষ্ণুতা'র উল্লেখ আছে। ইহা সেই মানসিক গুণ যাহা উচ্চতম সভ্যতায় অবস্থাতেই সম্ভব; বিচার-পরায়ণতা হইতেই ইহা জন্মে—ইহার জন্য কেবল রসবোধই যথেষ্ট নয়। যে তিনটি মূল সত্য স্বীকার না করিলে সমাজে স্বাধীনতা-ভোগ সম্পূর্ণ হইতে পারে না তাহা একমাত্র ঐ বিচারবুদ্ধিরই আয়ত্ত। সে তিনটি এই:—(১) আমরা যাহা বিশ্বাস করি তাহা সত্য না হইতেও পারে; (২) যাহা আমাদের প্রেয়, তাহাই শ্রেয়ঃ নয়; এবং, (৩) কোন বিষয়েই পুনর্বিচার অগ্রাহ্য হইতে পারে না। প্রকৃত মূল্য-জ্ঞান জন্মিলে আমরা কেবল ইহাই বুঝিতে পারি যে, কাহারও অকুণ্ঠিত মত-প্রকাশে বাধা দিলে জীবনকেই পঙ্গু করা হয়; কিন্তু বিচার-বুদ্ধি সম্যক্ জাগরিত না হইলে আমাদের হৃদয়ের সেই প্রচ্ছন্ন ও সদা-উদ্‌গ্রীব প্রবৃত্তিকে দমন করিতে পারি না—যাহার বশে আমরা অপর সকলকে আমাদের সমধর্ম্মী

করিয়া তুলিতে চাই। একমাত্র ঐ বিচারবুদ্ধিই সর্ব্বে-সর্ব্বা হওয়া চাই; আবার ঐ বিচার-বুদ্ধির বশেই আমরা এইরূপ আত্ম-মত ঘোষণার সীমাও নির্দ্দেশ করিয়া দিব—যদি বিচারপূর্ব্বক দেখা যায় যে, তাহাতে সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণসাধনের সম্ভাবনাই অধিক।

মূল্যজ্ঞান থাকিলে, সকলেরই পূর্ণ আত্মস্ফূর্ত্তি বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হইবে। অতএব, অপরের শুধু চিন্তা বা মত নয়—জীবন যাত্রা-প্রণালীর স্বাতন্ত্র্য-লিপ্সা—নরহত্যা ও গৃহদাহ প্রভৃতির দ্বারা চরিতার্থ হয়, সমাজের পক্ষে তেমন মানুষকে প্রশ্রয় দেওয়া অসম্ভব বটে; কিন্তু যে কেবল আমাদের মনেই কোনরূপ আঘাত দেয়, তাহাকেও কারারুদ্ধ করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। এইরূপ স্বাতন্ত্র্য বিরুদ্ধতার একটি অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত—অগম্যা গমন নামক অপরাধের কঠিন শাস্তিবিধান। এইরূপ সহবাসের কথা স্মরণ করিলে আমাদের অনেকেরই মধ্যে একটা প্রবল দৈহিক প্রতিক্রিয়া ঘটে, যেন স্নায়ু-শিরায় হঠাৎ একটা আঘাত লাগে; ঐরূপ সম্পূর্ণ শারীরিক উপদ্রবকেই আমরা একটা গভীর ধর্ম্ম-চেতনার উদ্রেক বলিয়া ভ্রম করি। এইরূপ জুগুপ্সা ও বিতৃষ্ণাবোধ কিরূপ তাহা আমি জানি, এবং আমার—কেবল অগম্যা-গমন বিষয়েই নয়—'চীজ' (পনির)-নামক খাদ্যবস্তুটির সম্পর্কেও ঘটিয়া থাকে। ঐ 'চীজ'-দর্শনমাত্রে উহার ঘ্রাণ, এমন কি উহার স্মরণমাত্রে, আমার ঘোরতর অস্বস্তি ও বিরক্তির উদ্রেক হয়; যখন কাহাকেও উহা খাইতে দেখি, তখন আমার সর্ব্বশরীর ও মন বিরূপ হইয়া উঠে, মনুষ্যজাতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রায় লুপ্ত হইবার উপক্রম হয়। তথাপি, আমার বিচার-বুদ্ধি আমাকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, 'চীজ'-ভক্ষণ একটা পাপকর্ম্ম নহে; বিচার-বুদ্ধিই নিষেধ করে—আমি যেন একটা শারীরিক অনুভূতিকে নৈতিক অপরাধবোধ বলিয়া ভুল না করি। অতএব, একমাত্র বিচার-বুদ্ধিই মনের অন্ধ অভ্যাসকে শাসনে রাখিতে পারে। পরমতবিরুদ্ধতার মূলে আছে—এইরূপ অন্ধ সংস্কারকে নীতির রূপে বড় করিয়া তোলা, এবং সেই নীতিগুলাকে অপরের উপরে জোর করিয়া চাপাইয়া দিবার প্রবৃত্তি।

অবশ্য, অতিশয় উচ্চ-সভ্যতাপন্ন সমাজগুলিও এই পরমতসহিষ্ণুতার বিষয়ে সমান উদার ছিল না; তথাপি, সকলেই উহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছে, সকলেই অনুভব করিয়াছে যে—কোন চিন্তা, ভাব বা আচার-নীতি অপরের উপরে

জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া অতিশয় কুৎসিত; সকলেই অল্পাধিক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে যে—বদ্ধ-মত মাত্রেই জীবনের বিকাশকে রুদ্ধ করে।

আবার, যাহাকে মিথ্যা-সংস্কার বা কু-বিশ্বাস বলে, তাহা মানুষের বাস্তব-বোধকেও আচ্ছন্ন করে—বাস্তবকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাওয়ার যে অতি তীক্ষ্ণ ও গভীর আনন্দ তাহা হইতে মানুষকে বঞ্চিত করে। সত্যকে সাক্ষাৎ করার—বস্তুর স্বরূপকে উপলব্ধি করার যে সম্ভোগ-সুখ, তাহার সহিত একমাত্র প্রেম অথবা সৌন্দর্য্য-রসাস্বাদের তুলনা হইতে পারে। প্রেমিক তাহার প্রিয়তমকে যদি একটা কাব্যাকাশের কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়াই দেখে, তবে সে যেমন অপর একটি মানবীয় সত্তার সহিত পূর্ণ পরিচয়, এবং তজ্জনিত একটি পরম আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়, তেমনই, যে ব্যক্তি এই বিশ্বসংসারকে কতকগুলি কু-বিশ্বাসের চশমা দিয়া দেখে, সে-ও কখনই সেই নিবিড় হর্ষ অনুভব করিতে পারে না, যাহা কেবল তখনই উদ্রিক্ত হয়, যখন জগতের নগ্ন নিষ্কলঙ্ক সত্য-রূপটিকে আমরা সর্ব্বসংস্কারমুক্ত হইয়া বরণ করিতে পারি।

যাহারা পরের স্বাতন্ত্র্য সহ্য করে এবং যাহারা কু-সংস্কারমুক্ত, তাহাদের নিষ্ঠুর না হওয়াই স্বাভাবিক। আথেন্স-নগরীতে সর্ব্বপ্রকার দৈহিক পীড়ন আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছিল—তাহারা উহা সহ্য করিতে পারিত না। ইতালীর রেনেসাঁস-যুগে যে উগ্র ব্যক্তি-পূজার প্রচলন হইয়াছিল, তাহার ফলে যেন একসারি অসাধারণ গুণসম্পন্ন পুরুষের উদয় হইয়াছিল। ইহারা কতকগুলি পৈশাচিক ও অকারণ নিষ্ঠুরতার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইঁহাদের সেই পাপাচরণের অধিকাংশই অতি কঠিন বাস্তব-প্রয়োজনের বশে ঘটিয়াছিল। আপনারা যদি ইহা স্মরণ রাখেন—আমি তাহাই রাখিতে বলি—যে, ঐ সকল পৃথক হত্যাকর্ম্মের প্রায় অনেকগুলিই যুদ্ধ-নিবারণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা হইলে বুঝিয়া দেখিবেন—বর্ত্তমান যুদ্ধের মহাশয়েরা কোন্ মুখে সেই রেনেসাঁস-যুগের রাষ্ট্রধুরন্ধর-গণকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে পারেন।

মানুষের কু-বিশ্বাস বা কু-সংস্কার—তাহার সেই বহুপূর্ব্বের অসভ্য-জীবনের একটা জের মাত্র; বিচার-বুদ্ধি সেইগুলিকে অতিশয় সতর্কতার সহিত উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দূরে পরিহার করে। সেগুলা একরূপ দেহঘটিত বা শারীরিক অভ্যাস বলিলেও হয়—যেমন চীজের উপর আমার ঐ বিতৃষ্ণা অথবা এমনও হইতে পারে যে, কোন বর্ব্বর পূর্ব্বপুরুষ হইতে ঐরূপ নানা সংস্কার পুরুষানুক্রমে

সংক্রামিত হইয়াছে। সেদিনও মিঃ জেমস্ জয়েস তাঁহার একখানি পুস্তকে, কেমন একটু অদ্ভুত অসম্বদ্ধভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে—বাল্যকালে সকলেই যেরূপ কাজ বা চিন্তা প্রায় করিয়া থাকে, তাহারই স্মৃতি একজন ঐরূপ কুসংস্কারপ্রবণ মানুষকে এমন যাতনা দিতে লাগিল যে, শেষে সে উন্মাদ হইয়া গেল! সমাজের বহু লোক পাপ-নামক যে একটি মানস-ব্যাধিকে পোষণ করিয়া নিজেরাও কষ্ট পায় এবং অন্যকেও পাইতে বাধ্য করে, তাহা আর কিছু নয়, সেই প্রাচীন বর্ব্বর-যুগের একটা অনপনীত কু-বিশ্বাস—উপযুক্ত চিকিৎসার দ্বারা উহা আরোগ্য করাও যায়। সভ্যতা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ববিষয়ে যে কারণ-সন্ধানের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, উহাই তাহার একমাত্র ঔষধ।

সমাজকে যদি সত্যকার সভ্য-অবস্থায় উন্নীত করা বাঞ্ছনীয় হয়, তবে বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে হইবে; যাহা-কিছু চিন্তা-গোচর হয়, তাহাতেই বুদ্ধিকে ইচ্ছামত খেলিবার স্বাধীনতা দিতে হইবে, তাহার সম্বন্ধে, যেমন-অভিরুচি —যে-কোন শব্দ, বাক্য বা ভাবচিত্র ব্যবহার করিতে যেন কোন বাধা না থাকে। ভাবে বা ভাষায়, সুরুচি-কুরুচির প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর—রুচি জিনিষটা আদৌ ব্যক্তিগত, যেমন, আমার রুচিতে অধিকাংশ জনপ্রিয় গানের সুরও যেমন অসহ্য, ভাষাও তেমনই গ্রাম্য। কিন্তু তাই বলিয়া আমি সেগুলিকে জোর করিয়া বন্ধ করিবার পক্ষপাতী নই; তাহা সহ্য করিবার মত বিবেচনা-শক্তি আমার আছে; আইনের দ্বারা বন্ধ করিবার প্রস্তাব আমি কখনই করিব না। রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে, এমন অনেক বস্তু মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজের রুচিবিরুদ্ধ ছিল, যাহা তৎপূর্ব্ব-যুগের কবি শিল্পী ও মনীষিগণ অতিশয় সুন্দর ও সরস বলিয়া মনে করিতেন। সে সময়ে কোন লেখক এমন কিছু মুদ্রিত করিতে পারিতেন না, যাহা প্লেটো, দান্তে বা শেকস্পীয়ারও লিখিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। অথচ সেইকালে এমন অনেক কিছুকে নির্ব্বিবাদে হজম করিতে হইত যাহা ঐ সকল মহাজনগণ অতিশয় গ্রাম্য ও ইতর বলিয়া বিবেচনা করিতেন। পুস্তকের দোকানে, আর্ট-প্রদর্শনীতে ও গীত-বাদ্যালয়ে যে ধরণের সাহিত্য, ছবি ও মূর্ত্তি, এবং সংগীত ঐকালে প্রচারিত হইত, তাহা যে-কোন প্রকৃষ্টমনা পুরুষ ও নারীর বমনোদ্রেক করিবে। একান্ত জনচিত্তবিনোদন সাময়িক সাহিত্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তখন ছিল না; যে-নাটক কেবল অশিক্ষিত জন-মণ্ডলীর ভাবাবেশ তৃপ্ত করে, তাহাতেও কাহারও আপত্তি ছিল না। এক কথায়,

ঐ কালের ঐ সমাজ-জীবন ও আর্ট উভয়েরই এমন একটা আদর্শকে প্রশ্রয় দিত, যাহা কু-রস-রসিক মিলটন বা কুরুচিগ্রস্ত শেক্স্‌পীয়ারের মতে একজন অতিশয় হীনচিত্ত মানুষেরও পছন্দ করা লজ্জাজনক।

রুচিঘটিত সকল ব্যাপারে যাহা একমাত্র উচিত ও বাঞ্ছনীয়, তাহা—ঐ উদার মনোভাব; অর্থাৎ, পরের রুচি-স্বাধীনতা স্বীকার করা। আমার বিচারে ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় যে, শিক্ষিত ও চিত্তোৎকর্ষসম্পন্ন নর-নারীর যাহা প্রেয়, তাহা মূর্খ ও অসভ্য জনগণের দ্বারা যেমন নিরূপিত বা নিয়মিত হওয়া উচিত নয়, তেমনই, ঐ অমার্জ্জিত-রুচি মূর্খগণ যাহাতে সুখ পায়, তাহাতেও সুশিক্ষিত, সুসভ্য ব্যক্তির বাধা দেওয়া অকর্ত্তব্য। কিন্তু বিপদ হয় ঐ উন্নতরুচি ব্যক্তি-দিগেরই; কারণ, সাধারণ ভোটদাতার বুদ্ধি ও বিচার-শক্তি অতিশয় নিম্নস্তরের হইয়া থাকে, তাহাদের রুচি বা রসবোধের বালাই নাই। তবু তাহারই বিচারক না হইয়া ছাড়িবে না, কাজেই বিচারের মাপকাঠি হয়—একটা এমন-কিছু যাহা অতি সহজে ব্যবহারযোগ্য—কোন সূক্ষ্ম বিচার বা সংশয়ের অবকাশ যাহাতে নাই। সাধারণ স্তরের মানুষ যাহারা, তাহারা একটা সহজ ব্যবহার-উপযোগী, তৈয়ারী-মাপকাঠিই পছন্দ করে; সেইরূপ মাপকাঠির দ্বারা তাহারা সকল বিষয়ে একটা আশু নিষ্পত্তি করিয়া নিশ্চিন্ত হয়। একটা ছবি সুন্দর কিনা তাহা সে বলিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহা যে রাফায়েলের আঁকা নয়, ইহা প্রমাণ করা সহজ; সেইরূপ, কোন্ রচনায় রুচি নিকৃষ্ট তাহা সে জানে না বটে, কিন্তু কোন রচনায় কতকগুলি বিশেষ শব্দ বা বিশেষ বস্তুর সমাবেশ আছে কিনা, তাহা সে সহজেই বলিতে পারে। তাহার যে একটা মাপকাঠি আছে, সেই মাপকাঠির দ্বারাই সে প্রতিদিন সকালে ও বিকালে রেলের থার্ড ও ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ীর মত সর্ব্ব বিষয়ে উচ্চ-নীচ ভেদ করিয়া থাকে। পুণ্য-প্রীতি বা আচারগত ধার্ম্মিকতা যেমন ধর্ম্ম নয়—ধর্ম্ম-বিধির অন্ধ অনুসরণ মাত্র, তেমনই, শুচিতা-গর্ব্বও প্রকৃত সুরুচির লক্ষণ নয়—উহা রুচির নামে একটা নিয়ম পালন মাত্র। আবার, যিনি প্রকৃতই ধর্ম্মপ্রাণ তিনি যেমন ধর্ম্মের গৌরব-হানির ভয় করেন না, তেমনই, যে ব্যক্তি প্রকৃত রুচি-সম্পন্ন তিনি কুরুচি বলিয়া কোন-কিছুকে বর্জ্জন করিতে অস্থির হন না।

জীবনের সর্ব্ববিধ ভোগ্য বস্তু মুক্তপ্রাণে ভোগ করিবার শক্তি এবং তাহাতে অধিকার-বোধ—পূর্ণ সভ্যতার লক্ষণ। উত্তমরূপে ভোগ করিতে হইলে মন

হইতে সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার-বন্ধন দূর করিতে হইবে; তজ্জন্য শুচিতার গর্ব্ব, মিথ্যা-সংস্কার, মিথ্যা-সংকোচ, এবং পাপ-বোধ-ত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক।

ইহার জন্য চাই মনের বিচার-শীলতা; সার্থক ভোগসুখের জন্য শ্রেয় ও প্রেয়র মধ্যে যে পার্থক্যজ্ঞান আবশ্যক, তাহাই সেই মূল্যজ্ঞান—যাহাকে সভ্যতার অপর স্তম্ভ বলিয়াছি। এই মূল্যজ্ঞান হইতেই, সুসভ্য জাতিমাত্রেই বুঝিতে পারে যে, ভোগের বিষয়-গত কোন দোষ নাই; ভোগ যেমনই হোক—ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির যোগ তাহাতে থাকুক—কোনপ্রকার ভোগই দোষাবহ নহে। কেবল একটি বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে—তাহা এই যে, কোন ক্ষুদ্রতর সুখের জন্য বৃহত্তর সুখ-লাভে বিঘ্ন না হয়। যেমন,—প্রকৃত সভ্যতা যাহার আছে, সে মদ্যপানকে কুকার্য্য মনে করিবে না, কিন্তু সকল সভ্য সমাজেই পানাসক্ত মদ্যপ ঘৃণিত হইয়া থাকে। সভ্য-মানুষ যদি কোন ভোগসুখে বিরত হয়, তবে তাহা নিন্দনীয় বলিয়া নহে—ঐরূপ ভোগসুখের পরিণাম সুখকর নয় বলিয়া। প্রবৃত্তির বশ্যতাপন্ন হওয়াকেই সভ্য মানুষ লজ্জাকর বলিয়া মনে করে—তার কারণ, তদ্দারা তাহার মূল্যজ্ঞান তিরোহিত হয়, এবং বিচার-বুদ্ধি অপদস্থ হইয়া থাকে। এই দুই কারণ ছাড়া আর কোন কারণেই সে কোনপ্রকার সুখভোগ লজ্জাবোধ করিবে না। যাহারা বর্ব্বর তাহারাই এমন ব্যক্তিকে নির্লজ্জ বলিয়া অভিহিত করে।

আথেনীয়গণ যে সকল প্রমোদে অভ্যস্ত ছিল তাহাতে তাহারা কখনও লজ্জাবোধ করিত না। গ্রীক দর্শনও এইরূপ আমোদ-প্রমোদকে সুস্থ-জীবনের অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিয়াছে। হিব্রু ও গ্রীক—এই দুই আচার-নীতির মধ্যে যে বিষম পার্থক্য লক্ষিত হয় তাহা কোন শিক্ষকের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না; তখন ঐ শিক্ষক তাঁহার ছাত্রগণকে বলিতে বাধ্য হন যে, আর সকলের উপরেও যেমন, আমোদ-প্রমোদের উপরেও তেমনি, আথেনীয়গণ বিচার-বুদ্ধিকে স্থাপন করিয়াছে; এই বিচার-বুদ্ধিই সকল বিষয়ে একটি সৌষম্য বা সুপরিমিতি রক্ষা করে।

যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি সমাজ আমাদের চক্ষে এত বরণীয়, তাহাও এই গ্রীক-আদর্শের অতি নিকটে পৌঁছিয়াছিল। ঐ সমাজের গুণাবলীর মধ্যে সব চেয়ে বড় গুণ ছিল যে, উহারা ছিল অতিমাত্রায় বিচারশীল; সেই বিচারশীলতাও আবার অসাধারণ মূল্যজ্ঞানের দ্বারা রসান্বিত হইয়াছিল। আমার মনে হয়, যে-মাত্রায় ঐ দুইটি গুণ মিশ্রিত হইয়াছিল তাহাই অত্যুৎকৃষ্ট সভ্যতার নিদান। যে-যুগে ভল্‌টেয়ার, গিবন, হিউম এবং স্বাধীন-চিন্তার উপাসক দুইজন পোপ

জন্মিয়াছেন, সে-যুগের উদারপন্থী জ্ঞানিগণ তাঁহাদের চিন্তার সততা রক্ষা করিতে যেমন কোন বাধা পান নাই, তেমনই যাহারা নাস্তিক তাহারাও সমান স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। একই কালে এইরূপ বিপরীতের সম্মেলন এক্ষণে চিন্তা করিতেও ভাল লাগে, কারণ, এ যুগের এমনই দুর্ভাগ্য যে, একদিকে যে সকল বিপ্লবীদের আস্ফালন বাড়িয়াছে তাহাদের না আছে রসবোধ, না আছে সৌজন্য, এবং অপর দিকে যে সকল প্রাচীনপন্থী উৎপাত করিতেছে তাহাদের না আছে সৌজন্য, না আছে রসবোধ।

* * * *

যেহেতু, সকল পণ্ডিতই—যাঁহাদের মত শ্রদ্ধার যোগ্য—বলিয়া থাকেন যে, খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে আথেনীয় সমাজ সভ্যতার যে শীর্ষস্থানে আরোহণ করিয়াছিল, তেমন আর কুত্রাপি লক্ষিত হয় না, অতএব এই অধ্যায় শেষ করিবার পূর্ব্বে ঐ সমাজের একটি সর্ব্বোত্তম চিত্র উদাহৃত করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। প্লেটো-রচিত "সিম্পোজিয়াম" নামক গ্রন্থই নাকি কবি, শিল্পী ও পণ্ডিত এবং সর্ব্বশ্রেণীর রসিক-সমাজের মতে, এমন একটি রচনা—যাহার মত মনোমুগ্ধকর ও হৃদয়স্পর্শী লেখনী-কর্ম্ম এ পর্য্যন্ত মানব-প্রতিভার অসাধ্য হইয়া আছে। উহাতে এক পরম-রমণীয় জীবন-চর্য্যার একটি পরম-রমণীয় আলেখ্য চিত্রিত হইয়াছে। এই চিত্তহারী কথোপকথন-সন্দর্ভে আমরা যে-সভ্যতার একটি আভাস—হয়তো বা তাহারও অধিক কিছু পাই, তাহা আমাদের স্বপ্নগত হইয়াই আছে; তেমনটি ঐ একটি যুগেই সম্ভব হইয়াছিল। এ চিত্র কোন যোগী ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কল্পনা করেন নাই; ইহাতে যে কাহিনী আছে তাহা সত্যকার দেহধারী মানুষেরই জীবন-কাহিনী—সে জীবন যে-কোন মনুষ্য-সমাজ পুনরায় যাপন করিতে পারে।

এখানে আমি এই গ্রন্থের কেবল সেইটুকু উল্লেখ করিব যাহা আমার এই আলোচনার বিষয়টিকে উজ্জ্বলতর করিতে পারে। ইহার অন্তর্গত বক্তৃতা-গুলিতে সত্য-বলিবার যে আন্তরিক আগ্রহ ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং প্রত্যেক বক্তা তাঁহার নিজস্ব মূল্যজ্ঞানের বশে বক্তব্যটির প্রকাশ-সুষমার দিকে যে দৃষ্টি রাখিয়াছেন —আমি বিশেষ করিয়া তাহার কথাই বলিব। এমন কি, সোক্রাতেসও তর্কে জয়লাভ করিবার জন্যই তর্ক করিতেছেন না; ইহাদের মধ্যে একজনও, আবশ্যক হইলে, নিজ-যুক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকারে কুণ্ঠিত নহেন। একটা কথা আমিও

কুঠার সহিত স্বীকার করি—এই সকল বক্তৃতায় রসিকতার মাত্রা কিছু বেশী হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু ইহাও আমরা ইতিপূর্ব্বে মানিয়া লইয়াছি যে, যে-কোন বিষয়ে যথেচ্ছ আলাপ ও হাস্য-পরিহাস করিবার বাসনা সভ্য-মানুষের একটা চরিত্র-লক্ষণ। আমার মনে হয়, অতিশয় সুকুমার-চিত্ত ও সযত্ন-লালিত প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যেও এমন কেহ নাই যে, এই গ্রন্থের প্রেম-বিষয়ক আলোচনাটিকে কিছুমাত্র দোষাবহ মনে করিবে; যথা:— (—শেলী-কৃত অনুবাদ)

"যে সকল নর-নারী তাহাদের অর্দ্ধাঙ্গগুলিকে ফিরিয়া পাইয়াছে (অর্থাৎ যাহারা ভিন্ন-দেহে একই আত্মার অপরার্দ্ধকে খুঁজিয়া পাইয়াছে) তাহারা সারাজীবন তাহাদের সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া পরস্পরের পরিচর্য্যা করে কেবল একটিমাত্র উদ্দেশ্যে—তাহারা একে অপরের মধ্যে সেই কি-এক অজানা বস্তুর অন্বেষণ করে; সে এক চির অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাহা বুঝাইতেও পারে না। এই যুগল-প্রেমের প্রেমিকেরা কেবল ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসায় ঐরূপ গভীর প্রেম অনুভব করে না; একে অপরের নিকট হইতে এমন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যাহা যাচ্ঞা করে, তাহা ভাষার অতীত; যাহা তাহার আভাসমাত্র তাহাদের হৃদয়ে বিরাজ করে—সেই অস্পষ্ট বাসনার পথরেখা একরূপ অন্ধকারেই তাহারা চিনিয়া লয়।"

যে-অপূর্ব্ব বন্ধু-সমাগম-সভায়, রুচি, রসমান ও সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধির এই অবারিত প্রবাহ মুক্ত হইতে দেখি—যাহার ঐ বর্ণনা গত তেইশ শত বৎসর ধরিয়া মানুষকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে, তাহা যে-ভাবে সমাপ্ত হইয়াছিল, তাহাকে লণ্ডন-শহরের পুলিশ-আদালতের কোন ম্যাজিষ্ট্রেট নাম দিবেন "মাতালের উন্মত্ত আমোদ"। ঐ নিমন্ত্রণ সভা হইতে দুই ব্যক্তি একরূপ টলিতে টলিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল; একজন যেখানে বসিয়াছিল, সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িল; শীতের রাত্রি, অতএব অনেকক্ষণ নিদ্রার পর প্রভাত হইল। তখনও অনেকেই নিদ্রামগ্ন; কেবল সোক্রাতেস এবং আরও দুইজন তখনও জাগিয়া আছেন, তখনও তাঁহারা মাঝে মাঝে পান-পাত্রে চুমুক দিতেছেন, এবং গল্প করিতেছেন। সোক্রাতেস তখনও তাহাদিগকে একটা কথা স্বীকার না করাইয়া ছাড়িবেন না যে, কমেডি ও ট্রাজেডি আসলে একই বস্তু। আরিস্তোফানেস প্রথমে ঢুলিতে আরম্ভ করিলেন, পরে আর নিদ্রা নিবারণ করিতে পারিলেন না; অপর ব্যক্তি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। তখন পূর্ণ দিবালোক প্রকাশ পাইয়াছে। উভয়ের বহির্ব্বাসে উভয়ের অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া সোক্রাতেস অতঃপর পদব্রজে লাইসিয়মে (Lyceum) গমন করিলেন; সেখানে অভ্যাসমত স্নান করিয়া সারাদিন লেখাপড়া করিলেন; শেষে সন্ধ্যার সময়ে গৃহে গিয়া নিজ শয্যায় শয়ন করিলেন।

সভ্যতা ও তাহার বিস্তার

আমি এখনও সভ্যতার একটা সংজ্ঞা নির্ম্মাণ করি নাই, বোধ হয়, তাহা আর আবশ্যক হইবে না। আমার মনে হয় যাঁহারা এ পর্য্যন্ত আমার এই প্রবন্ধ সৌজন্যবশতঃ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, আমি সভ্যতা বলিতে কি বুঝি। সভ্যতা সমাজ জীবনেরই একটা গুণ। খুব স্থূল অর্থে ইহা সেই বস্তু যাহার দ্বারা আমরা উন্নত ও অনুন্নত সমাজের মধ্যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করি। অসভ্য সমাজের মানুষও যখন তাহার সহজাত প্রবৃত্তিগুলার উপরে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে, যখনই তাহারা অতি সামান্য মূল্যজ্ঞানেরও অধিকারী হয়—অর্থাৎ কোন্‌টা মুখ্য এবং কোন্‌টা গৌণ, কোন্‌টা শ্রেয়োলাভের সাক্ষাৎ উপায়, কোন্‌টায় বা তাহার তুলনায় দূরতর—এইরূপ বোধ করিতে সমর্থ হয়, তখনই তাহারা সভ্যতার প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়াছে, বুঝিতে হইবে। সভ্যতার পথে যে প্রথম পদক্ষেপ তাহা ঐ—বিচারবুদ্ধির দ্বারা অন্ধ সংস্কারের ভ্রমসংশোধন; দ্বিতীয় পদক্ষেপ—অপ্রত্যক্ষ এবং সূক্ষ্ম ভোগসুখের জন্য প্রত্যক্ষ ও সুলভ ভোগ্যবস্তুকে প্রত্যাখ্যান। অসভ্য মানুষ যখন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া একটা খরগোস শিকার করে, তখনই সে তাহা কাঁচা খাইয়া ফেলে; কিন্তু যেদিন সে তাহা না করিয়া খরগোসটাকে ঘরে লইয়া যায়, এবং তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তবে ভক্ষণ করে, সেইদিন সে প্রথম আথেন্সের পথে পা বাড়াইয়াছে, সভ্যতার পথে যাত্রা সুরু করিয়াছে। আবার, ঠিক সেই কারণে তাহাকে ক্রম-ক্ষীণজীবীদের প্রথম বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ সেইদিন হইতে তাহার সুস্থ জীবশক্তি হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এই তত্ত্বটি প্রণিধানযোগ্য। সভ্যতা জিনিষটা কৃত্রিম, উহা প্রকৃতি বিরোধী। যাহাকে আমরা উন্নতি বা উপচয় বলি, তাহাই আর এক অর্থে, অবনতি বা অপচয়ও বটে। যাহারা মানুষের জ্ঞান বা অনুভবশক্তির উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে, এমন কি, যাহারা শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহাদিগকে, ঐ সকলের ফলভোগী কৃতজ্ঞ সমাজ দুইহাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছে বটে যাহারা, বুদ্ধিহীনতা, বৃদ্ধত্ব অথবা ঈর্ষার কারণে, সে সকল ভোগ করিতে অক্ষম, তাহারা ঐ সকল নব্যতন্ত্রের নেতা অভিনব সুখভোগের সন্ধানদাতা মনীষীদিগকে ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া অভিশাপ দিয়াছে। এই দুইয়ের অর্থ যেমন হউক, তাহা লইয়া বিবাদ করিবার প্রয়োজন নাই; অন্ততঃ

এইটুকু স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক যে, খাইবার পূর্ব্বে কাঁচা মাংস রন্ধন করিবার প্রবৃত্তিটার দুই অর্থই হইতে পারে, উহা সভ্যতার প্রথম সোপান হইতে পারে, অথবা, সেই চার-হাত পায়ে চলা আদি অকৃত্রিম অবস্থা হইতে দুই-পায়ে-চলার কৃত্রিম অবস্থায় মানব-জাতির অধঃপতনও হইতে পারে।

সভ্যতার যে দুইটি প্রধান প্রাথমিক লক্ষণ—সেই বিচারশীলতা ও মূল্যজ্ঞান হইতেই বহু অপর গুণের উদ্ভব হইয়া থাকে, যথা;—সত্য-সুন্দরের পূজা; তিতিক্ষা বা পরমত সহিষ্ণুতা; ভাল-মন্দ-বোধের সূক্ষ্মতা; রসিকতা; শিষ্টাচার; অনুসন্ধিৎসা; অভব্যতা, নিষ্ঠুরতা ও আতিশয্য এই তিনের প্রতি বিতৃষ্ণা; কুসংস্কার ও শুচিতাপর্ব্ব হইতে অব্যাহতি; জীবনের যত কিছু উত্তম ভোগ্য বস্তুর প্রতি বিরাগহীনতা; পূর্ণ আত্মস্ফূর্ত্তি ও স্বাধীন-শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষা; বাস্তব লাভক্ষতির চিন্তা সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন; নীচাশয়তার প্রতি আন্তরিক ঘৃণা; অর্থাৎ,যে গুণগুলি দুইটি মাত্র কথায় সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা যায়—হৃদয়ের সরসতা ও মনের উজ্জ্বলতা।

কিন্তু সমাজ বলিতে যে একটা অতিশয় অনির্দ্দেশ্য চরিত্রের জনসংহতিকে বুঝায়, তাহার কি সত্যই এইরূপ সূক্ষ্ম গুণাবলী থাকিতে পারে? পারে, কিন্তু খুব সুস্পষ্ট অর্থে নয় বিভিন্ন কালের বিভিন্ন মানবসমাজের অল্লাধিক স্থায়ী কতকগুলা বাহ্য প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের জবানীতে তাহাদের ভিতরকার পরিচয় প্রকাশ করিয়া থাকে; নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকের চক্ষে এই বাহিরের জিনিষ-গুলাই সেই সমাজের সভ্যতার নিঃসংশয় নিদর্শন বলিয়া গণ্য হয়। তাহাদের আচার-প্রথা, জীবনযাত্রার নানা উপকরণ, রীতি-নীতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে নানারূপ শ্রেণীবিন্যাস, এবং সর্ব্বোপরি, যে ধরণের বিজ্ঞান ও শিল্পকলার আদর তাহারা করিয়াছিল, এবং যাহার উন্নতিসাধনে মনোযোগী হইয়াছিল—সেই সকলই একটা বিশিষ্ট সভ্যতার পরিচয় বহন করে। আবার, যে সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞান শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ না করিলেও, তাহার সৃষ্টি সেই সমাজের হইয়াছিল, তাহাতেও সেই সভ্যতার আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে সে কালের সে সমাজের মনোভাব কিরূপ ছিল, এই উভয়জাতীয় নিদর্শন হইতে তাহার একটা সঙ্কেত মাত্র পাওয়া যায়, তাহাও অভ্রান্ত নহে। তথাপি, ঐ সকল মিলাইয়া যে একটি বিশিষ্ট ধরণের সামাজিক মানব-জীবনের পরিচয় গড়িয়া লওয়া যায় তাহারই নাম—সভ্যতা; অর্থাৎ সমাজ-বদ্ধ জীবনের

কতকগুলি আচারে-ব্যবহারে, একটা বিশেষ মনোভঙ্গির ফলে যে রংটি ফুটিয়া উঠে, তাহাই সভ্যতা। এই বিশেষ রং বা বিশেষ রস সঞ্চারিত হয় কোথা হইতে? ব্যক্তিবিশেষ হইতেই যে ইহার উৎপত্তি তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু মাত্র একটি ব্যক্তির চিত্তোৎকর্ষ ইহার হেতু হইতে পারে না—সে ত' সমুদ্রে এক ফোঁটা মিষ্টরসের মত। একজন মানুষের দ্বারা একটা সভ্যতার সৃষ্টি হইতে পারে না। গত তিন হাজার বৎসরের কোন সময়েই পৃথিবীতে সভ্যমানুষ একেবারে বিরল ছিল না নিশ্চয়। অতিশয় আদিম বর্ব্বর-যুগের কথা ছাড়িয়া দিলে, পরবর্ত্তী যুগগুলিতে—সে যুগ যতই অন্ধকার অজ্ঞানের যুগ হউক না কেন—অন্ততঃ একজন বা দুইজন সভ্যমানুষ পৃথিবীতে অবশ্যই ছিল। তাহাতে সভ্যতার সৃষ্টি হয় নাই। কেবল, যে-কালে এমন সংখ্যক সভ্যমানুষ একত্র হইতে পারিয়াছিল, যাহাতে একটা ক্ষুদ্র কেন্দ্রমণ্ডল রচনা করিয়া তাহারা তাহাদের অন্তরের সরসতা বিস্তার করিতে এবং মনের আলোক বিকিরণ করিতে পারে—তখনই সভ্যতা-সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল। ঐ কেন্দ্রমণ্ডলটি, সংখ্যায় ও শক্তিতে উপযুক্ত হইতে না পারিলে, জনগণের মন নিজেদের মনের রঙে অনুরঞ্জিত করিতে সক্ষম হয় না; এইরূপ এক একটি মণ্ডলীবদ্ধ সভ্য নর-নারীই সভ্যতার উৎস ও তাহার প্রবাহক।

সভ্যতার উৎপত্তি ও তাহার কারণ দুইয়েরই সন্ধান করিতে হইবে মানুষের মনোজীবনে। ধর্ম্মনীতি, ব্যবহার-বিজ্ঞান, প্রথা ও প্রতিষ্ঠান, অথবা বুদ্ধিপ্রসূত নানা কল-কৌশল—কোনটাই সভ্যতার হেতু নহে। এগুলাও কারণ নয়—কার্য্য, নিজেরাই আর কিছু দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। সভ্যতার যে মূর্ত্তিটি ধ্যানে ও জ্ঞানে গড়িয়া উঠে, তাহা ব্যক্তি-মানসের সৃষ্টি। এইবার এতক্ষণে আমরা একটা ধরিবার মত কিছু পাইলাম। একটা চিন্তাগত আকারহীন অনির্দ্দেশ্য নামের পরিবর্ত্তে একটা ব্যক্তিকে পাইতেছি—সভ্যতার স্থলে সভ্য-ব্যক্তি এইরূপ ব্যক্তির—নর বা নারীর—জীবনে স্বকর্তৃত্ব থাকিবে, অর্থাৎ সে যাহা কিছু করিবে তাহা বাধ্যতামূলক নয়—আপন অভিরুচি অনুসারে; অর্থাৎ, সে বাহিরের দাস নহে, আপনাকে আপনিই শাসন করে। সে যখন একটা খরগোস শিকার করে, তখন সংযম সহকারে স্থির করিতে পারে, কোথায় এবং কখন সে তাহা ভক্ষণ করিবে। সভ্য মানুষের আচার স্বাভাবিক নয়—কৃত্রিম; সে ব্যক্তি দন্তধাবন করে, বাক্যে শিষ্টতা রক্ষা করে, কোন দুর্ব্বল

ব্যক্তির উপরে ক্রোধ হইলে তাহাকে প্রহার করিতে নিরস্ত হয় তাই বলিয়া কেহ এমন মনে করিবেন না যে, সভ্যমানুষকে আমি আদর্শ সাধুপুরুষ বলিয়া চালাইবার মতলবে আছি। 'ভালো' বলিতে যদি কিছু বুঝায়, তবে সেই ব্যক্তিই সর্ব্বোত্তম যিনি শ্রেষ্ঠ মানসিক সুখভোগে সমর্থ, এবং যিনি মনের সেই অবস্থা সমান ভাবে দীর্ঘকাল রক্ষা করিতে পারেন। সেরূপ মহাত্মার সন্ধান করিতে হইলে, যাহারা ভাবুক, শিল্পী অথবা যোগী, তাহাদের মধ্যেই মিলিতে পারে, কারণ, তাঁহারাই সুদীর্ঘকাল ধ্যানে বা রসাবেশে মগ্ন থাকিতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ উৎকৃষ্ট ভোগ্যবস্তুর এই গুণটি নাই, তাহারা অল্পকালেই বিস্বাদ হইয়া যায়। মনের যে অবস্থাটি অতিশয় সুখকর তাহাও দীর্ঘস্থায়ী হয় না, তাহারও ঐ দোষ আছে। কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট যাহা তাহার হ্রাসবৃদ্ধি জোয়ার-ভাঁটা থাকিতে পারে না; তাহাতে কোনরূপ তর-তম নাই। সেই সুখ-স্বর্গের দিবা সর্ব্বদাই মধ্যাহ্ন-আলোকে সমুজ্জ্বল, সে আলোকে এতটুকু ছায়া নাই। অথচ, যে-মানুষ সন্ধ্যার সুকোমল ছায়ালোক, অথবা তারাখচিত রাত্রির আকাশ পছন্দ করে, এমন কি, তাহার গৃহ-কোণের অগ্নিকুণ্ড আরও উজ্জ্বল দেখাইবে বলিয়া বাহিরে বৃষ্টি বা তুষারপাতও যাহার ভাল লাগে, সেও উচ্চদরের একজন সভ্য মানুষ হইতে পারে। যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহার দুই প্রধান লক্ষণ আছে—তাহা সর্ব্বদাই একরূপ, এবং ধ্রুব। স্বর্গের সেই অক্ষয় অবিমিশ্র সুখভোগে কোন সভ্যতম মানুষও যে অস্বস্তি বোধ করিবে না, এমন মনে হয় না।

তথাপি, শিল্পী, দার্শনিক বা যোগী হইলে মানুষ যে সভ্য হইতে পারে না, এমন কথাও বলিতেছি না। আমি কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, যাহারা সভ্যতার আদর্শ-স্থল তাহারা কখনো কোন একটা কিছুকেই জীবনের সর্ব্বস্ব করিয়া তোলে না। এমন যে প্লেটো, তিনিও যখন তাঁহার 'রিপাব্লিক' নামক গ্রন্থে ঐ একটা আদর্শকে অদ্বিতীয় করিয়া তুলিয়াছেন, তখনই তাঁহার বিচারবুদ্ধি বিদায় লইয়াছে। যে-ব্যক্তি পূর্ণ সভ্যতালাভ করিয়াছে তাহার রসবোধ এমনই সর্ব্বতোমুখী যে সে কোন অতি উচ্চ ভাবের আবেশে, ঘন ঘন বা অনেকক্ষণ, মগ্ন হইয়া আর সকল জ্ঞান হারাইয়া বসে না; ঐরূপ ক্ষণিকের ভাবোন্মাদনাকে সে সর্ব্বক্ষণ ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছা করে না। সর্ব্ববস্তুর রস সমভাবে আস্বাদন করাই তাহার কাম্য। ইহাতে তাহার অনুভূতির প্রসার হয়,—তাহাতে অত বৈচিত্র্য থাকে ততটা গভীরতা থাকে না। যাহারা জ্ঞানপন্থী দার্শনিক তাহারা, কেবল

ঐ গভীরতারই পক্ষপাতী। এমন ব্যক্তি যদি শিল্পী হয়, তবে আমার বিশ্বাস, মনের যে অংশে আত্মপ্রচারের ঝোঁকটা প্রবল নয়, সেই অংশই সভ্য, কারণ, আত্মপ্রচারের অতিরিক্ত আগ্রহ আত্মম্ভরিতায় পরিণত হইতে বেশিক্ষণ লাগে না। মোটের উপর, সর্ব্বপ্রকার রসে সমান অভিরুচি সভ্যতার একটি বিশেষ লক্ষণ। তথাপি, সত্য ও সুন্দরের প্রতি আসক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের পিপাসা, মানুষের আত্মার যতকিছু গৌরবময় প্রকাশ, তাহার প্রতি এইরূপ স্বাভাবিক আকর্ষণ—একটা বড় গুণ হইলেও, জীবনে আরও কত সাধনযোগ্য কর্ম্ম আছে, ইহা প্রকৃত সভ্যব্যক্তি যেমন উপলব্ধি করে—কোন শিল্পী, ভাবুক বা পণ্ডিত তেমন করে না।

যাহার চিত্তে সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে তেমন মানুষ জীবনে শিক্ষাকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দিবে, কারণ শিক্ষার দ্বারাই সর্ব্ববিধ কামনার উন্মেষ হইয়া থাকে। যাহারা সুখান্বেষী এবং বুদ্ধিমান তাহাদের সুখভোগের উপায় দুইটি—শিক্ষিত মন, এবং সমর্থ ও প্রসন্ন ইন্দ্রিয়। যাহার ইন্দ্রিয়গুলি যথোচিত কর্ষিত হয় নাই, সেই অশিক্ষিত ব্যক্তি কোন ভাব বা চিন্তার অন্তর্লীন সুরমাধুরী অনুভব করিতে পারে না, মনে যখন যাহা উদয় হয় সেটিকে লীলার মত করিয়া উপভোগ করিতে পারে না—প্রত্যেক প্রশ্নকে, নিরাসক্ত রসিকের মত, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহার সকল দিক দেখিয়া লইতে পারে না; সে, একই কালে, নিজেকে সর্ব্বযুগের সকল সম্পদের অধিকারীও যেমন, তেমনই, জগৎ-রঙ্গমঞ্চে দুইদণ্ডের অভিনেতা মনে করিয়া, একটি অপূর্ব্ব রস আস্বাদন করিতে পারে না। এইরূপ উচ্চস্তরের রস-সম্ভোগ একমাত্র শিক্ষার গুণেই সম্ভব। যে সকল বৈষয়িক বিদ্যাকে শিক্ষা-নাম দেওয়া হয়, আমার এই আলোচনার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। মানি, তাহারও প্রয়োজন আছে, তেমন বিদ্যা সুখসাধনের একটি গৌণ উপায় বটে, তাহাও সভ্যতালাভে সহায়তা করে; কিন্তু, সে উপায় প্রত্যক্ষ নয়—পরোক্ষ। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য—আমাদের প্রকৃতিতে যে সব উৎকৃষ্ট ও সূক্ষ্ম বৃত্তি সুপ্ত অবস্থায় আছে সেইগুলিকে উদ্বুদ্ধ করা। যদি বলা হয়, সেইরূপ শিক্ষাও কেবল জ্ঞান বৃদ্ধি করে, আর কিছুই করেনা, তাহা হইলে কথাটা সূক্ষ্ম-বিচার-সম্মত হইবে না। জ্ঞানই জীবনের পরমার্থ নয়, আমি পূর্ব্বে যে চিত্তোৎ-কর্ষ-জনিত সুখের কথা বলিয়াছি, জ্ঞান তাহার একটা উপায় মাত্র—জ্ঞানের নিজস্ব কোন মূল্য নাই। ঐ স্বাধীন, অর্থাৎ বিধিবন্ধনহীন, স্বভাব-উপযোগী যে শিক্ষা, উহার দ্বারা কাহারও বৈষয়িক সুবিধালাভ হইবেনা, অর্থাৎ, তাহা অর্থকরী-

বিদ্যা নয়,—জীবনকে উত্তমরূপে জানা, এবং পরিপূর্ণরূপে ভোগ করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

এত কাল পরে, সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত, তাহার আর একটি গুণ হওয়া উচিৎ—কোন-কিছু দ্বারা বিচলিত বা বিক্ষিপ্ত না-হওয়া। মূর্খতা এমন একটি বস্তু যাহা দূর করিতে দেবতারাও হার মানেন। ভয়ানক-বোধে কিছুতে বিচলিত হয় যাহারা, তাহাদের বিচারবুদ্ধি পরাস্ত হইয়াছে। যাহা অপরিচিত বা অনভ্যস্ত বলিয়া অপ্রীতিকর, সেইরূপ আচার, প্রথা, রুচি বা প্রবৃত্তি, কিম্বা দৈহিক বা মানসিক কোন অতিচারদর্শনে যাহারা তাহার কারণ সন্ধান না করিয়া, বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া, কেবল "উঃ কি ভয়ানক! কি জঘন্য!" বলিয়া চীৎকার করে ও ছুটিতে থাকে, তাহারা মনস্তত্ব বা নীতিশাস্ত্রের কিছুই জানে না। ধীরভাবে, পূর্ণ দৃষ্টিতে সেই সকল অদ্ভুত আচার-ব্যবহার দেখিয়া লইতেও তাহারা অক্ষম; তার কারণ, তাহাদের স্নায়ুগুলা সুস্থ নহে, অথবা জন্মগত কুসংস্কার তাহাদিগকে অন্ধ করিয়াছে; মনের সেই ব্যাধিগুলাকেই বড় বড নাম দিয়া তাহারা গর্ব্ব অনুভব করে, যথা—'ধর্ম্মসঙ্গত রোষ' 'ভদ্রতাজ্ঞান' প্রভৃতি। তাহারা সাপকে স্পর্শ করিতে পারে না, সর্ব্বশরীর কুঞ্চিত হইয়া উঠে, তাহাই হওয়া স্বাভাবিক, তাহাতে সাপের কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া, তাহারা যেন সেই স্নায়ুঘটিত দুর্ব্বলতার গর্ব্ব না করে—যাহারা সাপ লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করে, সর্পবিষয়ে যাহারা গবেষণা করিতেছে, তাহাদিগকে যেন অশ্রদ্ধা না করে। তাহাদের ঐ অবস্থাকেই 'বিহ্বল' বা 'বিপর্য্যস্ত'-অবস্থা বলা হয়—কথাটা ঠিক বটে; কারণ, সে সময়ে তাহাদের বুদ্ধিভ্রংশ হয়—বিচারশক্তি বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে।

পূর্ণ সভ্যতার আর এক লক্ষণ—তাহাতে সুরুচি বা শুচিতার গর্ব্ব নাই। কারণ, যাহারা সভ্যপদবাচ্য তাহাদের চিত্তে আত্মস্ফূর্ত্তির যে দুইটি প্রধান বাধা—সেই ক্রোধ ও কুসংস্কার নাই। সভ্য মানুষ অতিশয় সহিষ্ণু ও উদারচিত্ত হইয়া থাকে। সে বুঝিয়া লইয়াছে যে, ক্রোধের হেতু যাহাই হোক, তাহার মানসিক চিকিৎসা আছে।

সভ্যমানুষের রাজনৈতিক মতামত কেমন হইবে তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। তথাপি একথা নিশ্চিত যে, তাহার দাবীও যেমন সুস্পষ্ট, তাহার মতামতও তেমনই সেই দাবীর অনুযায়ী এবং যুক্তিসঙ্গত হইবে। সেই অভিযোগ অতিশয় সুস্পষ্ট ও আন্তরিক বলিয়া, সে পেশাদার পোলিটিশ্যনদিগের মত বড় বড়

বাঁধাবুলি লইয়া মাতামাতি করে না, যথা—স্বাধীনতা, ন্যায়ধর্ম্ম, ভ্রাতৃত্ব, সমানাধিকার, জন্মগত স্বত্ব, ইত্যাদি। এই সকল অতি-মহার্ঘ্য বচনের যে-কোন অর্থ হইতে পারে —অথবা কোন অর্থ ই না থাকিতে পারে। যদি বল, তুমি 'ট্রেড-ইউনিয়ন-বিল'-এর পক্ষে—কারণ, উহা ন্যায়সঙ্গত; অথবা তুমি উহার বিপক্ষে—কারণ, উহা ন্যায়-সঙ্গত নয়, তবে তোমার উভয় উক্তিই সমান জ্ঞানশূন্য। যদি তুমি এই কারণে উহার সমর্থন না কর যে, উহার ফলে, শেষে তোমার পারিশ্রমিক উপার্জ্জন হ্রাস পাইবে, তবে তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত হইবে। কিন্তু তুমি যদি কেবল এই জন্য উহার স্বপক্ষে ভোট দাও যে, উহা ন্যায়সঙ্গত, কিম্বা এই বলিয়া উহার বিরুদ্ধে ভোট দাও যে, উহা ন্যায়সঙ্গত নয় তবে দুইটার কোনটাই ঠিক নহে, কারণ, কোনটারই অর্থ নাই। অবশ্য এমন হইতে পারে যে, তোমার ও আমার উভয়েরই লক্ষ্য এক, কিন্তু কোন একটি বিশেষ আইনের দ্বারা সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে কি না, সে বিষয়ে মতভেদ আছে; সেখানে যুক্তির দ্বারা পরস্পরের মত বিচার করিয়া দেখিবার অবকাশও আছে। আবার, যেখানে উভয়ের প্রার্থিত বস্তু এক নহে, কিন্তু উভয়ের পক্ষেই যুক্তি আছে, সেখানেও কটূক্তি করার কারণ নাই। এমন হইতে পারে যে, উদ্দেশ্য এক হইলেও, কোন এক পক্ষ এমন উপায় অবলম্বন করিতেছে, যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হওয়াই সুনিশ্চিত; তখনও তাহাদিগকে দুর্জ্জন না বলিয়া নির্ব্বোধ বলাই সঙ্গত। কেবল একটা অবস্থায় রাজনৈতিক মতভেদ ধর্ম্মনীতির দিক দিয়াও নিন্দনীয় হইতে পারে—যখন আমরা ইষ্টনির্ণয়ে একমত হইতে পারি নাই; কিন্তু সেই ইষ্টও সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করিবে না, এবং আর কোন রাজনৈতিক পন্থায় সেই ইষ্টলাভ যে সহজসাধ্য নয়, সে বিষয়েও যদি সকলে একমত হয়। কিন্তু ইহাও স্বীকার্য্য নয়; কারণ, আর সকলে যে আমার সহিত একমত হইবে, এমন আশা করাও অন্যায়। অতএব, যে ব্যক্তি পূর্ণসভ্যতা লাভ করিয়াছে, সে যদিও সকল রাজনৈতিক সমস্যার সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করিবে, তথাপি ঐরূপ অর্থহীন বড় বড় কথার মোহ ত্যাগ করিবে, বৃথা বিবাদ-বিসম্বাদও করিবেনা। এই যে তিতিক্ষা এবং বাদ-বিসম্বাদে যোগ দিতে অনিচ্ছা, ইহার সহিত আরও একটা বড় গুণ সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ—তাহার নাম, শিষ্টাচার। মানুষের সকল দোষ-ত্রুটি পাপ-অপরাধ ক্ষমা করিতে পারাই যদি পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে ঐরূপ ক্ষমা করিতে করিতেই পূর্ণজ্ঞানে পৌছিতে পারা যাইবে। মানুষমাত্রেরই অপরের

নিকটে যে ভয়-দ্বিধা-বোধ হয়—সৌজন্য ও শিষ্টাচারের দ্বারা তাহা যদি দূর করিতে পারো, তবেই তুমি তাহার অন্তরে প্রবেশ করিবার পথটি খুঁজিয়া পাইবে, সে তখন তাহার ভিতরকার খাঁটি বস্তুটি তোমার সম্মুখে খুলিয়া ধরিবে। আর, তুমি যদি সেই শিষ্টাচরণ না কর, যে শিষ্টাচারের দ্বারা তোমার ও অপরের মধ্যে ব্যবধানটা ভূমিস্যাৎ হইয়া যায়, এবং তৎপরিবর্ত্তে অকারণ সন্দেহ, কোপনতা, তার্কিক মনোভাব, এবং অহমিকার দেওয়াল তুলিয়া দাও, তবে তুমিও তাহাকে যাহা দিতেছ, সেও তাহার অধিক কিছুই তোমাকে দিবে না। যাহারা অভদ্র ও প্রভুভাবাপন্ন, তাহাদিগের নিকটে কেহই অন্তরদ্বার উদ্ঘাটন করে না। অতএব স্বীকার করি যে, কেবলমাত্র চরিত্রবল ও মনীষার দ্বারা যাহা লাভ করা যায় তাহা অতিশয় মূল্যবান হইলেও, সৌজন্য ও সদ্ব্যবহারের দ্বারা যাহা লাভ করা যায়, তাহা আরও গভীর আরও মূল্যবান।

সভ্যপদবাচ্য হইতে হইলে, ভাল বস্তুর সমজদার হইবার মত রুচি ও রসবোধ থাকা চাই; যাহার পছন্দ-শক্তি নাই, সে সভ্য নয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখি যে, তেমন ব্যক্তি নিজে কিছু রচনা বা সৃষ্টি করিতে নাও পারে। সৃষ্টি করিবার, অর্থাৎ কিছু গড়িবার, বা কোন শিল্পকীর্ত্তি স্থাপন করিবার যে প্রেরণা, তাহার দ্বারা সভ্যতা ও বর্ব্বরতার ভেদ নির্দ্দেশ করা যায় না; কেবল ভাল-মন্দ বিচার বা রস-গ্রহণের শক্তিই যথার্থ সভ্যতার লক্ষণ। যে পুরুষ বা যে নারীর পক্ষে সর্ব্ববিধ শিল্পকর্ম্মই সমান নীরস, সে সভ্য নহে।

সভ্য-জীবনের যে সকল সুখ—তাহা সূক্ষ্মচিন্তা ও অনুভূতি-সাপেক্ষ; তন্মধ্যে সৌন্দর্য্য উপভোগের যে সুখ তাহাই শ্রেষ্ঠ। সে-সুখ—স্নেহ, প্রীতি প্রভৃতি আত্মীয়তা-সুলভ হৃদয়াবেগের মত প্রবল বা তীব্র নয়; কিন্তু তাহা অধিকতর স্থায়ী। এই অপরবিধ সুখকে শ্রেষ্ঠ মনে করার মূলে আছে সেই মূল্যজ্ঞান। অবশ্য, ভাব-চিন্তার অনুশীলনই জীবনের একমাত্র কর্ম্ম হইতে পারে না; এমন কর্ম্ম আছে যাহা সেই শ্রেষ্ঠ সুখলাভের উপায় ত বটেই,—যাহার অনুমোদন, এমন কি আচরণও সভ্যব্যক্তির পক্ষে অসঙ্গত নয়। যদি জীবিকার জন্য পরিশ্রম করা আবশ্যক হয় তাহাও করিতে হইবে; সুখ ভোগ করিতে হইলে সংসারযাত্রা নির্ব্বিঘ্ন হওয়া আবশ্যক। কিন্তু জীবিকাসমস্যার সমাধান হইলে পর, বাহিরের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকাই সভ্যতার লক্ষণ। কোন কর্ম্মেরই নিজস্ব কোন পৃথক মূল্য নাই—সকল কর্ম্মই সেই উৎকৃষ্ট সুখভোগের উপায় মাত্র।

আমি স্বীকার করিয়াছি যে, সকল কর্ম্মই সভ্য-জীবনে শ্রেয়োলাভের উপায়-স্বরূপ হইতে পারে—বিশেষতঃ, পরের হিত-সাধন। কিন্তু যাহারা কর্ম্মবীর বলিয়া খ্যাতিলাভ করে, তাহারা কেবল ঐরূপ নিঃস্বার্থ প্রবৃত্তির বশেই সংসারে এত হুড়াহুড়ি করিয়া বেড়ায় না। নিজেদের ইচ্ছাটাকেই—একটা কোন আত্মগত আদর্শ বা বিশ্বাসকেই—আর সকলের উপরে চাপাইয়া দিবার জন্য, তাহারা ঐরূপ পরহিতব্রত গ্রহণ করে। উহারা নিজেরা কোন উচ্চাঙ্গের সৃষ্টিকর্ম্ম করিতে পারে না—নিজেদের মনোগত কোন ভাবকে শিল্পসৃষ্টির দ্বারা অভিব্যক্ত করিতে অপারগ; তাই অপরের জীবনধারাকে বাধাগ্রস্ত করিয়া, সেই অক্ষমতার আত্মাভিমান চরিতার্থ করে। প্রেম, বন্ধুত্ব, পরস্পর আলাপ-আলোচনার সুখ, সৌন্দর্য্য-ধ্যান বা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, অথবা নিজের চরকায় তেল দেওয়া—এ সকলের কোনটাতেই তাহারা তৃপ্তি পায় না; গুরু হওয়া চাই, প্রভুত্ব চাই, পরকে বশীভূত, বা নিজের মত-বিশ্বাসের অধীন করা চাই। ইহারাই এক একটা 'জাতি' গড়িয়া তোলে, ইহারাই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে; মনুষ্য-প্রকৃতির যে দিকটা সুস্থ, ও মঙ্গলকর, মানুষকে যেন তাহা হইতেই উদ্ধার করিয়া তাহার মহা উপকার সাধন করে। সভ্য মানুষের মত সুখভোগ-প্রবৃত্তি তাহাদের প্রকৃতি-সুলভ নয় বলিয়া, সে সামর্থ্য যাহাদের আছে, তাহাদিগকেও ইহারা সেই সুখভোগ করিতে দিবে না; তাহারা নিজেরা যাহা পছন্দ করে, আর সকলকেও তাহাই করিতে হইবে। একরূপ জোর করিয়া—তাহারা নিজেরা যাহা ভাবে ও বিশ্বাস করে, পরকেও তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য করে। যেহেতু জগতে মূর্খের সংখ্যাই অত্যধিক, সেইহেতু তাহারা আশ্চর্য্যরূপে সাফল্যলাভও করে। ফলে, সর্ব্ববিষয়ে একটা বাহ্যিক সমতা বা নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রতিষ্ঠা হয়।

এখন, আবার সভ্য মানুষের কথাই বলি। মানুষ সভ্য হইয়া জন্মায় না, তাহাকে সভ্য করিয়া তুলিতে হয়; সে মানুষ একরূপ কৃত্রিম মানুষ—স্বাভাবিক মানুষ নয়, অর্থাৎ, তাহার জন্মগত প্রকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন হয়; তেমন মানুষ স্বভাব-সরল না হইলেও, এক অর্থে তাহার প্রকৃতি আরও নিখুঁত। কথাটা স্ববিরোধী হইল; ইহা বুঝিয়া লইতে হইলে একটু কল্পনার সাহায্য লইতে হইবে—কল্পনায় দুইটি বস্তুর ধারণা করিতে হইবে। ইহার একটিকে ধরা যাক—জীবন বলিতে যাহা কিছু আমরা অনুভব করি তাহা যেন একটি প্রবাহ; অপরটি, যেন সেই প্রবাহের এক-একটি নল—যেমন আমরা; অর্থাৎ, এক-একটা

ব্যক্তির জীবন। বর্ব্বর অবস্থায় জীবন-প্রবাহের সেই নলগুলা নানা কুবিশ্বাস, ভয় ও দুঃস্বপ্নের আবর্জ্জনায় পূর্ণ থাকে; উহাই সেই নলের ভিতরকার অবিকৃত রূপ। কিন্তু মানুষ সভ্য হইলে তাহার সেই জীবন-নল, জন্মাবস্থার মত, অবিকৃত আর থাকে না—নিয়মিত শিক্ষা, বহু বিপদ-আপদ ও দুঃখ-দুর্গতির অভিজ্ঞতায়, সেই নলের গঠনটাও বিকৃত হইয়া—অথবা বাঁকিয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার ভিতরটা আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠে। শিক্ষা-সম্মার্জ্জনীর দ্বারাই যেন তাহার সেই আদি স্বভাবকে সে বহিষ্কার করিয়া দেয়, এবং সেইজন্য একরূপ কৃত্রিমতা লাভ করে। এইজন্যই, সে যেমন কোনরূপ দেহ-সুখকেই বর্জ্জন করিতে চাহিবে না—নৈতিক শুচিতা গ্রাহ্য করিবে না, তেমনই আবার, নীচ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির লালসাকে সে সংবরণ অথবা সংযত কবিবে। একজন অসভ্য মানুষ, যতক্ষণ পীড়িত হইয়া না পড়ে, ততক্ষণ পান-ভোজন বন্ধ করে না; কিন্তু কোন সভ্য মানুষ তজ্জন্য দৈহিক অসুস্থ সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে না, মনটা অসুস্থ হইবামাত্র তাহা ত্যাগ করিবে।

সভ্য মানুষ সম্বন্ধে আমার ধারণা এইরূপ। তেমন মানুষ সচ্চরিত্রও নয়, সরল-স্বভাব, প্রকৃতির সন্তানও নয়। সে শিল্পী নয়, বীর নয়, সাধু-সন্ন্যাসী নয়, তত্ত্বজ্ঞানীও নয়। কিন্তু সকল শিল্পকলার রস সে আস্বাদন করিতে পারে; সত্যের মর্য্যাদা বোঝে; এবং আচার-ব্যবহারে কোন ভুল সে করে না। জীবনটাকে উত্তমরূপে ভোগ করাই তাহার একমাত্র বাসনা। ঐ বাসনা সফল করিবার জন্য তাহার মন এবং তাহার হৃদয়বৃত্তি উত্তমরূপে কর্ষিত হইয়াছে। তাহার মনের পিপাসাও অপরীসীম, এইজন্যই তাহাতে কোন সঙ্কোচও নাই, স্বার্থ-চিন্তাও নাই। সে উদারচেতা, পরমতসহিষ্ণু; কোন কিছুতেই তাহার অকারণ ঘৃণা নাই। যেহেতু, কোন্‌টা মুখ্য, কোন্‌টা গৌণ—সে জ্ঞান তাহার আছে, এজন্য সে ভাবের দিক দিয়াই সকল বস্তুর মূল্য-বিচার করে, কাজের দিক দিয়া নহে। জনসাধারণ যে সকল বিষয়ে একমত সেই সকল বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা হয় না, কারণ, নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সে পূর্ণ-সচেতন। এইরূপে, ইন্দ্রিয়, হৃদয় ও মন—এই তিনেরই উৎকর্ষসাধন দ্বারা সে এমন একটি জীবনযাপন-নীতি স্থির করিয়া লয়, যাহাতে—যতদূর সম্ভব, কোন বিরুদ্ধ-সংস্কার, বা প্রবৃত্তির অসংযম স্থান পায় না। না. সভ্যমানুষ কিছুতেই প্রকৃতির নিয়ম পালন করিতে পারে না।

সভ্যতা-সৃষ্টির উপায়

দুইটি প্রশ্ন এখনও বাকি আছে আমরা কি সভ্যতা চাই? চাহিলেও তাহা কি লাভ করা সম্ভব?

সভ্যতা যে সকলেরই কাম্য তাহা মনে করিবার কারণ—প্রত্যেক সুরুচিসম্পন্ন নর-নারীর অন্তরে এমন কামনা গভীরভাবে বিদ্যমান আছে। অবশ্য এমন অতি চতুর অতিবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও আছে যাহারা সভ্যতাহীন জীবনের জয়গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতে চায়; আবার, এমন বুদ্ধিমান লোকেরও অভাব নাই যাহারা সভ্যতার আনুষঙ্গিক নানা ব্যাধি এবং অসভ্য-জীবনের নানা সুবিধার কথাও অবগত আছে। কিন্তু যাহারা আদিম অসভ্য জীবন যাপন করিবার জন্য অধীরতা প্রকাশ করিয়া একটা নূতন ভাবের বাহাদুরী দেখায়, তাহারা যেন আরও একটু বুদ্ধিমান হইয়া একটা কথা ভাবিয়া দেখে, তাহা এই যে, সত্যকার বিশ্বাস এক জিনিষ, আর একটা সৌখীন ভাব-বিলাস সম্পূর্ণ অন্য বস্তু—এ দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই প্রাণে প্রাণে জানে যে, বর্ব্বরদের জীবন সম্বন্ধে হব্‌স্ (Hobbes) যাহা বলিয়াছেন তাহা অতিশয় সত্য। তাহাদের সেই কুসংস্কারের নানা বিভীষিকা, এবং অতিশয় সঙ্কটসঙ্কুল, একঘেয়ে জীবন-যাত্রার কথা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

ঐ যে আমাদের হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন কামনা—সভ্যতার মত কাম্য আর কিছু নাই, এই যে বিশ্বাস—ইহা হইতেই আমরা নিশ্চিত অনুমান করিতে পারি যে, ঐ কামনা মিথ্যা নয়। কেন যে এই কামনা মানুষের হয় সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র, তাহার জবাব দেওয়াও আমার কর্ম্ম নয়। বর্ব্বর-জাতির মধ্যেও যখন ঐরূপ ভয়গ্রস্ত বিমূঢ় দুই-চারিজনের অন্তরে একটু আত্ম-চেতনা, বা ঐরূপ অবস্থায় পরিবর্ত্তন-চিন্তার উদয় হয়, তখন তাহার আর যাহাই হোক, সেও যে একটা ইচ্ছা, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই ইচ্ছা আর কিছু নয়—আমাদের প্রাণের সেই অতিনিন্দিত সুখভোগের ইচ্ছা। সভ্যতার মূলে অন্ততঃ সেই ইচ্ছাই আছে। মিঃ ম্যাক কুইডি বলেন, "বর্ব্বরেরা কখনও হাসে না।" মিঃ কুইডির কথা ঠিক নহে; আমি বলি, বর্ব্বরেরাও হাসে, তবে তাহা ঠিক হাসি নয়, একরূপ দন্তবিকাশ। একবার ভাবিয়া দেখ, কারণে ও অকারণে তাহারা কত রকমের

যন্ত্রণাই না ভোগ করেন। তাহাদের সেই ঘোরতর কুসংস্কার এবং দুর্ব্বার প্রবৃত্তিগুলাই ত' সকল সুখের হন্তারক, এবং সকল দুঃখেরও বৃদ্ধিকারক।

সভ্যতাই তাহাদিগকে সেই দুঃখ হইতে উদ্ধার করিতে পারে; জীবনটা যে ভাল করিয়া ভোগ করা সম্ভব, এ বিশ্বাস সভ্যতাই উদ্রেক করিতে পারে। সভ্যতাপ্রাপ্ত হইলেই মানুষ বুঝিতে পারে—কত মহৎ ভাব, কত সুকুমার হৃদয়বৃত্তি তাঁহার জীবনে বিকাশোন্মুখ হইয়াছে। সভ্যতাই যেন সেই 'শয়তান', যে মানুষকে, মুহূর্ত্তকালের মধ্যে জগতের সকল ঐশ্বর্য্য, তাহার হৃদয়রাজ্যের সকল অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্য্য দেখাইয়া দেয়, এবং তাহা ভোগ করিবার জন্য প্রলুব্ধ করে। সেই যে দুর্জ্ঞেয় ইচ্ছার কথা আমি বলিয়াছি—যুগে যুগে, ও দেশে দেশে, মানুষ তাহারই নাম দিয়াছে—'প্রোমিথিউস'।

সে যাহা হউক, যিনি ঐ কথাটার অর্থ বুঝিয়াছেন, তিনি যদি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি কি সভ্যতা কামনা করি?' এবং ধর্ম্মতঃ তাহার উত্তর দেন, তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তিনি যে উহা চান, তাহা স্বীকার করিবেন। তবে, একটা কথা এই যে, কয়জন ঐ কথাটার অর্থ বোঝে? অতএব বেশীর ভাগ লোক যে উহা চাহিয়াছে, বা ভবিষ্যতে চাহিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তথাপি, যেহেতু আমি সভ্যতার স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছি, এবং যেহেতু আমি নিজে উহা কামনা করি, অতএব, আমি এক্ষণে উহা লাভ করিবার একটি উপায়ও নির্দ্দেশ করিব। যদি কোন সমাজ সভ্য হইতে চায়, এবং সভ্যতা সৃষ্টি করিবার অভিলাষী হয়, তবে তাহার কার্য্যবিধি কিরূপ হওয়া উচিত, আমি তাহারই একটা খসড়া প্রস্তুত করিয়া দিব।

যে আদি কেন্দ্রমণ্ডল হইতে সভ্যতার বিস্তার হয় বলিয়াছি, সেই কেন্দ্রমণ্ডল বাদে, বাহিরের বৃহত্তর সমাজে, জনগণের অন্ততঃ কিয়দংশ এমন হওয়া চাই যে, সর্ব্ববিষয়ে তাহারা অনুসন্ধিৎসু, এবং কিঞ্চিৎ ভালমন্দ-বোধও তাহাদের আছে। প্রাচীন স্পার্টাবাসীরা এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিল যে, একটা সমগ্র সমাজকে—অন্ততঃ তাহাদের মধ্যে যাহারা দাসত্ব করিত না, তাহাদিগকে—শিক্ষার দ্বারা যুদ্ধকর্ম্মে অতিশয় নিপুণ করিয়া তোলা যায়। কিন্তু যতদূর জানা আছে, একমাত্র আথেনীয়গণই সর্ব্বপ্রথম নিজ সমাজকে এই শিক্ষা দিয়াছিল যে, শিক্ষার গুণে জীবনের মাধুর্য্য পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করা যায়। সভ্যতাসৃষ্টির জন্যও, সমগ্র সমাজে তদনুযায়ী সজ্ঞান উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা সভ্যতাপ্রার্থী সমাজের

একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ঐরূপ শিক্ষার দ্বারা যে সভ্যতার সৃষ্টি হয়, তাহাই মুখ্য নয়; উহার ফলে মনের যে অতিশয় সুখকর অবস্থা—যে উৎকৃষ্ট ভোগসুখ—সম্ভবপর হয়, তাহাই মুখ্য; ঐ সভ্যতাও গৌণ উপায় মাত্র, এবং একমাত্র উপায় না হইলেও সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ। আবার ঐ যে সভ্যতা, যাহা সেই সুখলাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়, তাহাও সমাজকে একটা রঙের মতই রঞ্জিত করে—সে যেন একটা রং মাত্র; সেই রং সে পায় কয়েকজন পূর্ণ-সভ্য নর-নারীর সেই কেন্দ্রমণ্ডলটি হইতে। অতএব কোন সমাজ যদি ঐ সভ্যতার রঙে রঞ্জিত হইতে চায়, তবে তাহাকে ইহাই প্রথমে স্থির করিতে হইবে যে, কি উপায়ে সভ্যতাসৃষ্টিকারী সেই পূর্ণসভ্য নরনারীর কেন্দ্রমণ্ডল উদ্ভূত হইতে পারে—তাহার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইলে সমাজে কিরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন?

কিয়ৎ পরিমাণে বৈষয়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই উচ্চতম সভ্যতার অধিকারী হইতে পারে না। তাই বলিয়া ইহাও সত্য নয় যে, বৈষয়িক সম্পদ বাড়িলেই কোন সমাজে লেশমাত্র সভ্যতার রং লাগিতে পারে। আধুনিক কালের ধনাঢ্যতম সমাজগুলির দিকে চাহিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। ঐ কথাটার অর্থ কেবল এই যে, উৎকৃষ্ট সভ্যতার অধিকারী হইতে হইলে, মানুষের মনটা সর্ব্বপ্রকার অভাব-অনটনের ভাবনা হইতে মুক্ত থাকা চাই। এইখানেই যত মহাপ্রাণ মানব-হিতৈষীগণ একটা বিশ্রী ও কঠিন সমস্যায় পড়িয়া যাইবেন। সভ্যতার আদি উৎস হইবে যাহারা—সেই অল্প কয়েকজন নর-নারীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য বাকি অধিকাংশ জনগণ অধিকতর দারিদ্র্য ভোগ করিবে কেন? ইহার একমাত্র উত্তর,—তাহারা ঐ ভার বহন করিতে বাধ্য হইবে, যেমন চিরদিন হইয়াছে। সভ্যতা-রক্ষার জন্য প্রচুর অবসরসম্পন্ন এক শ্রেণীর মানুষ সমাজের মধ্যে থাকা অত্যাবশ্যক; ঐ শ্রেণীর পরিচর্য্যার জন্য দাস বা ভৃত্যজাতীয় একদল মানুষও থাকিবে; অর্থাৎ, সেইশ্রেণীর মানুষও চাই, যাহারা তাহাদের উদ্বৃত্ত সময় ও শক্তি অপরের সেবায় নিয়োজিত করিবে। এই সাম্য-বিরোধী ব্যবস্থা তাহাদের পক্ষে কষ্টকর বা দুঃসহ হইবে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাঁহারা সভ্যতার কোন প্রয়োজনই বোধ করেন না—সামাজিক জীবনের উৎকর্ষ অপেক্ষা সাম্যই অধিকতর মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু মানুষের সমাজে

পূর্ণ-সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, পূর্ণ-বর্ব্বরতাকেও প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। ঐরূপ বর্ব্বরতায় ঝাঁপ দিবার পূর্ব্বে, মানব-প্রেমিকগণ যেন মনে রাখেন যে, এমন বহু মানুষ আছে যাহারা দাসত্ব করিতে মোটেই অনিচ্ছুক নয়; এমন ব্যক্তির সংখ্যাও অল্প নয় যাহারা একটা উচ্চ আদর্শরক্ষার জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নয়।

এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সভ্যতম জীবন যাপন করিতে হইলে, অর্থাৎ অতিগভীর এবং সূক্ষ্ম মানসিক সুখ উপভোগ করিতে হইলে, দুইটি বস্তুর প্রয়োজন—প্রথম, গ্রাসাচ্ছাদনের সম্যক্ ব্যবস্থা; দ্বিতীয়,—সুপ্রচুর অবসর, আবার, স্বাধীনতাও চাই, অর্থাৎ নিজে কেমন জীবন যাপন করিব তাহা নিজেই স্থির করিবার অধিকার,—তজ্জন্য সবকিছু পরীক্ষা করিয়া দেখিবার, এবং মনের ভাব প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐরূপ নিশ্চিন্ত জীবিকা, অবসর, এবং স্বাধীনতা প্রভৃতির জন্য অর্থও চাই; যে-পরিশ্রমের দ্বারা পণ্য উৎপাদন করা যায় কেবল তাহাই অর্থোপার্জ্জনের সহায়। এইরূপ যত অর্থকরী শ্রম-কর্ম্ম আছে তাহা মনের সেই রসাস্বাদ-শক্তির প্রতিকূল; কারণ, তাহাতে দেহ অবসন্ন হইয়া পড়ে, বোধ-শক্তির তীক্ষ্ণতা নষ্ট হয়। অক্সফোর্ড কিম্বা কেম্ব্রিজ হইতে উন্নত-রুচি ও রস-পিপাসা অর্জ্জন করার পর, কত লোক ব্যারিষ্টার, ব্যবসায়ী বা রাজ-কর্ম্মচারী হইয়া, এবং সেই সেই কর্ম্মে ত্রিশ বৎসরের চেষ্টায় আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়া, শেষে এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে, কোনরূপ উচ্চাঙ্গের সুখ-ভোগ করিবার সামর্থ্য আর নাই; একটু রঙীন স্ফূর্ত্তি, আবেগময় বন্ধুত্ব, জনপ্রিয় উপন্যাস, ততোধিক নিকৃষ্ট ছবি, কদর্য্য সঙ্গীত, সিনেমা, গল্‌ফ্, আড্ডার গল্প, নানারূপ আইন প্রভৃতি প্রণয়নের উৎসাহ—এই ধরণের সুখই তাহাদের পরম সুখ বলিয়া মনে হয়।

ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহাদিগকে কখনো অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয় নাই তাহারাই অর্থ ব্যয় করিতে জানে, তাহারাই বুঝিতে পারে অর্থের সার্থকতা কি? যে-বস্তু আমরা কামনা করি তাহার মূল্য হিসাবেই ত' অর্থের গৌরব। অর্থের ঐরূপ ব্যবহার কেবল তাহারই পক্ষে সম্ভব—যে মনে সম্পূর্ণ মুক্ত, যাহাকে কাহারও বশ্যতা স্বীকার বা মনস্তুষ্টি করিতে হয় না, এবং সেইজন্য কোনরূপ ক্ষুদ্রতা যাহার চিত্ত স্পর্শ করিতে

পারে না। যাহারা এইরূপ স্বাধীন তাহারাই বুদ্ধিবল, হৃদয়বল, ও কঠিন সততা রক্ষা করিতে পারে। যাহারা সমাজতন্ত্রবাদী তাহারা যদি কাজ করিয়া পূরা-বেতন না পায় তবে অবশ্য তাহারা আমাদের এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে চাহিবে না,—প্রশ্নটা এই যে, ধনের ভাগটা সকলের সমান হইলেই কি মানুষের শ্রেষ্ঠ সুখলাভ হইবে? এ প্রশ্নের মন-খোলা উত্তর তাহারাও দিতে পারিবে না। ইহাও স্মরণীয় যে, সমাজতন্ত্রবাদের মূল তত্ত্বটা একজন অবসরভোগী ভাবুক মানুষের মাথা হইতেই বাহির হইয়াছিল; সেই তত্ত্বকে ব্যবহারিক রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার প্রতিভাও ঐ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সম্ভব হইয়াছে।

আসল কথা, যদি কোন সমাজ সভ্যতার অধিকারী হইতে চায় তবে তাহাকে উহার খরচও যোগাইতে হইবে। স্কুল ও য়ুনিভার্সিটি, মিউজিয়ম ও চিত্রশালা প্রভৃতির যে ব্যয়ভার বহন করিতে হয়, এইরূপ একটা অবসরজীবী সম্প্রদায়কে পালন করিবার জন্যও ঠিক সেইরূপ করিতে হইবে। ইহার জন্য সমাজে শ্রেণীভেদ থাকিবেই, ঐরূপ সাম্যহীনতাই সমাজের পক্ষে শ্রেয়স্কর। মানুষের ভাবজীবন বা চিন্তাজীবনের মাধুরী, তাহার রস-রহস্য—আপন প্রকৃতির বশেই আবিষ্কার করিবার শক্তি অল্পলোকেরই আছে; সে শক্তি জন্মগত প্রতিভার মত। এইরূপ প্রতিভা যদি সযত্নে লালিত না হয়, যদি রূঢ়তা ও কর্কশতা হইতে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখা না হয়, তবে তেমন প্রতিভাও নিস্তেজ হইয়া পড়ে; অতএব প্রত্যেক সমাজে একটা অপরিশ্রমী অবসরভোগী নর-নারীর দল থাকা অত্যাবশ্যক। সমাজের বাকি অধিকাংশ জনগণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, উচ্চভাব ও উচ্চ-চিন্তার জগৎও একটা আছে, সে জগৎ মিথ্যা নয়। সেই জগতে পৌছিবার পথ সকলে নির্দ্দেশ করিতে পারে না। সভ্যতার আকরস্বরূপ এই যে নর-নারীর ক্ষুদ্র মণ্ডলটি, ইহারা কিন্তু সে বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে কোন চেষ্টা করে না—গুরুগিরি করে না, কেবল নিজেদের জীবনে তাহারা সেই পথটি ধরিয়া চলে; এবং তাহার দ্বারাই সকলের সম্মুখে শ্রেয়ের আদর্শ তুলিয়া ধরে। তাহাদের সেহ আদর্শচর্য্যা হইতেই সকলে দেখিতে পায়, ঐ অল্প কয়েকজন এমন একটা কিছু সত্যই পাইয়াছে যাহা পরম সুখপ্রদ; হয় ত' সত্য সত্যই এমন সকল ভোগ্যবস্তুও আছে যাহাদের তুলনায় তাহাদের সুখগুলী নিকৃষ্ট। তখন তাহারা চিন্তা করিতে সুরু করে—সত্যই কি ঘোড়দৌড়, খাচখেলা, ফুটবল, সিনেমা ও হুইস্কির চেয়ে ভাব-চর্চ্চা ও

আর্ট, রসিকতা ও কল্পনা, এবং মানুষে-মানুষে সূক্ষ্মতর সমচিত্ততার আনন্দ অধিকতর প্রেয় ? এমনি করিয়া মানুষের মন জাগে, এখানে ওখানে দুই চারিটা বর্ব্বর কৌতূহলী হইয়া উঠে। হয় তো, যখন জুন-মাসের এক গ্রীষ্ম-সন্ধ্যায় শহর-প্রান্তের বস্তিগুলীর মধ্যে নূতন কাটা ঘাসের সুগন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসে তখন তাহারই সঙ্গে সেই বর্ব্বরের মনে সভ্যতার সৌরভ সঞ্চারিত হয়। নগরোদ্যানের ভিতর দিয়া সে সহস্রবার যাতায়াত করিয়াছে, কিন্তু একদিন সহসা ধরিয়া ফেলে যে, উদ্যানমধ্যস্থ ফোয়ারাটার দিকে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে ; তাহাতে সে লজ্জা ও বিস্ময় বোধ করে। আর একদিন সে হঠাৎ বুঝিতে পারে যে, কোন বিশপ বা ম্যাজিস্ট্রেট যে বিষয়টাকে অশ্লীল ও অসত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, আসলে তাহা তেমন কিছুই নয়। সেই বর্ব্বরই একদিন বোকাচিওর (Bocaccio) গল্প পড়িতে পড়িতে মঠধারী সন্ন্যাসীদের চরিত-কথায় না হাসিয়া পারিবে না এবং নিজেকে সেইরূপ হাসিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিবে।

কেবল ঐরূপ কর্ম্মভারমুক্ত অবসরভোগী ব্যক্তিরাই যে উৎকৃষ্ট সভ্যতা সৃষ্টি করিতে পারে, ইহার পক্ষে অকাট্য যুক্তিও যেমন আছে, তেমনই ইতিহাসের সাক্ষ্যও আছে। আথেন্স নগরীতে ধনীর সংখ্যা অতিশয় অল্প ছিল। অতএব সভ্যতার সহিত সমাজতন্ত্রের কোন বিরোধ নাই। সভ্যতা যদি প্রয়োজনীয় হয় তবে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রেও, ঐরূপ উচ্চতম শ্রেয়োলাভের জন্য, এক শ্রেণীর নিষ্কর্ম্মা নর-নারীর ব্যয়ভার বহন করা অসাধ্য নয়—যেমন স্কুল ও হাঁসপাতালের জন্য করা হইয়া থাকে। একমাত্র প্রশ্ন এই যে, কাহাদের মধ্য হইতে ঐরূপ পুরুষ বা নারী নির্ব্বাচন করা যাইবে। বর্ত্তমানে উত্তরাধিকার-প্রথার দ্বারা ঐ কাজ হইয়া থাকে —এমন অবিবেচনার কাজ আর কিছুই হইতে পারে না। এরূপ বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই যে, কেবল ধনী পিতা-মাতার সন্তানেরাই বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তিতে আর সকলকে ছাড়াইয়া যাইবে। আধুনিক ইংল্যাণ্ডে অনেকগুলি নিষ্কর্ম্মাকে এইরূপ সুবিধাভোগ করিতে দেওয়া হইয়াছে, অথচ এতগুলির মধ্যেও তেমন সংখ্যক সভ্য-প্রকৃতির নরনারী নাই, যাহারা সভ্যতার সৃষ্টিকারী সেই কেন্দ্রমণ্ডল বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এইরূপ প্রথা অতিশয় অপব্যয়মূলক। ভবিষ্যতে এমন একটা নিয়ম করা যাইতে পারে যদ্দারা উহাদের অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশকে বহিষ্কৃত করা হইবে ; উহারা আর কিছুই করে না কেবল অভিজাত-বংশীয়দের উপাধি-

তালিকাটি সর্ব্বদা দীর্ঘ করিয়া রাখে, উহাদের ছবির দ্বারাও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির শোভাবৃদ্ধি হয়।

যতগুলি ব্যক্তি ঐরূপ নিষ্কর্ম্মা-শ্রেণীভুক্ত হইবে তাহাদের সকলেই যে সভ্যতায় অগ্রগণ্য বা সমাজের অলঙ্কার-স্বরূপ হইবে, এমন কোন কথা নাই। ইহাদের সংখ্যা কম হইলে ক্ষতি নাই, কেবল একটা কথা মনে রাখিতে হইবে—সমাজে এমন এক শ্রেণীর নিষ্কর্ম্মা নর-নারী সর্ব্বদাই থাকা চাই যাহাদের নিকটে কোন সম্ভ-উপকার প্রত্যাশা করা হইবে না। তাহারা কেন থাকিবে তাহার জবাবদিহিও তাহারা করিবে না। কারণ, এমন দেখা গিয়াছে যে, যে-সকল মানুষ জগতের মহা-উপকার সাধন করিয়াছেন তাঁহারা সমসাময়িক সমাজের চক্ষে নিষ্কর্ম্মা ছিলেন; যে-যুগে তাঁহারা বিদ্যমান ছিলেন সে যুগে কেহ তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা বা সম্মান করে নাই; তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছিল অর্থচিন্তাশূন্য নিষ্কর্ম্মা ধনীদেরই কেহ; তাঁহারাও সেই শ্রেণীর মানুষ বলিয়াই গণ্য হইতেন। অতএব এমন একটি গোষ্ঠী গঠন করিয়া তুলিতে হইবে যাহাদিগের নিকটে আমরা কিছুই প্রত্যাশা করিব না; তবেই তাহাদের মধ্যে হইতে সেইরূপ নর নারীর অভ্যুদয় হইবে যাহারা সমাজকে সর্ব্বাধিক দানের দ্বারা ধন্য করিবে।

কেহ যেন এমন ভুল না করেন যে, যে সব মানুষের পাল মোটা মোটা মুনাফা বা আয় ভোগ করে তাহারাই বুঝি অবসরসম্পন্ন পরিশ্রম মুক্ত সম্প্রদায়—যাহাদের কথা আমি বলিতেছি। যে সকল লোক কোন বৃত্তি বা ব্যবসায়ের দ্বারা বৎসরে হাজার হাজার পাউণ্ড উপার্জ্জন করে, তাহারাও মুটে-মজুর অপেক্ষা উন্নত স্তরের মানুষ নয়, কেবল তাহাদের মজুরীটাই অতিরিক্ত। অবশ্য, ব্যতিক্রম স্বরূপ দুই দশ জন থাকিতে পারে, কিন্তু উহাদের ঐ জীবিকা এমনই যে, শ্রমজীবীদের মতই উহারা সভ্যতালাভে অসমর্থ। বরং যখন ইহাদের কেহ 'কল-কারখানার কাপ্তেন' বা 'বিরাট কুলিবাহিনীর অধিপতি' হন, তখন সেই প্রভুদের অবস্থা দাসদিগের অপেক্ষা শোচনীয় হইয়া উঠে। কারণ, ঐরূপ পদবীতে আরোহণ করিলেই—ছোট-বড় সকলের—এক প্রকার প্রভুত্বপিপাসা জাগে; তাহারা ঐরূপ সিদ্ধি-লাভকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় মনে করে, এবং যাহার দ্বারা ঐ সিদ্ধিলাভ হয় তাহাকেই শ্রেষ্ঠকর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করে। তাহারা নিজেরা যাহাতে হাত দেয় তদপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু তাহাদের চক্ষে জগতে আর কিছু নাই। এজন্য তাহাদের মনও যেমন মুক্ত নয়, তেমনই তাহাদের হৃদয়বৃত্তিও ভোঁতা হইয়া যায়।

আধুনিক পোলিটিক্যাল বুদ্ধি যে কিরূপ সূক্ষ্ম তাহার একটা চমৎকার নমুনা এই যে, অর্জ্জিত ও অনর্জ্জিত ধনের উপরে ট্যাক্সের পরিমাণ সমান নয় বটে, কিন্তু তাহা কম করা হইয়াছে প্রথমোক্ত আয়ের পক্ষে। যে ব্যক্তি ধন উপার্জ্জন করে সে সাধারণত আরও অধিক উপার্জ্জনের জন্যই সেই অর্জ্জিত ধন নিয়োজিত করে, এবং সে অর্থ সে ব্যয় করে প্রভুত্ববৃদ্ধির জন্য, সমাজে প্রতিপত্তি-লাভের জন্য, পাশব সুখভোগ বা বর্ব্বরসুলভ আমোদ প্রমোদের জন্য। অপর পক্ষে, যাহারা পরিশ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করে না, সেই সকল ধনীগণের মধ্যেই এমন অবসর-ভোগী মানুষ পাওয়া যাইবে যাহারা সত্যকার শ্রেয়োলাভের জন্যই অর্থব্যয় করে। যে-মানুষকে পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হয় সে অতিশয় শুষ্ক-কঠিন, দয়াহীন, অনুদার হইয়া উঠে, তাহার মন রুদ্ধ হইয়া যায়; সে তাহার সেই অর্জ্জিত ধন রক্ষা করিবার আগ্রহে প্রায় হিংস্র হইয়া উঠে, এবং কিসে সেই ধন আরও বৃদ্ধি পায় সেই চেষ্টাই করে। ঐ যে জীবিকার ভাবনা হইতে মুক্ত আলস্যবিহারীর দল, উহাদের মধ্য হইতেই স্বাধীনতার দাবী, সমাজ-বিপ্লব, ব্যক্তির অধিকারবাদ ও নৈরাজ্যনীতি প্রভৃতির প্রচারক দেখা দিয়াছে—এইগুলিই আধুনিক চিন্তাধারার প্রধান লক্ষণ।

এক বিখ্যাত প্রবন্ধে মনীষী রেনাঁ (Renan) তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধীরতা ও বিচারবুদ্ধি সহকারে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, ঐরূপ অবসরভোগী ধনী যাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্ম হইবে—সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ব-সমস্যার কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া, মনুষ্য-জীবনের উৎকর্ষসূচক যাহা-কিছু তাহারই রক্ষণে যত্নবান হওয়া; প্রয়োজনের বস্তু অপেক্ষা সুন্দর বস্তুর আদর করা; যাহা-কিছু অতি সুকুমার ও তপস্যালব্ধ সেইগুলির মর্য্যাদা অটুট রাখা। ধনোপার্জ্জনের দায় হইতে যাহারা মুক্ত তাহারাই প্রকৃত স্বাধীনচেতা হইতে পারে, ঐরূপ হইতে পারাই যে সভ্যতার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, ইহাও তিনি বলিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আমিও একমত; কিন্তু মনে হয়, একটা বিষয়ে তাঁহার উক্তি সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নয়, কারণ, যদিও তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেন নাই, তবু তাঁহার অভিপ্রায় যেন এইরূপ যে, ঐ শ্রেণীর ব্যক্তিগণই রাজ্যশাসনের উপযুক্ত ও অধিকারী। আমি উহার আবশ্যকতা স্বীকার করি না, বরং ঠিক উল্টা কথাই বলি। যাহারা কোন প্রভুত্ব-কর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত করিতে বাধ্য হয়, তাহাদের পক্ষে চিত্তের প্রকর্ষ-লাভ অসম্ভব। যাহারা কোন কর্ম্ম করে না বলিয়া ঐ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে তাহারাই যদি শাসন-কর্ম্ম

করে, তবে মূল কথাটাই অর্থহীন হইয়া পড়ে। স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, সমাজে যাহারা সভ্যতায় শীর্ষস্থানীয়, রাজ্যশাসন ব্যাপারে তাহাদের কোন দায়িত্ব না থাকাই উচিত; কারণ, আমরা জানি, কর্ত্তৃত্বের অভিমান মানুষের উচ্চতর গুণগুলি নষ্ট করিয়া দেয়। তাহা হইলে প্রশ্নটা দাঁড়ায় এই—কোন্ প্রকার শাসনতন্ত্র সভ্যতা সৃষ্টির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রায় অসম্ভব বলিলেও হয়।

যে কোন শাসনতন্ত্র সভ্যতাসৃষ্টির অনুকূল হইতে পারে, যদি তাহার অধীনে উপযুক্ত সংখ্যক বালক বালিকাকে রীতিমত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়—যাহার চেয়ে উৎকৃষ্ট শিক্ষা বুদ্ধি বা অর্থবলে মানুষ উদ্ভাবন করিতে পারে না। তারপর, সেই শিক্ষিত রুচির উপযোগী যতকিছু ভোগ্যবস্তু তাহাদিগকে যাবজ্জীবন সরবরাহ করিতে হইবে, এবং প্রতিদানে তাহাদের নিকট হইতে কিছুই দাবী করা হইবে না। ইহার জন্য কি পরিমাণ অর্থ আবশ্যক, এবং কেমন করিয়া তাহা বাঁটিয়া দিতে হইবে, সেই গবর্ণমেণ্টকে তাহারও হিসাব ভাল করিয়া করিতে হইবে। সেইরূপ সভ্য-জীবনের জন্য প্রত্যেক নারী বা পুরুষের ঠিক কত টাকা আবশ্যক তাহা বলা কঠিন, কারণ সকল কালে জীবনযাত্রা একরূপ নহে। আমার ধারণা, বর্ত্তমান অবস্থায় বার্ষিক সাতশত বা আটশত পাউণ্ডের কমে কাহারও চলে না; অবশ্য পুত্রকন্যার ভার সরকারই বহন করিবে।

কিন্তু ইহা ত কেবল একটা পরামর্শ মাত্র, ইহার দ্বারা ঐ প্রশ্নের একটা কাছাকাছি উত্তরও দেওয়া হইল না; কোন্ প্রকার রাষ্ট্র সভ্যতা-সৃষ্টির পক্ষে সব-চেয়ে হিতকর, তাহার একটা সমীচীন জবাব দিবার পূর্ব্বে আর একটা প্রশ্নের জবাব দিতে হয়, সে প্রশ্ন মনুষ্য-চরিত্রের সম্পর্কে। মানুষ যেরূপ সন্দিগ্ধ ও ঈর্ষাপরায়ণ তাহাতে এমন আশা কি করা যায় যে, সে তাহার বৈষয়িক ক্ষতি স্বীকার করিয়া, আত্মার উন্নতির জন্য, এমন এক শ্রেণীর ভরণপোষণ করিতে সম্মত হইবে যাহারা স্পষ্টতই নিষ্কর্ম্মা, অথচ তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর সুখ-সুবিধা ভোগ করিবার অধিকারী?—হোক্ না তাহারা সভ্যতম, তাহাতে অপরের কি? এ প্রশ্নের উত্তর দিবার ভার আমি পোলিটিশ্যন ও পুলিসকোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেটের উপরে সানন্দে ছাড়িয়া দিলাম, তাঁহারাই বলিতে পারেন, মানুষের চরিত্রে কি সম্ভব, আর কি সম্ভব নয়। আমি কেবল ইহাই বলিতে পারি যে, যতদিন না সাধারণ মানুষ এইরূপ সুবুদ্ধিসুলভ উদারতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় ততদিন গণতন্ত্র ও সভ্যতা এই দুই বস্তু একত্রে সম্ভব হইবে না।

পৃথিবীতে পূর্ব্বে কখনো গণতান্ত্রিক সভ্যসমাজের প্রতিষ্ঠা হয় নাই ; ইহাও সত্য যে, বিংশশতাব্দীর পূর্ব্বে কোথাও গণতন্ত্রের আবির্ভাব হয় নাই। গ্রীস বা ইতালীতে যে তথাকথিত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাতেও স্বতন্ত্র অধিকার-সম্পন্ন একটা ক্ষুদ্র সমাজই শাসনকার্য্য করিত। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে, যখন আমি এই প্রবন্ধের একটা খসড়া প্রস্তুত করি তখনই যদি ইহার রচনাও শেষ করিতাম তবে ইহাই লিখিতাম যে, গণতন্ত্র ভিন্ন আর কোন রাষ্ট্রের সম্পর্কে সভ্যতা-সৃষ্টির আলোচনা একরূপ তত্ত্বালোচনা মাত্র—একটা মানসিক ব্যায়াম ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এই যুদ্ধ সব উল্টাইয়া দিয়াছে ; উহার দ্বারা যে একটি সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে এবং যাহাতে একালের সকলেই চমকিত হইয়াছে তাহা এই যে, অন্ততঃ আগামী পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ রাষ্ট্রশাসন-কার্য্যে—সমর-বিশারদ ব্যক্তিগণই প্রভুত্ব করিবে ; ইহাই শুধু সম্ভব নয়, প্রায় নিশ্চিত। এই যুদ্ধই আমাদিগকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিয়াছে যে, চিরদিন যেমন আজিও তেমনই, শক্তির প্রকৃত অধিকারী আর কেহ নহে। জনসাধারণের ইচ্ছায় বা আদেশে কিছুই হইবার নয় ; কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ঊর্দ্ধতন ব্যক্তির আজ্ঞাকারী, অস্ত্রশস্ত্রে সম্যক সুসজ্জিত ও সুসংগঠিত একদল মানুষই সর্ব্ববিধ আদেশ বা ইচ্ছাকে অলঙ্ঘনীয় করিতে পারে। এখন বহুলোক বুঝিতে পারিয়াছে যে, যদি কেহ আপন ইচ্ছা—সমস্তটাই—অপরের উপরে প্রয়োগ করিতে চায়, তবে সেই অপরকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে—বিনা বাক্যে উহা পালন না করিলে, হয় মৃত্যু নয় ভীষণ যন্ত্রণাভোগ অবধারিত। এই যুদ্ধই মানুষকে একটি জ্ঞান দান করিয়াছে —রাজনীতিবিদ্ পণ্ডিতগণ তাহা চিরদিন জানিতেন,—সে জ্ঞান এই যে, সকল যুক্তির শেষ যুক্তি—ঐ ভীতিপ্রদর্শন ও বলপ্রয়োগ। যাহাদের বল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, এবং যাহারা আর সকলকে সন্ত্রস্ত করিতে পারে, তাহারাই শাসনযন্ত্র পরিচালনা করিবে।

এবার সামরিক কার্য্যে যোগ দেওয়াইবার জন্য যে বাধ্যতামূলক আইন করা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা শত সহস্র মানুষকে, তাহাদের ঘর-সংসার, বৃত্তি ও ব্যবসায় হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া যাইতে আমরা দেখিয়াছি। যে কাজকে তাহারা অন্তরের সহিত ঘৃণা করে তাহাই করিতে বাধ্য হইয়া প্রায় সকলে অকালে মৃত্যু বরণ করিয়াছে। তাহারা যে সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়াছিল, সেও ঠিক হত্যাশালায় হৃষ্ট পশুপালের মত। এক্ষণে যে কেন্দ্রীয় শাসন-শক্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহাকে রক্ষা করিবার

জন্য প্রেসকে দাবাইয়া রাখিতে হয়, বিচারের জন্য কোর্ট-মার্শালের মত আইন করিতে হয়—সেই বিচার ও দণ্ডদানের পদ্ধতি এমনই যে, তাহাতেই মানুষের বুক ভয়ে কাঁপিয়া উঠে। এমন গবর্ণমেণ্ট মানুষকে দিয়া কি না করাইতে পারে?—রাশিয়া ও ইতালীতে, এবং অন্যত্রও, কয়েকজন ধুরন্ধর ব্যক্তি এই তত্ত্বটি আবিষ্কার করিয়াছেন।

বলশেভিক-বাদের ভক্ত যাঁহারা তাঁহারাও এমন কথা বলিবেন না যে, উহাতে জনগণের সম্মতি বা অনুমোদন আছে; আর ফ্যাসিষ্ট-নীতিও যে জনপ্রিয়, ইহা বিশ্বাস না করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তথাপি রাশিয়া ও ইতালীতে কয়েকজন দক্ষ ও দৃঢ়চেতা পুরুষ যেরূপ সাফল্যসহকারে তাহাদের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছে, তাহা দেখিয়া অপর সকল দেশের ভাগ্যহীন শাসকগণ ঈর্ষান্বিত হইবে, তাহারাও এ বিষয়ে ভাবিতে সুরু করিবে; উহাদের ঐ দৃষ্টান্ত কোন-না-কোন আকারে পৃথিবীর সর্ব্বত্র অনুসৃত হওয়াই সম্ভব। কিন্তু আমার ত' মনে হয় না, তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত সভ্যতার বিশেষ ক্ষতি হইবে।

কালক্রমে নূতন শাসন-নীতির, অথবা উহার নেতাদের ঐ দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার ফল এমন দাঁড়াইতে পারে—পারেই বা কেন, ইতিমধ্যেই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একটু নির্লিপ্তভাবে, দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, রাশিয়ার এই সামরিক প্রভুত্বমূলক শাসন কোন নূতন পথে অগ্রসর হইবে না; ঐরূপ শাসনের পরিণাম পূর্ব্বকালে যেমন হইয়াছে একালেও সেইরূপ হইবে। বিপ্লবের ফলে ক্রমাগতই উহার কলকব্জাগুলির সমূহ পরিবর্ত্তন ঘটিবে। যাঁহাকে রাজ্যশাসন করিতে হইবে, তিনি যে ব্যক্তিই হউন—আগষ্টাস্ বা লেলিন, মুসোলিনি বা নেপোলিয়ন—তাঁহাকে চারিপাশে কতকগুলি সামরিক ও অসামরিক বিচক্ষণ ব্যক্তির দল গড়িয়া লইতে হইবে। উহারাও শক্তিমান, উহাদের কামনা বাসনা আছে। উহারা যে বস্তু কামনা করিবে তাহা পূর্ব্বেকার সেই নিহত বা নির্ব্বাসিত সভ্য মানুষগুলার কামনা হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে; এবং যেহেতু সেই কামনা চরিতার্থ করিবার শক্তি তাহাদের থাকিবে, অতএব তাহারা তাহা না করিয়া ছাড়িবে না। তখন এক নূতন ধরণের বিত্তশালী সমাজ দেখা দিবে, এবং তাহাদের মধ্য হইতেই আবার সেই অবসরভোগী কতকগুলি নরনারীর অভ্যুদয় হইবে, তাহারাই সভ্যতা সৃষ্টি করিবে।

ঐ প্রত্যাবর্ত্তনের পথটা সম্ভবতঃ আরও ছোট করিয়া লইবার সুবিধা হইবে।

যাহারা নগণ্য অবস্থা হইতে অতিশয় গণ্য হইয়া উঠে, তাহাদের একটা বস্তুর প্রতি লোভ কিছু বেশি হইয়া থাকে—উহা জনগণের শ্রদ্ধা। একমাত্র সামরিক বিক্রম ছাড়া যে আর একটি উপায়ে আরও সুস্পষ্টভাবে সেই মোহিনী শক্তির অধিকারী হওয়া যায়—তাহা কালচার, বা কাব্য-দর্শন-কলা-শিল্পের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন। এই জন্য, যাহারা অন্যায়পূর্ব্বক রাজ্যাধিকার করে—সেই সকল অত্যাচারী প্রভুরা সর্ব্বাগ্রে শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, শিক্ষিত সমাজের উন্নতিবিধানে তৎপর হয়। এ বিষয়ে দুই নেপোলিয়নের কার্য্য সকলের স্মরণ হইবে। জগতের যত বড় বড় দেশ-বিজেতা—সাইরস, আলেকজান্দার, তৈমুর ও আকবর—সকলেরই একরূপ কালচার-প্রীতি ছিল—গুণী ও জ্ঞানীদের সহিত সমকক্ষতা প্রমাণ করিবার বাসনা ছিল। ইহাও সত্য যে, এইরূপ পররাজ্যাপহারী স্বৈরাচারী নৃপতিগণের রাজসভা হইতেই অনেক সময়ে সৎচিন্তা, সদ্ভাব ও রসচর্চ্চার শুভ্র আলোক বিকীর্ণ হইয়াছে, ইহারাই সভ্যতা-সৃষ্টিকারী জ্ঞানী ও গুণীদের রক্ষক ও প্রতিপালক ছিল। এইজন্য আমি ভাবিতেছি, আমার এই প্রবন্ধের এক-এক খণ্ড আমি রাশিয়ার 'মনিব' গণকে, এবং সিনিয়র মুসোলিনী ও উইনষ্টন চার্চ্চিল মহাশয়কে পাঠাইয়া দিব।

কোন স্বেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্রের প্রতি আমার নিজের কিছু মাত্র অনুরাগ নাই; কিন্তু যদি ঐরূপ শাসনতন্ত্র এবং তদনুষঙ্গী দাসত্ব কোন সময়ে, অবস্থাবিশেষে, সমাজের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর হয়, অর্থাৎ সর্ব্বাধিক মানস-সুখভোগের অনুকূল হয়, তবে আমার বিশ্বাস, কেবল দুর্ব্বৃত্তগণই তেমন শাসন-ব্যবস্থার বিরোধী হইবে। আসলে, এই সব নির্ব্বোধ মানব-হিতৈষীরা ইহাই বলিতে চায় যে, স্বাধীনতা, সমদর্শিতা, জনগণের সমানাধিকার প্রভৃতির উপরে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহা কিছুতেই মঙ্গলকর হইতে পারে না, তেমন সভ্যতার কোন মূল্য নাই। ওইগুলাকেই তাহারা পরমার্থজ্ঞান করে; কিন্তু সে গুলা যে পরমার্থ-লাভের উপায়মাত্র—উপায়-হিসাবেই তাহাদের যাহা-কিছু মূল্য—তাহা স্বীকার করে না, তাই হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে। সভ্যতাকে অপদস্থ করিবার জন্য কেবলই ইহাই দেখাইলে চলিবে না যে, তাহাদের মূলে অন্যায় বা দাসত্ব আছে; ইহাও প্রমাণ করিতে হইবে যে, ঐ স্বাধীনতা ও সমদর্শিতা দ্বারা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু লাভ করা যায়।

যদি আর সকল দিক ঠিক থাকে, তাহা হইলে আমি স্বাধীনতা ও সমদর্শিতা-

মূলক সভ্যতাকেই অধিকতর শ্রেয় মনে করিব ; তাহার একটা কারণ এই যে, সমাজের একটা ভাগ যদি দাসত্ব করে, তবে তাহারাই সভ্যতার উৎস-স্বরূপ সেই মানুষগুলিরও অবনতি ঘটাইতে পারে ; দ্বিতীয়তঃ, ঐ দাসগুলাই ত' সেই নিম্ন-স্তরের মানুষ যাহাদের জীবনে সভ্যতার রং ধরাইতে হইবে ; অতএব, উহারাই যদি বড় বেশি মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সেই রং লাগিবে কেমন করিয়া ?—সমাজের ঐ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের কোন কাজই থাকিবে না। অতএব, দাসত্ব বজায় রাখিয়াই যে স্বেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্র একটা সভ্য সম্প্রদায় পোষণ করিতে চায়, অথবা, যে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিজের স্বার্থনাশের ভয়ে—সমাজের ধনিকগণকে রক্ষা করিবার জন্য, পুলিশ-পাহারা শক্ত করিয়া তোলে ;—এ দুইয়ের পরিবর্ত্তে, আমি সামাজিক সমানাধিকারবাদী শাসনতন্ত্রেরই পক্ষপাতী ; এরূপ রাষ্ট্রে মানুষ আপনা হইতেই সভ্যতা-লাভের উপায় করিয়া লইবে। কিন্তু তেমন সুবুদ্ধিসম্পন্ন গণতন্ত্রের অভ্যুদয় কবে হইবে কে জানে ?

এ পর্য্যন্ত আমরা যত সভ্যসমাজের ইতিহাস জানি তাহা হয় কোন স্বেচ্ছাচারী রাজা, অথবা একটা শক্তিমান শাসক-সঙ্ঘের দ্বারা জোর করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আমরা ভুল করিয়া যাহাকে, "আথেনীয় গণতন্ত্র" আখ্যা দিয়া থাকি, তাহা আসলে, নিম্নশ্রেণীর উপরে একটা শক্তিমান অভিজাত সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব-স্থাপন মাত্র ; ঐরূপ দাসত্বের উপরেই সভ্যতার সব-কিছু নির্ভর করিত। এই দাসত্বকারীদের অনেকেই ছিল শিল্পজীবী কারিগর ; ইহাদের প্রভুরা অপরের কাজ করিবার জন্য ইহাদিগকে ভাড়া দিত, অনেকে মনিবের সংসারেই দাসত্ব করিত। এই ভৃত্যগণের প্রতি মনিবদের ব্যবহার খুব ভালই ছিল, ইহারাও আথেনীয় সভ্যতার কতগুলি সুখ ভোগ করিতে পাইত। কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা আজীবন 'দাস' থাকিয়াই যাইত—'দাস' বলিতে যদি এমন মানুষ বুঝায় যাহার কোন রাজনৈতিক অধিকার নাই, যাহাকে পরের জন্যই খাটিতে হয়। কিন্তু এই সকল শিক্ষিত শিল্পকর্ম্মনিপুণ 'দাস'-এর নিম্নে আরেক শ্রেণীর দাসও ছিল, সেগুলাকে মানুষ না বলিয়া ভারবাহী পশু বলিলেও চলে। এই বিংশ শতাব্দীতে এমন দাস্যবৃত্তি মানুষকে আর করিতে হইবে না, কারণ এখন মানুষের পরিবর্ত্তে যন্ত্রই সেই সকল কাজ করিতে পারিবে।

যাহারা আথেন্সের দৃষ্টান্ত দিয়া বলে যে, এককালে স্বাধীনতা, সমদর্শিতা ও সমানাধিকার, এই সকলের ফলে কি অপূর্ব্ব সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল!—সেই

অতি-শিক্ষিত হবু-পোলিটিশিয়নগণ যে কতখানি অজ্ঞ, তাহা আপনারা এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছেন। এমন কথা বলিলে অযথার্থ হয় না যে, সেই সভ্য ও সম্পত্তিশালী উচ্চসমাজের মধ্যেই সকলের সর্ব্ব-বিষয়ে সমান অধিকার ছিল, কেবল তাহাদের নিজেদের মধ্যেই অবস্থার তারতম্য ছিল না। তাহাদের মধ্য হইতেই সেই ক্ষুদ্র কেন্দ্রমণ্ডলটিকে চিনিয়া লওয়া যাইবে—যাহারা ছিল সভ্যতার সিদ্ধ সাধক, গুরু ও প্রচারক। ঠিক তাহাদের নীচেই ছিল একটি নাগরিক-সমাজ; ইহারা ঐ সভ্যতা-রস এমনই শোষণ করিয়াছিল যে, ইহাঁদিগকে ঐ উচ্চতম স্তরের খুব কাছাকাছি বলা চলে। এখন বাকি থাকে ঐ নিম্নস্থ নাগরিক-সমাজের সঙ্গে সেই উচ্চস্থ দাসগণের মানসিক উৎকর্ষ যতদূর সম্ভব নিকটবর্ত্তী করিয়া তোলা। এ কাজ এই বিংশ শতাব্দীতে আমাদের পক্ষে খুব দুরূহ নয়; গত দুই শত বৎসরের নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সে বিষয়ে আমাদিগকে যথেষ্ট সামর্থ্য দান করিয়াছে। তাহা হইলে আধুনিক সমাজকে সভ্য করিয়া তুলিতে বাধা কি? ইহার উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যাইবে। আথেন্স সভ্য হইয়াছিল, তার কারণ, আথেনীয়গণ সভ্য হইতে চাহিয়াছিল; শুধু অবসরভোগী লোকগুলাই নয়, শিল্পজীবী শ্রমজীবীরাও জীবনটাকে সুশ্রী করিবার বাসনা অন্তরে পোষণ করিত। এখন ইংল্যাণ্ডে একটা বিশাল নিষ্কর্ম্মা-সমাজ, উপার্জ্জন না করিয়া ধন ভোগ করিয়া থাকে; যাহারা ধন উৎপাদন করে তাহারাও, সভ্যতাপ্রাপ্ত পণ্ডিতগণের বুদ্ধি অনুসরণ করিয়া, বেশ আরামে অনেকটা নির্ভাবনায় তাহাদের সেই ধন ভোগ করে। কিন্তু যে অল্পসংখ্যক সভ্যতাসৃষ্টিকারী ব্যক্তি তাহাদের মধ্যেই থাকিবার কথা, তাহাদের অধিকাংশই সভ্যতার পরিবর্ত্তে বর্ব্বরতার সাধনা করে. অতিরিক্ত লাভের লোভে তাহারা মনুষ্যত্বলোপকারী পরিশ্রম হইতে নিবৃত্ত হয় না, এবং কুৎসিত আমোদ-প্রমোদে তাহাদের শ্রম বিনোদন করে; আর যাহারা শিল্পী ও শ্রমজীবী তাহারা নূতন উপায়ে যে অধিক অর্থ উপার্জ্জন করে সেই অর্থ ঐ ধনীদের অনুকরণে তেমনই অসৎ কার্য্যে ব্যয় করিয়া থাকে।

যাঁহারা চিন্তাশীল মনীষী তাঁহারা এই অন্ধকারে একটু আলোকরশ্মির সন্ধানে কেবলই সেই আথেন্সের পানে চাহিয়া থাকেন। আমরাও যখন সভ্যতাসৃষ্টির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি, তখন, সকল সভ্য সমাজে—বিশেষ করিয়া সেই আথেনীয় সমাজে—নারীজাতির মর্য্যাদার কথাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ইহা সত্য যে, আথেনীয় সমাজে সাধারণ গৃহস্থপত্নীর অবস্থা দাসীর মতই

ছিল, যদিও সেই দাসীকে তাহারা বিশেষ সম্মান করিত। ইহাই স্বাভাবিক; কারণ, গৃহিণীমাত্রেই সংসারের পরিচারিকা, তাহাকে রীতিমত খাটিতে হয়। কাজেই আথেন্সের গৃহিণীগণ দাসীরূপেই গণ্য হইতেন। তাঁহাদিগকে যে সম্মান করা হইত তাহা প্রত্যেক সৎ-স্বভাব কর্ম্ম-নিষ্ঠ সেবকেরই প্রাপ্য। আথেনীয়গণ যেমন এইরূপ সেবাকারিণী স্ত্রীর মূল্য বুঝিত, তেমনই সুশিক্ষিতা ও সর্ব্বগুণসম্পন্না নারীর মর্য্যাদাও বুঝিত—সভ্যতালাভের লাভের পক্ষে তাহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিত। তাহারা জানিত যে, সভ্যতার সম্পূর্ণতা-সাধনের জন্য শুধু পুরুষের নয়—নারীচিত্তের বিবিধ বৃত্তি ও তাহার ক্রিয়া সেই সভ্যতার উপাদান হওয়া চাই; নারীস্বভাব-সুলভ রসবোধ, অনুভবশক্তি, সহজ-জ্ঞান, রসিকতা, নারী-বুদ্ধির গোপন-তীক্ষ্ণতা, একনিষ্ঠা, মূঢ়তা, ও অবিশ্বাস, এ সকলই সভ্যতার উপাদানরূপে তাহার অঙ্গীভূত হওয়া আবশ্যক। এই উপাদানগুলি যোগাইত—'হেতায়েরা' নাম্নী এক শ্রেণীর গণিকা। আমার তাহাই মনে হয়। অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে, আথেনীয়গণের জীবনে নারীজাতির প্রভাব প্রায় ছিল না বলিলেই হয়। এই সব প্রবীণ পণ্ডিতগণকে আমি ইহাই বলিব যে, তাঁহারা প্রাচীন সাহিত্য মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন নাই, আরও একটু ভিতরে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাইবেন—উচ্চতম আথেনীয় সমাজে এই সমাজান্তরালবাসিনীরা কতখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে।

আথেনীয়গণ নিশ্চয় বুঝিয়াছিল—সভ্যতম পুরুষের মত সভ্যতম নারীও কর্ম্মহীন অবসর জীবন যাপন করিবে। এইজন্য তাহারা স্ত্রীজাতিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিল। এক ভাগে ছিল অতি সুস্থ, কর্ম্মঠ, সৎস্বভাব নারী—শিশুপালন ও গৃহিণীপনাই যাহাদের অত্যধিক কামনার বস্তু; ইহাদের সংখ্যাই ছিল বেশি। আর এক ভাগে ছিল অতি অল্পসংখ্যক আলস্যপরায়ণা রমণী; ইহারা চিত্তের উৎকর্ষ-সাধনেই সমধিক অনুরাগিণী। প্রথম শ্রেণীর যাহারা তাহারা ঘর-সংসার, পুত্রকন্যা ও গৃহিণীপদ লইয়া তৃপ্ত ছিল; তদপেক্ষা উচ্চতর সুখভোগের উপযুক্ত তাহারা ছিল না, কামনাও করিত না। গৃহের গৃহিণীরূপে তাহাদের সম্মানের অভাব ছিল না, সংসারে তাহারাই কর্ত্রী ছিল। কিন্তু তাহারা পুরুষের হৃদয়ের পূজা পাইত না; সভ্যতম পুরুষের পত্নী, জননী ও গৃহিণী ছিল তাহারা, কিন্তু সখী হইতে পারিত না। আথেনীয়গণের মধ্যে যাহারা চিত্তোৎকর্ষ বিষয়ে সবিশেষ উন্নত ছিল তাহারা সমধর্ম্মী ব্যক্তির সঙ্গই কামনা করিত, তাহাদিগকেই হৃদয়ের

গভীর অনুরাগ ও অর্ঘ্য নিবেদন করিত; যদি কাহারও নারীসঙ্গলিপ্সা থাকিত তবে তেমন নারী দুর্ল্লভ ছিল না, সেই নারী ঐ "হেতায়েরা"।

এই 'হেতায়েরা'-দিগের অধিকাংশ সাধারণ বারবনিতা হইলেও, ইহাদের মধ্যেই এমন কতকগুলি সুশিক্ষিতা কলাবতী কামিনী ছিল যাহারা ঐরূপ সূক্ষ্ম-রসরসিক আথেনীয় মনীষিগণের সখী বা প্রণয়িনী হইতে আপত্তি করিত না। যেহেতু প্রেমচর্চ্চা ব্যতিরেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃত সামরস্য ঘটিতে পারে না, অতএব এরূপ স্থলে ঐ 'হেতায়েরা'কেই পুরুষের উপপত্নী হইতে হইত। সম্ভবতঃ আথেনীয়গণ একথা কখনো বিস্মৃত হয় নাই যে, পরকীয়া-প্রেমই মনুষ্য-হৃদয়ের সর্ব্বোত্তম বিলাস। তাহারা নিশ্চয় অবগত ছিল যে, হৃদয়াবেগের সহিত ইন্দ্রিয়-সুখ মিলিয়া যে একটি অপূর্ব্ব যুগ্মধারার সৃষ্টি হয়, তাহারই পথে, আত্মার অতি সূক্ষ্ম সংবেদন, মনেরও অগোচর এক পরম অনুভূতি—এক চিত্ত হইতে অপর চিত্তে প্রবাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ গোপন প্রেম-বন্ধন ঘটিলে পর, পুরুষ যে তাহার প্রণয়িনীকে লইয়া বাহিরে কোথাও যাইবে না, এমন রীতি ছিল না। আথেনীয়গণ সর্ব্বপ্রকার সামাজিক আলাপ ও সঙ্গসুখ এতই পছন্দ করিত যে, সেরূপ পর্দ্দা-প্রথা তাহাদের অসহ্য বোধ হইত। অতিশয় সুসভ্য সুরসিকদিগের মজলিসেও 'হেতায়েরা'র প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না; তাহারা পুরুষদের সহিত সচ্ছন্দে মেলা-মেশা করিত, না করিলে আথেনীয়-সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এমন সৌরভময় করিল কে? এই 'হেতায়েরা'দিগের মধ্যেই গ্রীসের যত অসাধারণ বুদ্ধিমতী, বিদুষী ও কলাবতী রমণীর উদ্ভব হইয়াছিল; অতএব, তাহাদের সঙ্গ বর্জ্জন করা দূরে থাক, তাহা লাভ করিতেই যত খ্যাতনামা গ্রীক পুরুষ যে উৎসুক হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি?

ইহারা কখনো গৃহের গৃহিণী হইত না; যদি দৈবক্রমে সন্তানের জননী হইত তবে সেই সন্তান পালন করিত না। একালেও স্ত্রীগণের মধ্যে যাঁহারাই বিশেষ বুদ্ধিমতী, এবং যাঁহাদের চিত্ত অতিশয় মার্জ্জিত ও স্পর্শকাতর, তাঁহারাও এই বিষয়ে একটা কঠিন সমস্যায় পড়েন—পত্নীত্ব না চিরকুমারীত্ব বরণ করিবেন? একজন আধুনিক মহিলা—তাঁহার অবস্থা যতই ভালো হউক, চিত্ত যতই কর্ষিত হউক, এবং যতই তিনি গুণশালিনী হউন—যদি সন্তানবতী ও গৃহকর্ত্রী হন, তবে তাঁহার পক্ষে সমাজের অগ্রগামিনীদের সহিত পাল্লা দেওয়া দুরূহ হইয়া পড়ে। ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, রেনেসান্স-যুগের বড় বড় মহিলারা, কিম্বা অষ্টাদশ

শতাব্দীর ভামিনীগণ শিশুপালন বা সন্তানকে শিক্ষাদান করার দিক দিয়াও যাইতেন না। যে বালিকার ভবিষ্যৎ প্রতিভা এমন নিঃসংশয় বলিয়া মনে হইয়াছিল, সে-ও যুবতী বয়সে, চার পাঁচ বৎসর দাম্পত্যসুখ ও তন্মধ্যে সন্তান প্রসবের ফলে, শেষে বৈঠকী-বিদুষীপনার উপরে আর উঠিতে পারে নাই,—এমন শোচনীয় পরিণাম যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহাদের কেহ কি আমার এই দুঃখকর সিদ্ধান্তের সমর্থন করিবেন না যে, এরূপ ক্ষেত্রে ঐ যুবতীর চিরকুমারীত্বই বরণীয় ? যৌবন গত হইলে দেহমনের অনেক শক্তিই হ্রাস হয়, অনেক সুখই অন্তর্দ্ধান করে, তখন তাহাদের স্থলে আমরা কোন্‌গুলিকে ধরিয়া রাখিতে পারি ? যখন আমি চিত্তপ্রকর্ষের সেই প্রধান সম্পদগুলি স্মরণ করি, তখন সময়ে সময়ে মনে হয়, চিরকুমারী যাহারা তাহারা স্বর্গরাজ্য ব্যতীত আর কোন স্থানের যোগ্য অধিবাসিনী কি না ?

ঐ 'হেতায়েরা'-শ্রেণীর রমণীরাই ইচ্ছা করিলে স্বচ্ছন্দবিহারিণী-কুমারী-জীবনের সঙ্গে বিবাহিতা নারীর জীবনধারাও মিলাইয়া লইতে পারে ; একদিকে দায়িত্বহীন কর্ম্মহীন নিশ্চিন্ত জীবন, অপর দিকে সংসার-জ্ঞান, পরদুঃখকাতরতা ও মাধুর্য্যময় সহিষ্ণুতা। ইহাদের হৃদয়রঞ্জন করিবার জন্য প্রণয়ীর সংখ্যাও অল্প ছিল না ; তাহাদের যে-কোন একজনকে হৃদয়-দান, এবং অপর অনেককে অনুগ্রহভাজন করিবার কোন বাধাও ছিল না। ইহাদের অনেকেরই যেমন বাক্‌পটুতা তেমনই আনন্দ-সঞ্চার করিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল ; এবং রূপ-যৌবন অপেক্ষা ঐরূপ প্রখর বুদ্ধি ও আলাপের মোহিনীশক্তির দ্বারাই তাহারা সে যুগের সভ্যসমাজে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহারা সোক্রাতেস ও তাঁহার সহচরগণের সঙ্গে ছলা-কলা করিতেও ছাড়িত না, আবার প্লেটো কিম্বা এপিকিউরাসের পদতলে বসিয়া ইহারাই তত্ত্বকথা শ্রবণ করিত। আশা করি, আমি দেখাইতে পারিয়াছি যে, এই সকল গুণবতী 'হেতায়েরা'-কামিনীগণ তাহাদের প্রণয়ী ও ভক্ত পুরুষদিগের উপরে এইরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াই আথেনীয় সভ্যতার একটা উৎকৃষ্ট উপাদান যোগাইয়াছিল।

কেবল অত্যাচার করিবার ক্ষমতা থাকিলে—আমি তৎক্ষণাৎ শাসনকার্য্য ত্যাগ করিতাম। কিন্তু সেই স্বেচ্ছাচার-শক্তির সঙ্গে যদি হিত-সাধনের স্পৃহাও থাকে তবে আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হইবে—মানুষকে সভ্যতা-দান। তাহার জন্য সর্ব্বপ্রথম কাজ হইবে, সমাজে একটি অবসরভোগী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করা ;

তাহাদের প্রত্যেকের ঠিক যতটুকু প্রয়োজন তাহার অধিক তাহারা পাইবে না। আরও, আমি তাহাদিগকে নিজ নিজ আয়বৃদ্ধির কোন উপায় অবলম্বন করিতে দিব না। আমার দ্বিতীয় চেষ্টা হইবে—সমাজকে এমন ভাবে গঠিত করা যে, শ্রমজীবী ও নিম্নতর শ্রেণীর মানুষ যাহারা তাহারাও কর্ম্মান্তে এমন একটুকু অবসর পায়, এমন একটু স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে পারে—যাহাতে ঐ নিষ্কর্ম্মা-শ্রেণীর দ্বারা সেই যে উপকার, তাহার কিঞ্চিৎ অংশ পাইতে পারে। এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে, আমাকে দুইটি বিষয়ে তৎপর হইতে হইবে; এক, নব নব যন্ত্রের উদ্ভাবন—তাহাতে একটা মানুষের দ্বারা একশত মানুষের কাজ হইতে পারিবে; দুই, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে না দেওয়া। পরিশ্রম-লাঘবের কাজ ইতিমধ্যেই অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু উহার দ্বারা যে ধনবৃদ্ধি হয়, সেই ধনের দ্বারাই অধিকতর ধন স্তূপীকৃত করা হইতেছে; এই ধনরাশি যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইতেছে, নিকৃষ্ট আমোদ-প্রমোদেও তাহার অনেক অংশ নষ্ট হইতেছে, এবং অতিরিক্ত সংখ্যক সন্তানের পালনকার্য্যেও ব্যয় হইতেছে। জনগণ ক্রমাগত বংশবৃদ্ধি করিতেছে। বিজ্ঞানের বলে যখন এক জন যন্ত্রসাহায্যে একশত জনের কাজ করিতে পারিতেছে, তখন সেই পূরা একশত জনই, কিছুমাত্র অভাবগ্রস্ত না হইয়া, আরও অধিক সময় নিজের উন্নতিসাধনে লাগাইতে পারে। কিন্তু তাহা না করিয়া ঐ নিরানব্বই জনই সন্তান-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে; অতএব উদ্বৃত্ত সময়টা তাহাদের পিছনেই ব্যয় করিতে হয়; কাজেই তাহারা পূর্ব্বে যে অবস্থায় ছিল, এখনও ঠিক সেই অবস্থায় আছে, অর্থাৎ, বর্ব্বরের মত নিরবচ্ছিন্ন শ্রম-জীবনই যাপন করে। এ অবস্থায়, প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে কেবল এই হয় যে, তদ্দ্বারা ঐ বর্দ্ধিত জনসংখ্যার খাদ্যাভাব দূর করিবার জন্য সর্ব্ববস্তুর উৎপাদন সেই অনুপাতে বৃদ্ধি করা যায়। যতদিন ঐ সকল আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমান অনুপাতে বংশবৃদ্ধিও হইতে থাকিবে ততদিন সভ্যতালাভের আশা সুদূরপরাহত হইবে।

আমার রাজ্যে আমি সকলকে স্ব-স্ব ভাব ও চিন্তা-প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা দিব, তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনে পরীক্ষামূলক আচার-আচরণের অধিকারও দিব। কিন্তু ঐ আচরণ বাহিরেও করিবার অবাধ স্বাধীনতা থাকিবে না, কারণ সভ্যতার সহিত কর্ম্মনীতি-প্রচারের কোন সম্পর্ক নাই—সভ্যতা কর্ম্মগত নয়, তাহা মানসিক অবস্থা মাত্র। ইহাতে সেই সকল বর্ব্বর দুর্ভাগাগণ বড়ই মুস্কিলে পড়িবে, কারণ

তাহারা কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছু দ্বারা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। তথাপি, নানা রকমের কমিটিতে বসিয়া তাহারা বক্তৃতা করিতে পাইবে—তাহাও আমাদিগকে তাহাদের ইচ্ছানুরূপ কোন কর্ম্ম করাইবার জন্য নহে, কেবল তাহাদের সেই সব মতের সারবত্তা বুঝাইবার জন্য। এমন লোকদের কয়েক জনকে আমি পুলিশের চাকরি দিব। যাহারা জন্ম হইতেই চোর ডাকাত ও খুনে; যাহারা পর-হিতাকাঙ্ক্ষী, অতএব একশ্রেণীর দুর্জ্জন; অথবা, যাহারা এক-একটি হবু-নেপোলিয়ন, বা আইন-অমান্যকারী মহাপুরুষ;—সেই সকল ব্যক্তিকে আমি জেলে পুরিয়া রাখিব। কারণ, যে-কোন কাজ করিবার অবাধ স্বাধীনতা সভ্যনীতির বিরোধী। জগতে এমন কতকগুলা পরহিতব্রতী, ধর্ম্মান্ধ, লোভী, দুঃসাহসী ও হিংস্র মানুষ আছে যাহারা সুযোগ পাইলেই এমন সব কার্য্য করিবে যাহাতে আর সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, এবং সভ্যতা-সাধন দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। আমার রাজ্যে তাহাদিগকে কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না।

টলষ্টয়ের মত মনীষী এমন একটা জগৎ মনে মনে গড়িয়া থাকিতে পারেন, যেখানে প্রত্যেক মানুষ এমন সৎপ্রবৃত্তিসম্পন্ন হইবে যে, কাহারও স্বাধীনতায় বাধা দেওয়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সে জগতে লোভ হিংসা, ঈর্ষা বা অসৎ অভিলাষ কিছুই থাকিবে না; যদি বা কাহারও চিত্তে সেরূপ কুপ্রবৃত্তি থাকে সে তাহা আপনিই দমন করিবে। খুব সম্ভব টলষ্টয় ইহা জানিতেন যে, তেমন পশুপ্রকৃতির মানুষ সর্ব্বত্রই আছে ও থাকিবে; কিন্তু তিনি তজ্জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত ছিলেন না, কারণ, তাঁহার বিশ্বাস ছিল—আর সকলে যদি দেবতুল্য সদাচারী হয় তাহা হইলে ঐ দুর্জ্জনেরা কিছুই করিতে পারিবে না। * টলষ্টয়ের মতে মানুষ যদি কিছুমাত্র প্রতিরোধ না করিয়া, হাসিমুখে সকলই সহ্য করে, তাহা হইলেই তাহারা ঐরূপ দেবত্ব রক্ষা করিতে পারিবে। অবশ্যই তাহা পারিবে,—দেবত্বও অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়া যাওয়াই সম্ভব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জগতে সভ্যতা বলিয়া কোন বস্তুই আর থাকিবে না। যে ক্রীতদাস একটা বর্ব্বর-স্বভাব মনিবের শত অত্যাচার নীরবে সহ্য করে সেও ঐরূপ সাধু বা দুঃখজয়ী সন্ন্যাসী হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বগুণান্বিত সুসভ্য মানুষ হইতে পারিবে না। সমাজটা যদি দেবতা অথবা পশু এই দুইয়ের একটার সমাজ না হয়, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, স্বেচ্ছাচার দমন করিবার জন্য একটি কার্য্যকুশল পুলিশ-বাহিনী অত্যাবশ্যক না হইয়া পারে না।

* এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী টলষ্টয়ের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। অনুবাদক।

কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, পুলিসের কাজ যাহারা করে তাহারা কখনো পুরাপুরি সভ্য জীব হইতে পারিবে না। ঐ যে শক্তির প্রয়োগ—পরের উপরে জুলুম, উহা মানুষকে কতকটা বর্ব্বর করিয়া তুলিবেই। অতএব এই সকল কর্ম্মচারী সভ্যতা-রক্ষার জন্যই কিয়ৎ পরিমাণে অসভ্য থাকিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা যে প্রায় ব্যর্থ হয় তাহার কারণ—স্বভাবের দোষ নয়, বুদ্ধির দোষ। ইহার সাধ্যমত প্রতিকার করিতে হইলে ঐ শ্রেণীর লোকের মধ্যে, বুদ্ধির উন্মেষ ও সৎ-শিক্ষার জন্য কতকগুলি আচার-ব্যবহার প্রচলন করা আবশ্যক; এবং সমাজের যাহারা সভ্যতম তাহাদের পক্ষে এই কাজ দুরূহও হইবে না। আমি যদি হিন্দুদের মত অতি-উচ্চ সভ্যতার অধিকারী হইতাম, তবে এই পন্থাই অবলম্বন করিতাম। ঐরূপ ইতর শাসন-কর্ম্ম আমি বলিষ্ঠ-হৃদয় ইংরেজ যুবকের হাতেই ছাড়িয়া দিতাম; কিন্তু যেমন করিয়াই হোক, সেই সব প্রাণবান ইংরেজ-যুবকের বুদ্ধিটা একটু মার্জ্জিত করিয়া দিতাম।

যাহারা পূর্ণ-সভ্যতা লাভ করিয়াছে—অর্থাৎ যাহারা পূর্ণমাত্রায় মনের উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহারা আত্মরক্ষার বিষয়ে বড়ই নিরুপায়; তাহারা এমনই বেদনাপ্রবণ যে, উচিত মনে হইলেও কাহাকে আঘাত করিতে বা দণ্ড দিতে কাতর হয়। দেশের শাসনকর্তৃগণ যদি তাহাদের পক্ষে না থাকে, তাহাদিগকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে না করে, তাহা হইলে ঐরূপ ব্যক্তির বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব—থাকিতে হইলে বল-প্রয়োগ করিতে হইবে, এবং স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হইবে। আমি জানি, আমার প্রবন্ধের এই স্থানটি যাঁহাদের মনোমত হইবে না তাঁহারা এমন এক খ্যাতনামা কলাশিল্পীর নাম করিবেন যিনি কর্ম্মবীর বলিয়াও খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তেমন পাঠককে, আমি পূর্ব্বে অনেকবার যাহা বলিয়াছি তাহাই স্মরণ করিতে বলি, অর্থাৎ, বড় বড় কবি ও শিল্পীদের অনেকেই সভ্যতার দিক দিয়া খুব বড় ছিলেন না, হোমারও নয়, দান্তেও নয়, মিকেলাঞ্জেলোও নয়;—আর কত নাম করিব?

ঐ যে পুলিশ-বাহিনীর কথা বলিয়াছি, উহারা সভ্যতা রক্ষা করিবার জন্যই নিয়োজিত হইবে—লোকের উপরে তাহা চাপাইবার জন্য নয়। কতকগুলা মত মানিয়া লইলেই যদি সভ্য হওয়া যাইত, তাহা হইলে জোর করিয়া মানুষকে তাহা গিলাইয়া দেওয়া শক্ত হইত না। অপরকে সভ্যতা পাওয়াইতে হইলে, এমন

ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে সে নিজেই সেই উন্নত-জীবনের পথটি খুঁজিয়া লইতে পারে।

সভ্যতা-সৃষ্টির পূর্ব্বোল্লিখিত উপায়গুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও একটা বস্তুর অভাবে তাহা ঘটিয়া উঠিবেনা। সভ্য হইবার ইচ্ছা থাকাও চাই। সভ্যতালাভের ঐ ইচ্ছা মানুষের স্বভাবেই নিহিত আছে এবং চিরদিন তাহা সক্রিয় হইয়া আছে এমন বিশ্বাস যেমন অমূলক, তেমনই, উহা যে কখনো কোথাও ছিল না, এমন কথাও যথার্থ নহে। বরং বলা যাইতে পারে যে, ঐরূপ বাসনা মানুষের হইয়াছে, এবং সেই বাসনা কখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, মানুষের একটা ইচ্ছা সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে স্বভাবসিদ্ধ, ইহাকে মঙ্গল-ইচ্ছা, কল্যাণ-বুদ্ধি বলা যাইতে পারে ; ঐ সভ্যতালাভের ইচ্ছাটাও তাহার আনুষঙ্গিক, এমন ধারণাও হইতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, উপায় ও উদ্দেশ্য, সাধ্য ও সাধন এই দুইয়ের পার্থক্য নির্দ্ধারণ করা এতই দুরূহ, যে, যাঁহারা সত্যফলপ্রদ সৎকর্ম্ম-নীতির উপাসক তাঁহারা প্রায়ই শ্রেয়-বস্তুর পরিবর্ত্তে তাহার উপায়গুলাকেই আসলবস্তু বলিয়া মনে করেন, এমন কি, যে-সকল প্রথা বা উপায় একালে একেবারে অচল, তাহাকেও মহামূল্য বিবেচনা করেন। এই জন্য মঙ্গল-ইচ্ছাও সব সময়ে সফল হয় না, সফল হওয়া ত' দূরের কথা, উহাই সভ্যতালাভের গুরুতর অন্তরায় হইয়া থাকে।

ঐ হিতসাধনের নৈতিক উৎসাহ বা ইচ্ছাশক্তি ইংলণ্ডে প্রচুর পরিণামে আছে, আমি ইহাকে একরূপ বিকৃত শুভ-কামনা বলিব। কিন্তু সেই সঙ্গে সভ্যতা লাভের ইচ্ছাও কি আছে? এ যুগের প্রবৃত্তিই অন্যরূপ ; এখন সর্ব্ববিধ শ্রমকর্ম্মই ধর্ম্মের ন্যায় পবিত্র হইয়াছে। আবার এমন ধারণাও হইয়াছে যে, মনুষ্যজন্ম সার্থক করিতে হইলে এই কয়টি মহৎকর্ম্ম করা চাই, যথা—টাকা-উপার্জ্জন, নানা রকমের খেলা, সিনেমা-দেখা, রেস (Race) এর মীটিঙ গুলাতে হাজির-থাকা, মোটর-চড়া, এবং পুত্রকন্যার জন্ম দেওয়া। অর্থ যাহারা উৎপাদন করে ইহাই তাহাদের ধর্ম্মমন্ত্র—এমন মন্ত্র যাহাদের তাহাদের সভ্যতালাভের ইচ্ছাই নাই—অথচ যথেষ্ট সামর্থ্য আছে।

ইংলণ্ডের শাসন-তন্ত্রে দুই দলই কোনক্রমে স্বার্থের মিল করিয়া লইয়াছে—একদল যাহারা অধিক ধন উপার্জ্জন করে, এবং অপর দল যাহারা অল্প উপার্জ্জন করে। উহা ধনিক-তন্ত্রই বটে, কিন্তু শ্রমজীবী-সমাজ একতাবদ্ধ হইয়া উহার

প্রভুত্ব কতকটা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তথাপি রাষ্ট্রিক ব্যাপারগুলিতে ধনিক প্রভুরাই অনেকখানি কর্ত্তৃত্ববজায় রাখিয়াছেন, বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হইয়া থাকে। সে ইচ্ছা যে কেমন তাহা জানিবার জন্য বেশিদূর যাইতে হইবে না—দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিতেই তাহার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাহাদের জীবনের ইষ্ট কি, আদর্শ কি—ঐ পত্রিকাগুলি হইতে তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। লোকেও তাহাই চায়, তাহাদের মতে উহাই সভ্যতার লক্ষণ। এই সভ্যতারক্ষার জন্যই তাহারা একবার ঐ ধনিক প্রভুদের পক্ষে লড়িয়াছিল, আবশ্যক হইলে আবার উহার জন্যই লড়াই করিবে, এবং তাহাতেই পরম সুখ লাভ করিবে। ছোট ও বড় ধন-পিপাসুদের মধ্যে এই যে একটা মিত্রতাবন্ধন, ইহাও অতি কষ্টে রক্ষা করিতে হয়; এই জন্যই যখন-তখন বিপ্লবের কথা শুনিতে পাই। সবচেয়ে মজার কথা এই যে, এমন মানবহিতৈষী সাধুপুরুষও সবসময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা ঐরূপ বিপ্লবকে মঙ্গলপ্রসূ বলিয়া থাকেন। তাঁহারা এই বলিয়া আমার মত ব্যক্তিকে আশ্বাস দেন যে, "জনগণ যদি একবার তাহাদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়া পায়, তবে তোমার ঐ সভ্যতা-লাভের স্বপ্ন এক মুহূর্ত্তে সফল হইবে। জনগণ সত্য ও শুভকে চিরদিন পূজা করিয়াছে—যাহা মহৎ তাহাকে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছে; অতএব তুমি যাহা চাও তাহা এই পথেই মিলিবে।"

আমি কিন্তু এপর্য্যন্ত দেখি নাই যে, ইংলণ্ডের ঐ জনগণ—যাহারা শীঘ্রই শাসন কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব লাভ করিবে সেই জনগণ—সভ্যতালাভের যে উপায়গুলি হাতের কাছেই রহিয়াছে, সেইগুলিকে কাজে লাগাইবার জন্য অতিমাত্রায় উৎসুক হইয়াছে। সভ্যতালাভের ইচ্ছা ত' দূরের কথা, আমি বরং স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, ব্রিটিশ শ্রমজীবীগণ তাহাদের ঐ বর্ব্বর-সুলভ জীবনই সমধিক পছন্দ করে। আসল কথা, ধনপতি ও তাহাদের দাস ঐ শ্রমিক, ইহাদের মধ্যে কেবল একটি বিষয় ছাড়া, আর কিছুতেই মতবিরোধ নাই—উৎপন্ন অর্থের বখরা লইয়াই যাহা কিছু বিবাদ। বিপ্লববিরোধী মালিকেরাও যেমন জীবন পছন্দ করে—তাহাদের আদর্শ যেমন, কয়লার খনির বিপ্লবপন্থী মজুরেরাও তদপেক্ষা কোন বড় আদর্শ মনে মনে পোষণ করে না। তাহারাও সেই এক স্বর্গসুখের জন্য লালায়িত—ছোট হাজিরার আগে 'রম' ও দুগ্ধ; বড়-হাজিরার চারিটি উপচার থাকিবে—শ্যাম্পেন ও পরে একটি বড় সিগার; রাত্রে সিনেমা অথবা সঙ্গীত-বাসর; অবসর

বিনোদনের জন্য মেরী করেলির নভেল কিম্বা 'জনবুল' 'ষ্ট্র্যাণ্ড-ম্যাগাজিন' প্রভৃতি মাসিক-পত্রিকা; বিবাহ-বন্ধনটা যে অতিশয় পবিত্র এইরূপ একটা মত দৃঢ়ভাবে পোষণ করা মাত্র; বিদেশী লোক, আর্টিষ্ট এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রতি একটি আন্তরিক অশ্রদ্ধা। জীবন-যাত্রার এই যে আদর্শ, ইহা বিল জোন্‌সেরও যেমন, লর্ড মেডেনহেডের তেমনই পরম প্রীতিকর। ইহারই জন্য সে বিপ্লব করিতে চায়। বর্ব্বরতার ঐ সুপক্ক বদরীফলটি ভক্ষণ করিবার জন্য জোন্‌স্ ও তাহার মনিবের মধ্যে এই যে মারামারি, ইহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। উহা একান্ত ভাবে উহাদেরই মামলা। এমন কোন উচ্চতর নীতির সমস্যা উহাতে নাই যে বাহিরের লোকও উহাতে কোনরূপ আগ্রহ বোধ করে। সভ্যতার জন্য যাহারা কিছুমাত্র চিন্তিত, তাহাদের নিকটে এমন ভাবনা—নিতান্তই তুচ্ছ যে—কে কয়খানা মোটর রাখিবে বা কে কয় বোতল মদ বেশী সংগ্রহ করিতে পারিবে। ধনতন্ত্রবাদী ও ট্রেড-ইউনিয়ন-বাদী উভয় দলই একেরই এ-পিঠ আর ও-পিঠ। উভয়পক্ষই নির্ব্বোধ, কুরুচিগ্রস্ত, সুশীল ও সুবোধ, ভাবপ্রবণ, লোভী, এবং সর্ব্বপ্রকার রসবোধ-বর্জ্জিত। যেহেতু দুই দলই নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট, অতএব কোনরূপ পরিবর্ত্তন কামনা করিবে কেন? সিংহল দ্বীপের 'ভেদ্দা'জাতি, অথবা আফ্রিকার উপকূলবাসী 'মেগে' জাতিরও যদি সভ্য হইবার বাসনা থাকে, তথাপি ষ্টক এক্সচেঞ্জের (Stock Exchange) কিংবা ট্রেড-ইউনিয়ন-কংগ্রেসের কাহারও মধ্যে তেমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

এক-বক্তার বৈঠক

[মার্কিন লেখক অলিভার ওণ্ডেল হোম্‌স্‌ (Oliver Wendell Holmes)—রচিত The Autocrat of the Breakfast Table—নামক বিখ্যাত পুস্তক হইতে সংকলিত। রচনাটি Table Talk বা বৈঠকী আলাপের ভঙ্গিতে লিখিত হইয়াছে, আমাদের রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' সম্ভবতঃ ইহারই আদর্শে রচিত—যদিও সেখানে একের বদলে পাঁচজন বক্তা। এই রচনাটিরও স্থান, কাল ও পাত্র আছে। স্থান—একটি বোর্ডিং-বাড়ীর প্রাতরাশ-কক্ষ; কাল—প্রতিদিন ঐ প্রাতরাশের সময়; পাত্র—বোর্ডিঙের সহবাসিগণ। ইহাদের মধ্যে বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে যিনি সকলের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাভাজন তিনি প্রায় একাই সমস্ত আলাপটি চালাইয়া থাকেন, মাঝে মাঝে কেহ প্রশ্ন বা মৃদু প্রতিবাদ করে মাত্র। অতএব আলাপটা এক-তরফা, কিন্তু উক্তিগুলি এমনই মৌলিক ও সরস যে সকলেই তাহা আগ্রহ সহকারে শ্রবণ ও উপভোগ করে। বক্তা ঐ আলাপগুলিই পরে পত্রিকায় পাঠাইয়া দেন। ঐরূপ Autocrat-এর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া লেখক সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীন মত ব্যক্ত করেন—সে যেন তাঁহার মনের স্বচ্ছন্দ-বিচরণ—কথা বলিবার আনন্দেই কথাগুলি বলিয়া যাইতেছেন।]

(১)

—সেবার কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম, কি একটা বাধা পড়ায় বলা আর হয়নি। বলছিলাম, মানুষের মনোধর্ম্ম অনুসারে যতরকম শ্রেণীভাগ করা যায়, তার মধ্যে একটা হচ্ছে—কোনটাকে পাটীগণিত, আর কোনটাকে বীজগণিতের কোঠায় ফেলা। যত হিসেবী, কেজো বুদ্ধি আছে, সে হ'ল পাটীগণিতের এই সূত্রটির রকমফের মাত্র—২ + ২ + ৪ ; আর যে-বুদ্ধি দার্শনিক প্রকৃতির, সে চলে বীজগণিতের এই ছাঁদে —ক + খ + গ। যতদিন না আমরা সংখ্যার বদলে ঐরকম বর্ণমালার সাহায্যে চিন্তা করতে শিখব ততদিন এক-একটা কাজ-চালানো যন্ত্রমাত্র হয়ে থাকব—যেমন স্থূলদর্শী, তেমনি অহংমন্যমান।

শুনে সবাই হাঁ করে রইল। একটি ছোকরা নতুন এসেছে, সে এখনও ছাত্র—ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করছে। তাকে উদ্দেশ করেই আমি ঐ রকম সব মন্তব্য করি। আমি তাকে অধিকারও দিয়েছি আমার সঙ্গে আলোচনা করবার—অবিশ্যি যদি সে সবকথায় সায় দেয়, এবং কোন অসংগত প্রশ্ন করে না বসে। কিন্তু এবার সে তার সেই অধিকারের অন্যায় সুযোগ নিয়ে ব'লে উঠল—আমার ঐ কথাটা নাকি লাইবনিজ (Leibnitz) অনেক আগেই ব'লে গেছেন।

—আজ্ঞে না মশাই, তিনি বলেন নি। তিনি গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক

বড় বড় কথা বলেছেন—যার কোনটা ঐ রকম শোনায় বটে; আর তুমিও মূল বইখানাতে ওটা পড়নি—পড়েছ ডাঃ টমাস রীডের বইতে, তিনি উদ্ধৃত ক'রে দিয়েছেন ঐ কথাটা। লাইবনীজ কি বলেছেন সে আমি এইসভায় আরেকদিন ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেবো।

—কি বললেন? আমি সেই সভার একজন সভ্য কিনা, যারা পরস্পর কেবল নিজেদেরই প্রশংসা করে? অর্থাৎ, যার নাম 'অন্যোন্যতোষিণী সভা'? না বাপু, আমি স্বীকার করতে লজ্জিত হচ্ছি যে, এখন আমি আর তা' নই—অন্ততঃ এইখানে, এইক্ষণে। কিন্তু একসময়ে আমার সে সৌভাগ্য হয়েছিল; সে ছিল সেই প্রথম গুণিগণ-সভা যাকে দুষ্টলোকেরা ঐ নাম দিয়েছিল। বিদেশের একটা বড় শহরে কয়েকজন বিজ্ঞান-সেবী যুবক মিলে একটি আড্ডা স্থাপন করেছিল, তারা তাদের আচার্য্যকেও যেমন, তেমনই পরস্পরকে কিছু বেশি পরিমাণ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতো। তেমন শ্রদ্ধার উপযুক্তও ছিল তারা—পরে অনেকেই বিখ্যাত হয়েছে।

যত উদারচেতা শিল্পী, গ্রন্থকার, সমাজহিতৈষী, বিজ্ঞানী ও পণ্ডিত—সকলেরই উচিত ঐ রকম 'অন্যোন্যতোষিণী সভা'র সভ্য হওয়া। যার নিজের প্রতিভা আছে বা কোন একটা বিশেষ গুণে যে গুণী সে আরেকজন গুণীকে শ্রদ্ধা করবে না কেন? সেই অপর ব্যক্তিও যদি ফিরে' তাকে শ্রদ্ধা করে তাতেই বা দোষ কি? বরং তেমন কয়েকজন মানুষ যদি কোন একটা জায়গায় নিয়মিত মিলিত হ'য়ে পরস্পরের গুণকীর্ত্তন করার অভ্যাসটা বজায় রাখে তো আরো ভালো! ঐ যে ইঙ্গিত করা হয়, ওর মূলে আছে কতকগুলো ভুল ধারণা। প্রথমতঃ, যারা সত্যিকার গুণী ব্যক্তি তারা নাকি আর কারো প্রশংসা করতে চাইবে না। দ্বিতীয়তঃ, বেশি মেলামেশা করলে শ্রদ্ধাটা আপনিই কমে আসে। তৃতীয়তঃ, ঐরকম প্রখর বুদ্ধি যাদের তারা যখন একটা আড্ডায় একত্র হয় তখন বুঝতে হবে, তারা নিশ্চয় একটা নিয়ম করেছে যে, কেবল ঐ ক'জনই পরস্পরের গুণগান করবে, এবং বাইরের সবাইকে ছোট করাই তাদের উদ্দেশ্য। চতুর্থতঃ, আর কেউ যদি তাদের দলে যোগ দিতে চায়, তবে সে-ও একটা ঘোরতর আস্পর্দ্ধা।

শ্রোতারা সবাই খুব হাস্‌তে লাগল। যে বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঠিক সামনে বসেন তিনি ব'লে উঠলেন—ঠিক! ঠিক!

আমি বলে যেতে লাগলাম—আমার তখন কথা বলবার একটা ঝোঁক এসেছে। হ্যাঁ, এক গুণীব্যক্তি অপরকে ঈর্ষ্যা করে বলে একটা ধারণা আছে বটে; আমার মনে হয়, সাধারণের চেয়ে কোন এক বিষয়ে যাদের একটু বেশি জৌলুস থাকে, তাদের কেউ কেউ যে অমন করে না, তা নয়। জৌলুস্ সত্ত্বেও, আশানুরূপ সাফল্যলাভ করতে না পেরে তাদের মেজাজ রুক্ষ হয়ে ওঠে, স্বভাবটা বিগড়ে যায়। যারা খুব সাদাসিধে, সাধারণ স্তরের মানুষ— কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই যাদের, তারা বেশ আছে; আবার, প্রতিভাবান্ যারা তারা তো সগৌরবে বিরাজ করে। কিন্তু যে লোকটা আসলে কিছু নয়, একটা তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ —তার গায়ে যদি প্রতিভার একটু গন্ধ থাকে, তবে তার মতো ঘৃণ্য জীব আর নেই—পরিষ্কার সাদা জলে মদের গেলাস-ধোয়া জল মেশালে যেমন হয়, তেমনি নোংরা। সাধারণ সাদাসিধে মানুষের যে একটি চমৎকার গুণ-সাম্য আছে— ঐ রকম প্রতিভার ছিটেফোঁটা লেগে তা' নষ্ট হয়ে যায়। তারা যখন, একজন আরেকজনের একখানা প্রকাণ্ড উপন্যাস, কিমাকার ছবি, কিম্বা নিতান্ত মামুলী কোন কাব্যের উচ্চ প্রশংসা করে, তখন বুঝতে হবে, সেটা সত্যি ভালোলাগার প্রমাণ নয়—পরস্পরের মধ্যে, এবং প্রকাশক ও দোকানদারের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছে।

* * *

—যাদের মন খুব প্রশস্ত তারা, তোমরা যাকে বল বাস্তব-সত্য, তার নামে শিউরে উঠে। খাঁটি ভাব-চিন্তার রাজ্যে সে যেন একপাল জানোয়ারের উপদ্রব! এমন একজাতের মানুষ কেনা দেখেছে—যারা ঐ রকম দু'চারটে 'সত্য'-রূপী বুল-ডগ সর্ব্বদা সঙ্গে নিয়ে বেড়ায়? কোন সজ্জন-সভায়, যেই একটা তত্ত্বের কথা, রসের কথা, রঙীন কল্পনার কথা জমে' উঠেছে, অমনি ঐরকম একজন এসে দিলে তার সেই বুল-ডগটাকে ছেড়ে! না; সত্যিই কি ঘটে, বা না-ঘটে সে সব আলোচনা আমাদের এখানে চল্‌বে না। কী!—রুটি জিনিষটা খুব সুখাদ্য, স্বাস্থ্যকর, এবং পুষ্টিকর ব'লে—তার একখণ্ড আমার এই কথা বলবার সময় তুমি আমার বাক্‌যন্ত্রটার মধ্যে গুঁজে দেবে! আমার এই চিন্তাগুলো কি ঐরকম দশহাজার রুটির টুকরো—যার নাম বাস্তব-সত্য—তার সারেরও সার-অংশ নয়? অথচ তাই দিয়ে তুমি আমার এই বাক্যস্রোত বন্ধ ক'রে দেবে!

—এই যে কথা বলা—এ একটা যে-সে কাজ নয়! এমন শ্রোতাও আছে

যার সঙ্গে একঘণ্টা বক্‌লে যতটা দুর্ব্বল হয়ে পড়তে হয়—সারাদিন উপোস করলেও তেমন হয় না। আমি এখনি যে কথাটি বলতে যাচ্ছি, তা' সকলেরই ভাল ক'রে শুনে রাখা উচিত, কারণ কোন উকীল বা ডাক্তারের কাছে পয়সা দিয়ে যে ব্যবস্থা বা পরামর্শ নিতে হয় আমার এই কথাটা তার চেয়ে কম মূল্যবান নয়, অথচ তার জন্যে তোমাদের গাঁট থেকে এক পয়সাও খরচ করতে হচ্ছে না। সেটা হচ্ছে এই যে, যদি তোমার শিরা কেটে কেউ এক পাঁইট রক্ত বে'র করে নেয় সে-ও ভালো, কিন্তু তোমার স্নায়ুর থেকে যদি এক বিন্দু স্নায়ু-রস যখন একটা কোন ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যায়, তখন কেউ তা মেপে দেখতে পারে না, মাথার সেইখানটায় কেউ ব্যাণ্ডেজ বেঁধেও দেয় না।

—এমন উজ্জ্বল প্রকৃতির লোকও আছে যাদের কথা শুনতে বসে লোকে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। সে রকম বক্তার মন যেন কেবলই ছিট্‌কে ওঠে—তাদের চিন্তাস্রোত কোন সমসূত্রে একটা পরম্পরা রক্ষা ক'রে চলতে পারে না। নানা বিষয়ে তারা এমন সব চমৎকার মন্তব্য করবে যে শুনে মুগ্ধ হ'তে হয়, কিন্তু বিষয়গুলো এমন খাপছাড়া যে পাল্লা রাখতে গিয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। এমন মানুষের আলাপ কিছুক্ষণ শোনবার পর একজন বোকাগোছের বন্ধুর সঙ্গে কথা কইলে ভারি আরাম বোধ হয়—সে যেন একটা কাঠবিড়ালীকে অনেকক্ষণ ধরে থাকবার পর পোষা বিড়ালটাকে কোলে নেওয়া।

—সময়ে সময়ে বোকা অথচ শান্তশিষ্ট মানুষকে কি ভালোই লাগে! গ্যাসের আলোর উপরে একটা ঘসা-কাঁচের ঢাকনা দিলে চোখ যেমন জুড়িয়ে যায়—মনের পক্ষে এরকম মানুষ তেমনি তৃপ্তিকর।

বোর্ডিং-বাসিনী একটি মহিলা বলে উঠলেন, আচ্ছা বোকা লোকদের সঙ্গে আলাপ ক'রে বিরক্তি ধরে না? এই মহিলাটিই গত সপ্তাহে আমাকে তাঁর অটোগ্রাফ-বই পাঠিয়েছিলেন—আমি যেন তাতে আমার নতুন কবিতা দু'চার ছত্র লিখে দিই। একথা তাঁর মনে হয়নি যে, শহরের একখানি সম্ভ্রান্ত পত্রিকা আমার রচনার প্রতিছত্রের জন্য পাঁচ ডলার মূল্য দেয়।

বললাম—মহাশয়া, (মেয়েটির বয়স কুড়ির নীচে), সকলেরই সঙ্গ বিরক্তিকর ঠেকে, যদি সে অসময়ে অযাচিতভাবে আসে। কেবল একটি মাত্র মানুষকে আমি আমার ঘরে ঢুকবার চাবিটি দিয়েছি।

'সেই ভাগ্যবান মানুষটি কে ?'
'নাম করলে চিনতে পারবেন না'।

—আমি যে ধরণের প্রতিভাশালী পুরুষ পছন্দ করি তাদের মাথা সর্ব্বদা খাড়া হয়েই থাকে—যেন সাপের ফণা। মনে হয়, যেন দেহের সব রক্ত মাথায় ঠেলে উঠেছে। একজন বিখ্যাত লেখক ও বক্তা একবার আমায় বলেছিলেন, তিনি লেখবার সময়ে তাঁর পা'দুটো গরম জলে ডুবিয়ে রাখেন, নইলে সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে যেতে পারে—যেমন থার্ম্মোমিটারের পারা সময়ে সময়ে তার 'বল'টার ভিতরে চ'লে যায়।

—তোমরা কি মনে কর, তোমাদের টেবিলে বসে আমি যে সব কথা বলছি, সেগুলো ডাক-টিকিটের মত? একবার বই দু'বার ব্যবহার করা যাবে না? যদি তাই মনে কর, তবে সে একটা মস্ত ভুল! যে লোক কোন কথা দু'বার বলতে পারে না তার চিত্ত বড়ই দীন। তাতে দোষ কি? যে সব চিন্তা মানুষ সঙ্গে নিয়ে বেড়ায় সেগুলো তার যন্ত্রপাতির সামিল। তোমরা কি বলতে চাও, ছুতোর মিস্ত্রী তার র‍্যাদাখানা কেবল একটা তক্তা পালিশ করেই তুলে রাখবে, না, সেখানা সে আর ব্যবহার করবে না? না, তার হাতুড়ি দিয়ে সে কেবল একটা পেরকই বসাবে? অবিশ্যি একটা আলাপই আমি দু'বার করব না, কিন্তু আমার চিন্তাগুলোকে যতবার ইচ্ছে কাজে লাগাবো। এমন চিন্তাও আছে, শতবার পুনরাবৃত্তি করলেও যার জৌলুস কমে না। চিন্তাটা এক হ'লেও, প্রতিবার সে একটা নতুন পথে নতুন ভাবধারা সঙ্গে নিয়ে আসে।

* * *

—যতই বলনা কেন, মানুষমাত্রেরই একটু অহমিকা আছে, সেটা কিসের মত জানো? সামুদ্রিক পাখীদের পালকে একটা আঠার মত পদার্থ আছে—সেই রকম। ঐটে থাকার দরুণ ওরা অনায়াসে বৃষ্টির জল ঝেড়ে ফেলতে পারে, সমুদ্রে ডুব দিলেও গায়ে জল লাগে না। মানুষের ঠিক তেমনি; তার মনের ঐ অহমিকাটুকু যদি মুছে দেওয়া যায়, যদি তার মন থেকে আত্মগরিমার সুখ এবং তার যতকিছু মোহ নিষ্কাসন করা হয় তা'হলে বেচারীর পাখা-দুখানি ভারি হবে ; সে আর উড়তে পারবে না।

শুনে একটি মেয়ে বলে উঠল "আপনি তা'হলে ঐরকম অহঙ্কার থাকা ভালো মনে করেন?" মেয়েটি সন্থ দেশ থেকে শহরে এসেছে, এইবার তার একটা হিল্লে করা হবে—যাতে সে অতঃপর সংসারী হয়ে সংসার-ধর্ম্ম পালন করতে পারে।

—না বাছা! তুমি স্কুলে নিশ্চয় লজিক পড়নি। আমি যদি বলি যে, আমি সমুদ্রের লোনা জলে স্নান করতে ভালবাসি, তার থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, আমাকে নূনে জড়িয়ে রাখলে আমি খুব আরামে থাকবো। আমার বক্তব্য এই যে, মানুষের ঐ অহমিকাটুকু থাকা ঠিক সেইরকম স্বাভাবিক— যেমন, বৃত্ত হ'লেই তার একটা কেন্দ্র-বিন্দু থাকবেই। তাই বলে' বৃত্তটার বড় হ'তে বাধা নেই। যাদের মন ছোট, তাদের চিন্তাগুলোও এত ছোট পরিধির মধ্যে ঘোরে যে, পাঁচ মিনিট কথা কইলেই, তাদের কথার সেই বৃত্তাংশটুকু থেকেই সমস্ত বৃত্তটা আন্দাজ করতে পারবে। কিন্তু যে-মন খুব প্রশস্ত, তার সেই বৃত্তটার ছোটছোট অংশগুলো সরল রেখার মতই মনে হবে; তাদের সেই কেন্দ্র-মুখী বক্রতা চোখে পড়ে না। যে চিন্তা যত বড়, ততই তা' ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে যায়—ব্যক্তির সেই 'অহং'-রূপ কেন্দ্রবিন্দুর কথা মনেই আসে না।

অতিশয় উগ্র আত্মগরিমারও একটা মহত্ত্ব আছে—যদি তার বিশেষ কারণ থাকে। আবার, ঐ যে একটু অহমিকা সামান্য মাত্রায় সকলেরই থাকে, তাতে ক'রে মানুষের মনটা খুসী থাকে। যে মানুষ মনে করে, তার স্ত্রী, তার ছেলে, তার ঘোড়া, তার কুকুর এবং সে নিজেও যেমনটি তেমনটি আর কেউ বা কারো নয়, সে মানুষ বড় খোস-মেজাজী হয়, যদিও সময়ে সময়ে তার কথাগুলো অপরের পক্ষে একটু নীরস ঠেকে।

—কারো কারো আলাপ নীরস, এমন কি দুঃসহ হয়ে ওঠে—কিন্তু কি কারণে? তোমরা হয়তো বলবে—চিন্তার দৈন্য, ভাল ক'রে বলতে না-জানা, আর শিষ্টতার অভাব। আমি তা' মানি। কিন্তু এগুলো ছাড়া আরও এমন একটা কারণ আছে যার জন্যে অধিকাংশ আলাপ মাটি হয়ে যায়। হয়তো বিষয়টার সম্বন্ধে গোড়াতেই মতের অমিল আছে; তবু তার কয়েকটা ফ্যাকড়া নিয়ে বাদ-বিতর্ক করছে। যদি কয়েকটা মূল তত্ত্বের উপর দুজনেরই সমান বিশ্বাস না থাকে, তবে মনের সেই সহজ সম্বন্ধ স্থাপন হয় না, যা' না হলে আলাপ করাই বৃথা। যা নিয়ে যে কথা বলছ তার সূত্রগুলো সেই মূল বিশ্বাসের সঙ্গে কোথায় কেমন করে যুক্ত হয়ে আছে—সে বোধশক্তিও থাকা চাই। আলাপ

জিনিসটা হচ্ছে তানপুরো-বাজানোর মত, সুরটা ঠিকমত আদায় করতে হ'লে তারগুলোতে যেমন টঙ্কার দিতে হয়, তেমনি আবার সেই টঙ্কারের কাঁপুনি থামাবার জন্যে আঙ্গুল দিয়ে টিপে ধরতেও হয়।

—আজকালকার লেখায় শব্দ বিশেষের অর্থ ওলট-পালট করে দেওয়ার যে বাহাদুরী প্রায় দেখতে পাওয়া যায় - সেটা ভাল কি মন্দ, তোমরা বোধ হয়, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারোনি। ও বিষয়ে একটা সত্যিকার নীতি হচ্ছে এই। মানুষের প্রাণ যেমন অবধ্য, ভাষার প্রাণও তেমনি অবধ্য ; নর-হত্যা এবং বাক্-হত্যা, অর্থাৎ কিনা—শব্দের উপর সেই অত্যাচার যার ফলে তার প্রাণস্বরূপ অর্থটা নষ্ট হয়—দুই-ই সমান অপরাধ। যে শব্দগুলো দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সমাজ-ব্যবহার বজায় থাকে, তাদেরকে খেলার বস্তু ক'রে তুললে, ঐ যে মানুষে-মানুষে বুদ্ধির একটা কারবার—যার বিনিময়-মুদ্রা হচ্ছে ঐ কথাগুলো—তার সাধুতা আর থাকে না।

—কি বললেন আপনি?—কেবল সূক্ষ্মতর্ক-শক্তির দ্বারা কোন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কিনা? আমি বলব, যাকে গাধা পারকরার সাঁকো (Ass's bridge) বলে, ওর দ্বারা কেবল সেই সঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়া যায়। যারা বুদ্ধিমান তাদের পার হবার জন্যে ঐ রকম সাঁকো না থাকলেও চলে—নিজেরাই পার হ'তে পারে। লজিক বা তর্কশাস্ত্রকে উকিলের মত খাড়া ক'রে, তুমি যা' প্রমাণ করতে চাও তাই প্রমাণ করতে পারবে। এমনও প্রমাণ করতে পারো যে, নেপোলিয়ন ব'লে কোন লোকই ছিল না, কিম্বা অমুক যুদ্ধটা কখনো ঘটেনি। খুব বড় তার্কিকদেরও এমন অখ্যাতি আছে যে, তারা কোন বিষয়ে সত্যিকার বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেনি—কাণ্ডজ্ঞান বলে কোন বস্তুই তাদের ছিল না। কোন বিষয়ে পরামর্শ নেবার জন্যে একজন পাকা দাবা-খেলোয়াড়ের কাছে যেমন—ঐ রকম তর্কবীরের কাছে যাওয়াই তেমনি।

—কোন বিষয়ে অপর একজনের মত জানতে হ'লে প্রথমে তো নিজেই বিচার করতে হয়, কার কাছে যাবো। তাতে কি বুদ্ধির দরকার নেই? সেই বুদ্ধি দিয়ে নিজেই তো স্থির করতে পারি - কি করা উচিত। মোটের উপর, কার কেমন বুদ্ধি, শেষ পর্য্যন্ত সে বিচার আমিই করে থাকি—ঐ লোকটার মতের সঙ্গে আমার মতের তুলনা ক'রে। অতএব মতটা কার, সেইটির উপরেই মতের শ্রেষ্ঠতা নির্ভর করে না। ঐ দুয়ের একটা আমাকেই করতে হয়।

অতএব মতটা আসলে আমারই—আমি তাই মেনে চলি। আর কারো চিন্তা আমার চেয়ে বড় বা গভীর হ'তে পারে—স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলে' আমার মতটা যে বদলাবো তা'ও নয়; তা যদি করি, তা হ'লে যে-কোন আমার-চেয়ে-বুদ্ধিমানের হাতে নিজেকে সবসময়ে ছেড়ে দিতে হয়।

—আজ সকালে আর বেশী বকাবকি না ক'রে যদি তোমাদের কিছু কবিতা শোনাই তো কেমন হয়? অবিশ্যি শেষে সমালোচনার ছলে লেখকের কিছু মন্তব্যও থাকবে। কেহ যদি ইচ্ছে করেন—উঠে যেতেও পারেন।

তারপর একটি কবিতা পড়লাম। শেষ হ'লে গৃহস্বামিনীর কন্যা জিজ্ঞেস করলেন, "ওটা কি একেবারে একটানা লিখেছেন?" [বয়স উনিশের কিছু বেশি; সোনালী চুল; চোখ দুটি বেশ নরম; পাক দিয়ে কুঞ্চিত-করা দীর্ঘ কুন্তল লতিয়ে পড়েছে দুই দিকে; বুকের পিন্‌টিতে একটি ছোট্ট খোদাই-এর কাজ-করা পাথর; লকেট, ব্রেসলেট, অ্যালবাম, অটোগ্রাফ-বই; গান করবার জন্যে একটি তারের যন্ত্র; বায়রণের কবিতা পড়েন; ওদিকে মা রান্নাঘরে বসে' পুডিং তৈরী করেন। কিছু বললেই সবসময়ে ব'লে ওঠেন—'তাই নাকি'?]

—হাঁ, বাছা, একটানা বটে, আবার না-ও বটে। সাতটা স্ট্যাঞ্জার মধ্যে পাঁচটা আপনি এসে পড়েছিল, বাকি দুটো লিখতে এক হপ্তা লেগেছে, অর্থাৎ ওঁরা দুজন নিতান্ত অনাথ-অসহায়ের মত, ছেঁড়া পোষাকে ও মিলহীন অবস্থায়—ডেস্কের ধারে অতদিন ঘোরাঘুরি করেছিলেন। সব কবিদের মুখেই ঐ এক কথা শুনতে পাবে। জানোই তো, দেখা করতে আসে যে সব লোক তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে যে, কাজ শেষ হ'য়ে গেলেও ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার বেলায় ভারি মুশ্‌কিলে পড়ে—কেমন যেন উঠি উঠি করে'ও উঠতে পারে না; অথচ তারাও যেতে চায়, তুমিও বিদেয় করতে চাও। তেমনি, এমন কবিতাও আছে যারা দেখা করতে আসে ঐরকম গেঁয়ো ভদ্র-লোকের মত, তাদের বিদেয় করা বড় শক্ত। এলো বেশ সহজেই; কাজে লাগবার মত যতগুলো মিল ছিল, যেমন—মনে-বনে, চাঁদ-ফাঁদ; স্মরণ-বরণ, নদী-যদি, যাহার-তাহার—সব এসে গেল; এমনি চলল কিছুদূর, পরে বেশ বুঝতে পারা গেল, আর নয়, এখন গুটিয়ে নেবার সময় হয়েছে; কিন্তু কিছুতেই সেটা হ'য়ে ওঠে না—যতই রাজী থাকো না কেন। কাজেই লেখাটা প'ড়ে থাকে ঐভাবে; তারপর ক্রমে তার সেই চেহারা এমন অসহ্য হয়ে ওঠে যে,

তখন সেই আগন্তুক ভদ্রলোকটিকে একটা যেমন-তেমন দু'ছত্র পয়ারের ঠেলা দিয়ে বিদেয় করতে হয়। আমার তো বিশ্বাস, যে সব কবিতাকে স্বয়মাগত ব'লে প্রচার করা হয় তাদের অধিকাংশের গমনাগমন ঐভাবেই হয়ে থাকে।

কন্যাটি ব'লে উঠলেন, "তাই নাকি?"

*　　　*　　　*　　　*

—কি কথা হচ্ছে? যারা 'self-made men'—অর্থাৎ নিজের শক্তি ও বুদ্ধির বলে যারা বড় হয়েছে, তাদের কথা? বললাম, হাঁ, ঠিক বটে, তেমন লোকদের সকলেই প্রশংসা ও শ্রদ্ধা করবে বই কি। একেবারে কিছু-না-হওয়ার চেয়ে ঐ রকমে কিছু-একটা-হওয়া তবু ভালো। তোমাদের মধ্যে যাদের বয়স একটু বেশি তাদের নিশ্চয় মনে পড়বে সেই আইরিশম্যানের নিজের হাতে তৈরী বাড়ীটার কথা। সে গোটা বাড়ীখানা—ড্রেন থেকে চিমনি পর্য্যন্ত—নিজের দু'খান হাত দিয়ে গড়ে তুলেছিল। শেষ করতে অনেক বছর লেগেছিল, বাড়ীখানার আডা একটু ট্যারা-বাঁকাও হয়েছিল, ভঙ্গিটাও হয়েছিল অদ্ভুত। কিন্তু হ'লে কি হয়, নিজের-হাতে-গড়া যখন, তখন তাকে খুব ভালোই বলতে হবে। লোকে বলাবলি করত—আইরিশম্যানটা বাহাদুর বটে! একটু দূরে যে সব সুন্দর সুন্দর বাড়ী রয়েছে, তাদের সুখ্যাতি কেউ করত না।

ঐ যে তোমরা যাকে নিজের চেষ্টায় বড় হওয়া বল, তেমন মানুষ নিজের হাতেই একখানা দা' দিয়ে নিজেই নিজেকে চেঁচে-ছুলে একটা অমনি-ধারা গড়ন দিয়েছে। যদি সেই কারণেই মানুষটাকে বড় বলতে হয়, তা'হলে, যারা হাতের বদলে যন্ত্রপাতির সাহায্যে, কোন একটা উৎকৃষ্ট প্যাট্যার্নে গড়ে উঠেছে—যেমন উঁচু সমাজে বাস, দেশ-বিদেশে ভ্রমণ, মনের উৎকর্ষমূলক শিক্ষা প্রভৃতি ফ্রেঞ্চ-পালিশ যাদের গায়ে আছে—তাদের চেয়ে এক হিসেবে ঐ সব মানুষ প্রশংসনীয় বটে। কিন্তু যদি বল, ঐ দুই-এর মধ্যে কোন তফাৎ নেই—ওরা সর্ব্ববিষয়ে সমান, সেটা হবে আরেক কথা। আমরা হচ্ছি একটা স্বাধীন-তন্ত্রের প্রজা—বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে মূল্য-বিচারের স্বাধীন অধিকার আমাদের আছে; সেই অধিকারের বলেই আমি বলব—আর সব বিষয়ে এক হ'লেও, জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আমি সেই মানুষের পক্ষে, যার একটা বংশগৌরব আছে।

বংশগৌরব বলতে আমি কি বুঝি? আচ্ছা একটা হিসেব দিচ্ছি।

চার পুরুষ ধরে' সম্ভ্রান্ত পরিবার। অনেকেই বড় বড় পদ অধিকার

করেছিল—শাসন-পরিষদের সভ্য, জেলার শাসনকর্ত্তা; দুই একজন নামজাদা পণ্ডিতও আছে—বেশ একটু পুরণো নাম।

পৈতৃক বড় বাড়ী; তার ঘরের দেয়ালে পূর্ব্বপুরুষ ও তাঁদের সহধর্ম্মিনীদের প্রতিকৃতি—আর্টিষ্টের নাম-লেখা।

তারপর পুস্তকাগার; কতদিনের সংগ্রহ! শিল্পী হোগার্থের (Hogarth) আঁকা মূল প্লেট অনেকগুলি; কবি পোপের (Alexander Pope) প্রথম সংস্করণ গ্রন্থাবলী—১৭১৭ সালে ছাপা; এমনি সব দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থ ও চিত্র-সংগ্রহ।

পৈত্রিক রূপার জিনিস-পত্র বেশ-কিছু; বিবাহের ও অন্ত্যেষ্টির অনেকগুলি আংটি—একটি হালি করে' গাঁথা; বংশের গোত্র-চিহ্ন (Coat of arms) অদ্ভুত ভঙ্গিতে উৎকীর্ণ রয়েছে ধাতু-পট্টের উপর; কোন এক চিরকুমারী পিতৃস্বসা একখানি মোটা সূতী কাপড়ের উপরে সেই ছবি বুনে রেখে গেছেন।

যদি সেই প্রাচীন পৈত্রিক আবাস এখনো বিদ্যমান থাকে তবে পুরাণো আসবাবগুলিও দেখতে পাওয়া যাবে—কালো মেহাগিনী কাঠের টেবিল; চেয়ারের পায়াগুলির নীচে কোন জানোয়ারের থাবা; বড় বড় আয়না—তার ধারগুলি ঢেউকাটা; খুব উঁচু বড় আলমারি। তা'হলে বংশগৌরবশালী ব্যক্তির সাজসজ্জায় কোথাও আর কোন ফাঁক থাকবে না।

না, বন্ধুগণ, আর সব বিষয়ে সমান হ'লেও, আমি তেমন মানুষকেই চাই, যার ঐরকম একটা বংশগত জীবনধারা আছে—যার রক্তে অন্ততঃ চার-পাঁচ পুরুষের অর্জ্জন-করা সেই উচ্চতর মানবীয় সংস্কৃতি আছে। সকলের উপরে আমি চাই, যে—সেই ব্যক্তি শিশুকাল থেকে বড়-বড় বই-এর শেল্‌ফের চারপাশে লুটোপাটি ক'রে মানুষ হয়েছে। যারা ছেলেবেলায় বই-এর সঙ্গ করেনি তারা বড় হ'লেও বই দেখলে ভয় পায়। তোমরা কি মনে কর, আমার সেই অধ্যাপক-বন্ধুটি বড় হ'য়ে তবে ঐ সব ভারি ভারি বই-এর সঙ্গে পরিচয় করেছেন? কখ্‌খনো না। যখন তিনি পড়তেই শেখেন নি, তখন থেকেই ঐ সব বই-এর পার্চমেন্ট-পাতা আর চামড়া-বাঁধানো মলাটের কিনারা বেয়ে তাঁর হাতের ভিতরে একটা অদৃশ্য রস প্রবেশ করত, ঠিক যেমন সেই আরব্য-উপন্যাসের গল্পে আছে—সেই যে এক মূল্যবান ওষুধের কথা! তার ক্রিয়া হবে ব্যাটের হাতলের ভিতর দিয়ে; খেলবার সময়ে হাতলের উপর হাত দু'খানা ঘেমে উঠবে, সেই ঘামের

দ্বারা ব্যাটে-মাখানো ওষুধ শরীরে প্রবেশ করবে। এক-পুরুষেই বড় হয়েছে যে মানুষ—তার এমনটা হতে পারে না। ঐ যে বনেদিয়ানার কথা আমি বললাম—তার সব থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ লক্ষ্মীছাড়া ও নীচপ্রকৃতির হয়ে থাকে, আবার কেউ বা বনেদী না হ'লেও উঁচু সমাজে বসবার উপযুক্ত। যদি তাই হয়, তবে ঐ দুই-এর মধ্যে স্থান-পরিবর্ত্তন হোক, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় তা' হ'তে পারে। তবু বলব, আর সব বিষয়ে সমান হ'লেও ঐ ছবির গ্যালারীওয়ালা মানুষটা আটআনা-দামের ফটোগ্রাফওয়ালা মানুষটার চেয়ে ঢের বড়—যদি চরিত্রের দিক দিয়ে ঐ শেষের মানুষটা আরও খাঁটি না হয়।

—ক'দিন আগে যে ধূমকেতু উঠেছিল তা'তে আমি একটুও ভয় পাইনি, পেতাম—যদি জানতাম পৃথিবীটা বেশ পেকে উঠেছে, অর্থাৎ কিনা, তার খসে পড়বার সময় হয়েছে। তা' ছাড়া, এখনো অনেক পরিমাণ কয়লা পুড়তে বাকি আছে—সে তো নষ্ট হবার জন্যে সৃষ্টি হয় নি? পৃথিবী এখনও সেই পৃথিবীই আছে, স্বর্গে প্রমোশন পাবার সময় এখনও হয়নি, যদি হোতো, তবে দেখা যেতো—

যাঁরা আইন তৈরী করেন তাঁরা সেই আইন নিজেরা মেনে চলেন।

ব্যাঙ্কগুলোতে বড় বড় তালা আর লোহার দরজা দরকার হয় না।

যাঁরা ধর্ম্মোপদেশ দেন তাঁরা নিজেদের মনোগত বিশ্বাস অকপটে ব্যক্ত করেন।

রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা তাঁদের আসল উদ্দেশ্যটা গোপন করেন না।

উকিলেরা তাঁদের মক্কেলকে যেটুকু দিতে পারেন তার বেশির জন্যে দাম আদায় করেন না; ডাক্তারেরা রোগীর জন্যে যে ওষুধ ব্যবস্থা করেন নিজেরাও তাই সেবন করেন।

পুস্তক-প্রকাশকেরা আর চুরি করেন না, আগে যা করেছিলেন এখন স্বেচ্ছায় তার দণ্ড দিচ্ছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

(২)

—এবার আমি একটা সাহিত্যিক গুপ্তকথা বলব—আমার আগে কেউ তা' বলেনি। আমি যে মাঝে মাঝে কবিতাও লিখি তা' তোমরা সকলেই জানো—এই বৈঠকে কয়েকবার আমার কবিতা পড়েছি। [শ্রোতারা সকলেই সে কথা স্বীকার করলেন; তাঁদের মধ্যে দু'তিন জন আমার ঐ কথায় যেন সঙ্গে সঙ্গে

বুক খুব শক্ত করে নিলেন—বোধ হয়, মনে হয়েছিল, আমি এখখুনি পকেট থেকে একটা মহাকাব্য বার করব, এবং তাঁদের হিতার্থে অন্ততঃ পাঁচ-ছয় সর্গ পড়ে' শোনাবো।]

আমি বলতে লাগলাম, হাঁ, কবিতা লিখি, এবং তার মধ্যে কিছু কিছু উত্‌রেও যায়; এমন দু'চার জায়গা আছে যা' খুবই ভালো ব'লে মনে হয়; ঐটুকু দুর্ব্বলতা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক তাতে দোষ হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐরকম উৎকৃষ্ট একটা লাইন লেখ বা মাত্র মনে হয়, সেটা যেন একশো বছরের পুরোণো। তখন সন্দেহ হয়, ওটাকে নিশ্চয় আর কোথাও দেখেছি—হয়তো বা নিজের অজ্ঞাতসারে আর কারো লাইন চুরি করেছি। কিন্তু তার সেই ঐতিহাসিক উৎপত্তিস্থানটি আবিষ্কার করে আমি যে ঐ ভাবটির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'তে পেরেছি—তা'ও স্মরণ হয় না। তাই সে রকম বিশ্বাস আমি এখন সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছি—আমার সেই ভাবটি বা লাইনটির স্বত্বাধিকার কিছুতেই আর ছাড়িনে।

কিন্তু ঐরকম মনে হওয়ার একটা গভীর কারণ আছে। [এইখানে শ্রোতার সংখ্যা কিছু কমে গেল।] একটা যে নূতন তত্ত্ব আমাদের মনে হঠাৎ উদয় হয়, তার শিকড় অনেক দূর থেকে একটা দীর্ঘ চিন্তার ক্রিয়া-পরম্পরায় প্রচ্ছন্ন থাকে। যেমন ধর—হঠাৎ একটা দুর্ঘটনায় প্রাণে বড় আঘাত লাগলো; একঘণ্টা যেতে না যেতেই মনে হবে, সে যেন কতকালের ঘটনা। জীবনের এই গ্রন্থখানার পাতা ওলটাতে ওলটাতে একটা পাতায় একবিন্দু রক্ত বা অশ্রু পড়বামাত্র সেটা যেন পিছুপানে সমস্ত পাতাগুলোয় তার দাগ এক নিমেষে শুষিয়ে দিলে—একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায় গিয়ে পৌছুলো। ঐ দুর্ঘটনাটা ছিলো যেন একটা ভবিতব্য; এতদিন ওরি জন্যে বেঁচে ছিলাম; স্বপ্নে ওরি পূর্ব্বাভাস পেয়ে দারুণ ভয়ে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে লাফিয়ে উঠেছি; যতকিছু দুর্লক্ষণের মধ্যে যেন ওরি ইঙ্গিত ছিল—যে পথ বেয়েই এসে থাকিনা কেন, শেষে ঐ খানটায় টেনে এনেছে! তেমন দুর্ঘটনার পর, প্রথম যে একটা অর্দ্ধ-চেতন ঘুমের ঘোরে ছট্‌ফট্ করতে থাকি সেটা ভেঙ্গে গেলে আবার সেই বিস্ময়টা ফিরে আসে—যেন সে বড়ই অপ্রত্যাশিত; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, সে যেন কতকালের—যে কালের অন্ত নেই!

—সাহিত্যিক সমাজের অনেক কিছুই অদ্ভুত ব'লে মনে হবে। সব চেয়ে যা' বেশি চোখে পড়ে (আমার তো তাই মনে হয়) সে হচ্ছে, একরকমের খ্যাতি, যা' মেনে নেওয়াই একটা রীতি। যেন প্রত্যেক সমাজেই লেখকদের মধ্যে একটা এই বোঝাপড়া আছে যে, ঐরকম খ্যাতির ইলেক্ট্রো-গিল্টি-করা মানুষ যে যেখানে আছে তাদের সম্বন্ধে জনগণের ভ্রান্ত বিশ্বাসটা যেন কিছুতেই বিচলিত করা না হয়। এর কারণ অনেক। ঐরকম খ্যাতিলাভ হয়েছে যাঁদের, তাঁদের কেউ বা বৃদ্ধ হয়েছেন ; কারো অনেক টাকা ; কেউ বা বড় অমায়িক ; কেউ বা দর্শকদের এতই প্রিয় যে থিয়েটারের ম্যানেজার হ'য়ে তাঁর খ্যাতি এতটুকু কমানো চলে না। ঐরকম খ্যাতি—যেন পিস্‌বোর্ডের তৈরি এক-একটা বাক্সের মত ; যারা নিতান্ত অবজ্ঞার ভাবে সেই বাক্সোগুলোর উপরে পা দিয়ে দাঁড়াতে চায় বা তার উপর চেপে বসে, তারা অতিশয় দুর্জ্জন বই আর কি ? খবরের কাগজগুলোতে সেই-সব লেখকের কি সম্মান! তারা কত ভঙ্গিমা করে' কত রকমের মিষ্টি কথা, রং-বেরঙের বিশেষণ যেন ডালায় ভরে' সাজিয়ে দেয়—তাদেরই রসনা-তৃপ্তির জন্যে। হাঁ, কাগজওয়ালাদের কাছে ঐরকম খাতির, এবং আরো অনেক রকমের মিথ্যা-প্রশংসা নইলে জীবনটা যে বড় ফাঁকা বলে মনে হবে ! তাই ঐসব মিথ্যা-রচনাগুলো সত্যি বলেই চল্‌তে থাক্। ওদের মুখ থেকে সেইসব মিষ্টির টুক্‌রো কেড়ে নিতে যেয়ো না—ঐ ফাঁপা রবারের ব্যাগগুলো ফুটো করে দিও না। তোমরা—যারা নিশ্চিত জানো, তোমাদের নাম হাজার বছর পরেও ঘরে ঘরে উচ্চারিত হবে—তারা ওদের ঐ স্থায়ীত্বহীন যশের ঠুন্‌কো গেলাসগুলোর কানা ভেঙে দিতে চাও কেন ?

যে বৃদ্ধটি ঠিক সামনে বসেন, তিনি একটু চিন্তিতভাবে বলে' উঠলেন "হাজার বছর ! সে যে অনেক কাল !"

* * *

একটা বিষয়ে আমি বড় সাবধান। যা যেমন লিখি ঠিক তেমনটি ছাপতে দিই নে। প্রথমে একটা প্রুফ, তারপর আরেকটা ; ফের মাজা-ঘসা ; তার পরেও আবার একবার তাই। অর্থাৎ, লোকে যা' দেখতে পায়, সেটা হচ্ছে আমার লেখার একটা চতুর্থ-প্রুফ-মার্জ্জিত চেহারা—বিশেষ ক'রে কবিতার। কবির প্রাণটা যদি বড্ড বেশি নরম হয় তা' হলে একটা ছাপার ভুলই তাকে শেষ করে' দেয়। যদি কোন লাইন আর কেউ ইচ্ছে করে বদলে' দেয়, সে হবে তাকে স্রেফ্ ছুরি-মারা। এত কবি যে অল্প বয়সেই মরে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে ?

(৩)

—আমি এমন কোন লেখক দেখিনি, যে—পিঠে কায়দামাফিক একটু সুড়-সুড়ি দিলেই—গলার থেকে পোষা বেড়ালের মত আওয়াজ বার করে না। কিন্তু একটা বিষয়ে সাবধান করে' দিচ্ছি, খবরদার, কোনো লেখককে বোলো না যে, তার লেখা বড় মজাদার—পড়তে বড় আমোদ লাগে। তা'হলে তোমার উপর সে জাতক্রোধ হয়ে থাকবে, এবং সুবিধা পেলে অনিষ্ট করতে ছাড়বে না। এ একেবারে নিশ্চিত! তার চেয়ে বরং বোলো যে, তাঁর কবিতা বা উপন্যাস প'ড়ে তুমি কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছো; তা'হ'লে ভারি খুসী হবে, চাই কি, তোমাকে একখানা বই উপহার পাঠিয়ে দেবে। তখন তাই নিয়ে গোপনে যত পারো তুমি হেসো।

তোমরা বোধ হয় ভাবছ, লেখক কিম্বা অভিনেতারা যখন ছাখে, লোকেরা খুব আমোদ পাচ্ছে, তখন তারা লজ্জা পাবে কেন? তার কারণ আছে। থিয়েটারে যারা ভাঁড় সাজে তারা জানে যে, মেয়েরা তাদের প্রতি একটু আকৃষ্ট হয় না। হৃদয়ের কোন গভীর আবেগের সঙ্গে হাসির সম্পর্ক নেই। ভাঁড়েরা জানে, কোন বড় একটা অনুষ্ঠানে তাদের স্থান সামনে নয়—একেবারে পিছনে। একথা আরও ভাল ক'রে বুঝতে চাও তো সময় লাগবে। যারা রসিকতা করে তারা এও জানে যে, ও জিনিষটার কাজই হচ্ছে—সবকিছুকে ছোট করে', উল্টো ক'রে, আধখানা করে' দেখানো। সে যেন জ্ঞানের সাদা আলো নয়—তাতে একটা না একটা রঙের ছোপ লাগিয়ে দেওয়া। রসিকতার আলোয় সবকিছু মজাদার, প্রীতিকর দেখায় বটে, কিন্তু তাতে কারো আসল রূপটা দেখতে পাওয়া যায় না। কাব্যে রস-সৃষ্টির জন্যে, রামধনুর সবক'টা রঙই দরকার হয় বটে, কিন্তু তার আসল মর্ম্মটা সর্ব্বদাই সত্যের সেই শুভ্র আলোয় জল্‌জ্বল করে।

কি বলেন আপনারা? এ আলোচনা আর একটু চলবে?

[সেবার আর চলতে দিলে না—ঠিক সেই সময়ে একজনের চেয়ার মেজের উপর ঘ'সে গিয়ে একটা শব্দ হ'ল, তাতেই ভাবটা ভেঙে গেল। প্রাতরাশের বৈঠক ঐখানেই শেষ হ'ল।]

—অনেকেই মনে ভাবেন; বন্ধু হিসেবে বন্ধুকে অপ্রিয় কথা বলবার অধিকার সকলের আছে। বরং ঠিক উল্টো। যার সঙ্গে বন্ধুতা যত বেশি, তার সঙ্গে তত সাবধানে কথা কইতে হয়। যদি তেমন দরকার হয়—প্রায়ই তা' হয় না—

তা'হলে, তেমন অপ্রিয় কথা তারা যেন শত্রুদের মুখেই শোনে; নিজে বলতে যেয়ো না—যা বলবার ঐ শত্রুরাই বলতে কসুর করবে না। যাদের স্বভাবে শিক্ষা ও সুবুদ্ধি প্রবেশ করেছে, তারা কখনো ভোলে না যে, মানুষ মাত্রেরই একটা আত্মপ্রীতি আছে, সেখানে আঘাত করলে তাদের বড় লাগে।

* * * *

—যখন দু'জনের মধ্যে কোন বিষয়ে আলাপ হয়, খুব সহজ সরল হ'লেও, সব সময়ে একজন আরেক জনের মন বুঝতে পারে না; তার কারণ, একজনের ব'লেই তার মন তো একটা নয়—একাধিক। [শুনে সবাই এমনভাবে চেয়ে রইল, যেন এ আবার কি কথা!]

বল্লাম—ধর, যখন জন আর টমাস কথা কইছে, তখন তাদের মধ্যে বোঝাপড়া হওয়া বেশ একটু শক্ত বই কি,—কারণ, এক সঙ্গে ছ'জনে কথা কইছে কিনা।

[আমার কথা শুনে গৃহস্বামিনী বেশ একটু ভড়কে' গেলেন; ভাবলেন, আমার মাথাটা নিশ্চয় হঠাৎ কোন কারণে খারাপ হয়েছে, অতএব তাঁর একজন ভাড়াটে শিগ্‌গির খসবে। যে বৃদ্ধটি আমার সামনেই বসেন, তাঁর বোধ হয় মনে হ'ল—টেবিলের উপর যে ছুরিখানা পড়ে রয়েছে, আমি বুঝি এইবার সেটা মুঠো করে' ধরবো; যে কারণেই হোক, তিনি যেন অন্যমনস্কভাবে একটু পাশের দিকে সরে' বসলেন।]

আমি বললাম, এমন কিছু শক্ত নয়, এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছি—জন আর টমাসের মধ্যে ঐ যে কথাবার্ত্তা, ওতে যোগ দিয়েছে ছ'জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি; যেমন—

তিনটে জন

১। আসল জন; এ জনকে সৃষ্টিকর্ত্তা ছাড়া আর কেউ চেনে না।

২। জন নিজেকে যেমন চেনে; আসলটার সঙ্গে তার কোন মিল নেই, বরং অমিলই বেশি।

৩। টমাসের নিজের মন-গড়া জন; আসল জন তো নয়ই, জনের জনও নয়—ঐ দুটোর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তিনটে টমাস

১। আসল টমাস।

২। টমাসের নিজের ধারণার টমাস।

৩। জনের মনে টমাসের যে ধারণা আছে সেই টমাস।

টেক্সো (Tax) আদায় করা যাবে কেবল ঐ একটার কাছ থেকে; কিন্তু কথাবার্ত্তার ব্যাপারে বাকি হু'টোও কম দরকারী নয়। মনে করা যাক, আসল জন যে—সে বুড়ো, অল্প বুদ্ধি, কুৎসিত। কিন্তু যেহেতু ভগবান মানুষকে সেই শক্তি দেন নি যার দ্বারা সে নিজেকে ঠিক যা' তাই দেখবে, অতএব জন খুব সম্ভব নিজেকে একজন যুবাপুরুষ, রসিক এবং সকলের মনোহরণকারী ব'লেই মনে করবে—লোকের সঙ্গে কথাও কইবে নিজের সেই মনোভাব নিয়ে। এদিকে টমাস হয়তো তাকে একজন ধূর্ত্ত, বদ্‌মায়েস বলে'ই জানে—যদিও আসলে সে অতিশয় সরল, বুদ্ধিহীন। টমাসের বেলাতেও ঠিক তাই—সেখানেও তিনটে টমাস। তা'হলে দাঁড়ালো এই যে, যতক্ষণ-না কোন মানুষ নিজেকে ভগবানের চোখে দেখতে পায়, কিম্বা পরে তাকে যেমন দেখছে তেমন দেখা দেখতে পায়, ততক্ষণ দুজন মানুষের ঐ কথাবার্ত্তায় অন্ততঃ ছ'জন যোগ দিয়েছে। তাদের মধ্যে ঐ আসল মানুষ যেটা—সূক্ষ্ম বিচারে সেটাকে একেবারে বাদ দেওয়া যায়। অতএব, তর্ক করতে করতে দু'জনে যদি রেগে ওঠে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই—কারণ, একসঙ্গে ছ'জনে বলছে, এবং ছ'জনে শুনছে।

* * * *

—কোন ব্যক্তির প্রতিভা বা কোন বিধিদত্ত গুণ সম্বন্ধে তার নিকট আত্মীয়দের যে মত, তার কোন মূল্য নেই। নিজের লোক বলে' তারা খুব বাড়িয়ে বলে, এমন ধারণাই অনেকের মনে আছে। কিন্তু সেই কারণেই ঠিক উল্টোটাই তারা করে' থাকে—অনেক সময়ে ঐ আত্মীয়েরা তার কোন বড় গুণ দেখতে পায় না, কারণ, তাকে নিজেদের সমান মনে-করা একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। যারা ফুলের চাষ করে, তাদের ভাষায় বলা যেতে পারে—দশ হাজার ফুলের মধ্যে কোন একটিতে, হঠাৎ যেমন একটা অপূর্ব্ব ও অসাধারণ রঙ দেখা দেয়, প্রতিভার প্রকাশও তেমনি। অবাক হবারই কথা, কারণ, এর কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। হঠাৎ যেন দুই-আর-দুইয়ে-চার না হয়ে পাঁচ হয়ে গেছে! মনে হয়, প্রকৃতি দেবী মাঝে মাঝে খেয়ালের বশে একটা খুব বড়, বে-হিসাবী দান ক'রে ফেলতে ভালবাসেন। যে ছোট জীবনগ্রন্থখানি তিনি সবারই হাতে সমান নিয়মে তুলে দিয়েছেন,—সেটা সেই একই গল্পের বই, অতিশয় পুরণো; কেবল, নতুন ক'রে বাঁধিয়ে দেওয়া। তবু কখনো কখনো, অনেক কাল পরে-পরে, তাতে একটি অপূর্ব্ব কবিতা দেখা দেয়; কিম্বা তার কোন একখানা পাতায় এমন আর্টের

কারুকার্য্য ফুটে ওঠে যার তুলনা নেই—অমূল্য! তেমন একটা দান কেবল সেই অনন্ত ধনের অধিকারিণী, অনন্তরত্নপ্রসবা মহাজননীই করতে পারেন। কিন্তু সেই যে দান ঐ ছোট বইখানিতে মাঝে মাঝে দেখা দেয়—আত্মীয়-স্বজনেরা প্রায়ই তা' দেখতে পায় না, যারা পর—যারা সম্পূর্ণ অপরিচিত—তারাই তাকে চিনতে পারে।

এর পর প্রশ্ন উঠতে পারে, কেউ কি নিজের সেই গুণ নিজে টের পায়? হরিণের নাভিতে যে কস্তুরী আছে হরিণ তা' জান্‌তে পারে কিনা বলা যায় না। কোন মানুষই তার নিজের কণ্ঠস্বর কেমন তা' জানে না; অনেকেই তার মুখখানা পাশ থেকে কেমন দেখায় তা' দেখে নি। কারলাইলের 'চারিত্রিক লক্ষণ' প্রবন্ধটি অনেকের মনে আছে, তাতে চিন্তার কিছু বাড়াবাড়ি থাকলেও, তিনি এক জায়গায় সেই যে বলেছেন—প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তিরা নিজেদের প্রতিভা সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তার অনেকখানিই সত্যি। আমি যে কথাটা আগে বলেছি—সেও ঐ এক নিয়মের অন্তর্গত। ঐ যে জ্ঞানের অভাব, ওটা ব্যক্তির পক্ষেও যেমন, সমস্ত পরিবারের পক্ষেও তেমনি সত্য। অতএব, ভাই-বোন, খুড়ো-খুড়ী, এবং আর সকলে যাই বলুক না কেন, তাদের কথায় কাণ দিও না; যদি ভালো একটা কবিতা লিখে থাকো তা'হলে এখনই সেটা ডাকটিকিট-সমেত কোন সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দাও—কোন সঙ্কোচ-বোধ কোরো না।

—খুব নিরহঙ্কার লোকও যদি বিজ্ঞান-বিদ্যার চর্চ্চা করে, তবে সেই জ্ঞান তার মনে একটু দম্ভের সৃষ্টি করবেই। যে-সব তথ্য খুব কাটা-ছাঁটা, যার কোন প্রতিবাদ চলে না, সেই সব নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করে যারা তাদেরও প্রকৃতি সেই রকম হয়ে দাঁড়ায়, আচরণে না হোক—চিন্তায়। তারা কাউকেও মানে না—কোন ভদ্রতা নেই তাদের। তারা যখন লোকের সঙ্গে বেশ হেসে কথা কয়, সেই হাসিতেও একটা দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের ভাব থাকে। গণিত-মূলক বিজ্ঞানের চর্চ্চা করে যারা, তাদের কথাই ধরা যাক। গাণিতিক সিদ্ধান্ত একটুও নুইবে না, হটাতে গেলে এক চুলও হটবে না, বরং যা-কিছু তার পায়ে ধাক্কা দেবে তাই চূর্ণ হয়ে যাবে। যেহেতু গণিত-ব্যবসায়ীদের জ্ঞানে সকল তত্ত্বই চূড়ান্ত—তাতে অবস্থার ভেদে নিয়মের ভেদ নেই, কোন দ্বৈধ বা দ্বিরুক্তি নেই, কাজেই সে জ্ঞান মানুষকে স্বভাবতঃই ঘোরতর আত্মাভিমানী করে' তোলে। ঠিক সেই মতই—বাহ্যপ্রকৃতির অতি-প্রত্যক্ষ এবং অসন্দিগ্ধ প্রমাণগুলো নিয়েই যাদের কারবার,

তাদেরও মনের ধরণ ঐ রকম হয়ে ওঠে, তবে মাত্রাটা কিছু কম। অপর পক্ষে—সাধারণ মানুষ আমরা, আমাদের বিশ্বাসগুলো গ'ড়ে ওঠে—যা' কিছু সম্ভব তার উপরে; সেই সম্ভাব্যতাকে টেনে ছোট-বড় করা যায়; ধাক্কা সাম্‌লাবার জন্যে তার দু'দিকে যেন দুটো স্প্রিং লাগানো আছে, তাই দিয়ে বিরুদ্ধ মতগুলোকেও সাম্‌লে নেওয়া যায়। কিন্তু ঐ সব বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়-বুদ্ধিতে কোন স্প্রিং নেই—সম্ভব বলে' মেনে নেবার এতটুকু ফাঁক কোথাও নেই। ঐ ধরণের সত্য নিয়ে যারা নাড়াচাড়া করে, তাদের মনেও সেই রকম একটা ছাপ পড়বেই যে।

—তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে—আমি গল্প-উপন্যাস লিখিনে কেন।

আমার অনেকদিনকার একটি বিশ্বাস এই যে,—রচনা-শক্তিসম্পন্ন মানুষ-মাত্রেরই মনের ভিতরে এমন অনেক বস্তু জমা হয়ে আছে, যা' দিয়ে একখানা বড় তিন-খণ্ডের উপন্যাস লেখা যেতে পারে। কেউ কেউ এমনও বলে' থাকেন যে, অনেকেই একখানার বেশি নভেল লিখতে পারে না—লিখলে তা' অপাঠ্য হয়। অবিশ্যি মানুষের জীবন এত বড়—যেমন গহন-গভীর, তেমনি বিরাট-উচ্চ—যে, তাকে কোন লেখকই তাঁর লেখার মধ্যে সম্পূর্ণ ধরে দিতে পারেন না। তার যতটুকু তিনি জেনেছেন তাকে জীবন্ত ক'রে আঁকতে হ'লে, নিজের জীবন থেকেই খানিকটা ধার করতে হয়। প্রথম যে বইখানি কেউ লেখে, স্বভাবতঃই তার অনেকখানি সে তার নিজের সেই অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহ করে; তার মানে, সেটা হয় প্রত্যক্ষ-বাস্তবেরই একটা প্রতিলিপি; কেবল পোষাকটা জায়গায়-জায়গায় একটু বদলে দিতে হয়। কিন্তু যেই সে ঐ রকম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে আসে, অমনি তাকে রীতিমত কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়—যাকে বলে সৃষ্টি-কল্পনা। সেই সৃষ্টি-শক্তি তার চাই; সেই সঙ্গে গল্প বলবার শক্তি, এবং রসানুভূতি,—নইলে, তার ছবিগুলো জীবন্ত হবে না। এ শক্তি খুব কম লোকেরই আছে।

আবার একটা ভয়ও আছে। কারণ, এমন হতেও পারে যে, সেই প্রথম উপন্যাসেই সে তার নিজের জীবন থেকে যা কিছু নেবার সব নিয়ে ফেলেছে,—আর যতকিছু উৎকৃষ্ট ভাব ও চিন্তা সব তাইতে ধুয়ে বেরিয়ে গেছে। এর থেকে

প্রমাণ হয় যে, আমি যখন সেই জাতেরই একটা মানুষ—তখন ইচ্ছে করলে আমি অন্ততঃ একখানা উপন্যাস লিখতে পার্‌তাম।

—তা'হলে লিখিনে কেন? তা' যদি বল, তবে তার কারণ একটা নয়—অনেক। প্রথমতঃ খুব ভাল লেখা লিখতে হ'লে নিজের ভিতরটাকে একেবারে বাইরে ঢেলে দিতে হয়; সেটা চলে কবিতায়। কবিতায় ছন্দ আছে, মিল আছে—গীতি-সুর আছে; তার উপর আছে উপমা-অলঙ্কার, কল্পনার চমক, হৃদয়াবেগের ঝলক; এই সবের যোগে—সেই যে নিজের ভিতরটাকে একেবারে অনাবৃত ক'রে দেওয়া—সেটা একটা জ্যোতিশ্ছটার মত অপরূপ হয়ে ওঠে, তখন তাকে আর কেউ লেখকের নির্লজ্জ বেহায়াপনা ব'লে নিন্দে কর্‌তে পারে না। তারপর নিজের কথা লিখতে গিয়ে, পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের চরিত্র এঁকে ফেল্‌বার ভয়ও আছে। বলুক দেখি কেউ—কোন্ গল্প-লেখক তা' না করে! আমার বন্ধুদের সবারই চরিত্র কিছু সুন্দর নয়, কারণ তারা সব সাধারণ মানুষ; দোষ তাদের অনেক আছে—লিখতে বসলে সেই দোষগুলো বেশ ঘোরালো হয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে। আমাদের মধ্যে যে-সব গল্প-লেখক আছেন, তাঁদের এমন একজনকেও মনে পড়ছে না—যিনি তাঁর উপন্যাসে কোন জীবিত ব্যক্তির ছবি নিখুঁত ক'রে আঁকেন নি। তেমন না আঁকলেই ভাল হ'ত। সব শেষে আরও একটা কারণ এই যে, এতদিন অবকাশ হয় নি; হ'লেই লিখবো। আর, যশের কথা যদি বল—এমন কত লোক আছে যাদের একমাত্র যশ এই যে, তারা ইচ্ছে কর্‌লেই যশস্বী হ'তে পার্‌তো।

—সেদিন এক ভদ্রলোক ভারি সুন্দর প্রাণখোলাভাবে আমাকে বললেন যে, বই-পড়া তাঁর সহ্য হয় না, ও জিনিষটা তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। ভদ্রলোকটির কথাবার্ত্তায় কিছুমাত্র ভান নেই; তেমন বিদ্বান না হ'লেও, ভারি ভদ্র—ও গুণটা অনেক সময়ে বিদ্যার চেয়ে বড়। সংসার বা সমাজ সম্বন্ধে তিনি মোটেই নির্ব্বোধ ন'ন—তবে কাব্যে বা কলাশিল্পে তাঁর বিশেষ দখল নেই। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যে আলাপ করবে সেই খুসী হবে। তিনি যে সাহিত্য-রসিক ন'ন সেটা চোখে পড়ে না, তার চেয়ে বেশি চোখে পড়ে তাঁর চরিত্রের সরলতা ও সৎসাহস—তিনি যে লেখাপড়া করেন না, তা' স্বীকার করতে তাঁর কোন লজ্জা নেই। আমার বিশ্বাস, এমন অনেক লোক আছে যারা বই পড়ে কেবল বাইরে চটক দেখাবার জন্যে; বই যে তাদের পড়তে ভাল লাগে না—এ যেমন তারা

নিজেরাও বুঝতে পারে না, তেমনই তা' স্বীকার করবার মত সৎসাহসও তাদের নেই।

—আমাদের একটা ধারণা হয়ে গেছে যে, যাদের আমরা ভাবুক, চিন্তাশীল বলি—অন্তর্দ্দৃষ্টির প্রশংসা করি, তাদের বুদ্ধির দশভাগের একভাগ মাত্র তাদের নিজের, বাকি সবটা তারা পেয়েছে বই-এর থেকে। যদি সত্যিই তাদের ঐ গুণ থাকে, তবে তার জন্যে খুব বেশি পড়াশুনা করতে হয়নি। যে সমাজে আমরা বাস করি সেই সমাজই তো বহু পুঁথির চোঁয়ানো জলে ভর্ত্তি হয়ে আছে; বইয়ের পাতায় যা' কিছু বস্তু আছে তার সারটুকু ঐ সমাজ নিজের ভিতরে টেনে নিয়েছে—যেমন, কেট্‌লীর গরমজল চায়ের পাতাগুলোর থেকে তার সার পদার্থটা টেনে নেয়।

(৪)

—এই বোর্ডিংটি আমার এত ভাল লেগেছে যে, আমি বোধ হয় এখানে অনেক দিন থাকবো। তা'হলে, আমায় এই রকম বহু আলাপ লিখে রাখতে হবে। আলাপগুলো অবিশ্যি এক রকমের বা এক বিষয়ের হবে না—নানা ছাঁদের হওয়াই স্বাভাবিক। সে যেন আমাদের এই প্রাতরাশের খাবারগুলোর মত—কখনো মাখন-মাখানো টোষ্ট, কখনো বা একেবারে খট্‌খটে। তোমাদেরও যখন-যেমন তখন-তেমনটি নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হবে।

—আচ্ছা, এই যে এত চিঠি আসে, আমি তার কি করি বল তো? আলাপগুলো কাগজে ছাপা হয়ে বেরুলেই—তারপর ঐ রকম সব চিঠি আসতে থাকে। ১নং চিঠিতে অনুরোধ করা হয়েছে—আলোচনা যেন আরও গাঢ় এবং গভীর হয়। ২নং (চিঠিখানায় কড়া সিগারের গন্ধ) বলছেন, যেন আরও বেশি মাত্রায় রং-তামাসা থাকে। ৩নং—আরও ঘন-ঘন কবিতা চাই। ৪নং—এমন কিছু থাকা চাই যা' কাজে লাগতে পারে। ৫নং (চিঠির কাগজে সোনালী পাড়—সুগন্ধ)—আরও 'ভাব' চাই, গভীর আবেগ চাই।

কিন্তু বন্ধুগণ, আমি তোমাদের সবাইকেই বলেছি—এই টেবিলে বসে' আমার মুখে যেদিন যা' বেরোয় আমি ঠিক তাই লিখে পাঠাই; কোন্‌দিন কি বলবো সেটা নির্ভর করে দৈবের উপরে, কোন্‌দিন কেমন শ্রোতা থাকে তার উপরেও অনেকটা নির্ভর করে। এবার অধিকাংশ কথাই আমি বিশেষ করে' দু'জনকে

শুনিয়ে বলেছিলাম—সেই ধর্ম্মশাস্ত্রওয়ালা যুবকটি, এবং স্কুলের সেই তরুণী শিক্ষয়িত্রী।

—আমাদের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর একটা নিজস্ব গতিচ্ছন্দ আছে—যতই না কেন নিজেদের ইচ্ছানুসারে সেগুলোকে পরিচালনা করি, তবু সেই মূল ছন্দটি লঙ্ঘন করবার যো নেই। তেমনি আমাদের মনের ক্রিয়াতেও একটা ছন্দানুবর্ত্তন আছে—কতকগুলো চিন্তা যেন পালাক্রমে, যার যখন সময়—ঘুরে' ঘুরে' আসে। কিন্তু হঠাৎ এমন আগন্তুক চিন্তাও মাঝে মাঝে এসে পড়ে যে, তখন সেই নিয়মিত ধারাটি আর বজায় থাকে না। আমার এই উক্তিটির মূল্য যেমনই হোক, অন্ততঃ এটা সকলে স্বীকার করবেন যে, এমন দু' একটা অনুভূতিও আছে যা' দিনে বা সপ্তাহে একবার করে' দেখা তো দেয়ই না, সারা বছরেও ফিরে আসে না। একটা দৃষ্টান্ত দিই। ধর, এমন একটা কথা বললাম, যা' শোনবামাত্র সকলেই তাতে সায় দেয়, বলে—হাঁ, ঠিক বটে, ঐ রকম একটা কথা তাদের মনেও অনেকবার চমক জাগিয়েছে বটে!

সঙ্গে সঙ্গে মনের ভিতরে যেন দপ করে ওঠে—পূর্ব্বে একবার বা বহুবার, ঠিক এই মুহূর্ত্তের মতই, স্থান, কাল ও পাত্রের যোগাযোগে আমিও ঐরূপ চিন্তা করেছিলাম।

শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলে' উঠল—'আরে, সত্যিই তো! ঠিক অমনি ধারা হয়েছে অনেকেরই।'

গৃহস্বামিনী বললেন, "কি জানি বাপু, হবে বা! মানুষের মাথায় কতরকমের ছিট্ থাকে!"

স্কুলের শিক্ষয়িত্রীটি কেমন একটু দ্বিধাজড়িত ভাবে বললেন, ঐ রকমের একটা অনুভূতি তাঁর খুবই জানা আছে; কিন্তু তিনি তার পুনরাবির্ভাব কামনা করেন না, কারণ, সে সময়ে তাঁর মনে হয়—তিনি যেন আর কেউ, এই দেহের এই মানুষটা নয়।

যে ছোকরাকে সবাই 'জন' ব'লে ডাকে, সে বললে, ও জিনিষটা তার ভাল রকমই জানা আছে; সেদিন সে যেই একটা চুরুট ধরিয়েছে, অমনি তার মনে একটা বিরাট অনুভূতি হ'ল—সে যেন ঐ কাজটা আগেও বহুবার করেছে। আমি তার পানে খুব একটা কড়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম, তখন তার মুখের যে পাশটা আমার দিকে—তা'তে একটা অপ্রতিভ ভাব ফুটে উঠল; কিন্তু অপর

পাশে কি হচ্ছিল তা' জানি নে, কারণ, ও যখন একপাশে হাসে, তখন মুখের অপর পাশে তার কোন চিহ্ন থাকে না।

—এর কোন অর্থ আমি করতে পারি কি না? তা যদি বল, ওর কয়েকটা কারণ আমি নির্দ্দেশ করতে পারি—তোমরা যেটা ইচ্ছে নিতে পারো। প্রথম একটা কারণ—ঐ যুবতী মহিলা যা' ইঙ্গিত করেছেন, অর্থাৎ, মনের ভিতরে ঐ যা' সব উঁকি দেয়, ও হচ্ছে পূর্ব্ব জীবনের স্মৃতি; যদিও আমি নিজে তা' বিশ্বাস করি নে। আমার মনে আছে, একবার আমার পরিচিত একটি গরীব ছাত্র এই রকম স্মৃতির কথা বলেছিল—সে তখন তার জুতো জোড়াটা বুরুশ করছিল। আমি বিশ্বাস করি নে যে, অন্য কোন জগতে ঐ রকম জুতোর কালির প্রচলন আছে।

কেউ হয় তো বলবেন, ডাঃ উইগ্যানের (Dr. Wigan) সেই মতটা এখানে খাটতে পারে; তাঁর মতে, আমাদের ব্রেন একটা ডবল-যন্ত্র; দুইভাগে দু'টোয় মিলে কাজ করে—যেমন আমাদের চোখ জোড়াটা। ঐ দুই গোলার্দ্ধের একটা হয়তো তার কাজ সেরে বসে থাকে, অপরটা বড় ধীরে চলে, তাই তাতে সেটা পৌঁছতে অনেক দেরী হ'তে পারে। তারপর, যখন এটাতেও সেই অনুভূতি জাগে, তখন মনে হয় সে যেন একটা পুনরাবৃত্তি—যেন আগে একবার হয়েছিল। কিন্তু ঐ যে এত বেশি সময় লাগে—এর কারণ আমি খুঁজে পাই নে, ঐ রকম ক্রিয়ারও আর কোন নজির নেই। আমার মনে হয়, ঐ যে দুটোকে অবিকল এক মনে হয়, তা' সত্যি নয়; সাদৃশ্যটা আসলে খুব সামান্যই, কিন্তু তাইতেই মনে হয়—হুবহু এক। ঠিক যেমন একজন মানুষের চেহারা ঠিক আরেক-জনের মত মনে-হওয়া—এমন প্রায়ই হয়, একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষকে কতকালের চেনা ব'লে মনে হয়। কারণ আর কিছু নয়—মনের অসাবধানতা। কবে কোথায় কোন একজনের চোখ-মুখের একটা ভঙ্গি হয়তো দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, পরে তা' মনে আনবার দরকার হয়নি; তারপর অনেক দিন পরে, অপর একজনের চেহারায় সেইরকম একটা কিছু যেই চোখে পড়া, অমনি মনে হ'ল, একে আগে কোথায় দেখেছি, এ যেন কতকালের চেনা। সেই রকম আর কি!

ঐ এক ধরণের কথা কত জায়গায় পাওয়া যায়! এই দেখ না, একটা বোধ হয় লিটনের (Bulwer Lytton) নভেলে পেয়ে থাকব; ওমষ্টেডের (Mr. Olmsted) বইতেও একটা কথা আছে ব'লে মনে হচ্ছে—

"কোন একটা স্মৃতি, অনেক-দিনের পুরণো সুখ-দুঃখ, কিম্বা একটা ভাব থেকে

আরেক ভাব—এ সব ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যেমন সহজে জেগে ওঠে তেমন আর কিছুতে নয়।"

—অবিশ্যি, কোন্ রকম গন্ধে কার মনে ঐ রকম সূক্ষ্ম সাড়া জাগে, তার কোন নিয়ম নেই। আমার? নিশ্চয়! বলব বই কি! একটা হচ্ছে ফস্‌ফরাসের গন্ধ। বয়সটা যখন ছিল বালক আর যুবার মাঝামাঝি, তখন আমি কিছুদিন রসায়নশাস্ত্রের চর্চ্চা করেছিলাম। যেহেতু সে বয়সে মনে অনেক বাসনা-কামনা জাগতো, তাই তার কতকগুলো ঐ রাসায়নিক ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে গিছলো। যেমন—নাইট্রাস্ অ্যাসিডের উজ্জ্বল কমলা-রঙের ধোঁয়ার সঙ্গে উজ্জ্বল একটা ভবিষ্যতের স্বপ্ন—তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি ক্ষণস্থায়ী। লিটমাসের কাগজ লাল হ'য়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে টুক্‌টুকে গাল, রক্তিম ওষ্ঠাধর—আরে ছি! কিন্তু এমন কোন রসায়ন দ্রব্য আছে যা' সেই ১৮—সালের গাল দু'খানিকে আজ আবার তেমনি রাঙা ক'রে দিতে পারে? থাক তার কথা! কিন্তু ঐ যে বলছিলাম—ফস্‌ফরাসের কথা; ঐ বস্তু এখনও আমার মনের মধ্যে এক মুহূর্ত্তে সেই ভাব জাগাতে পারে, ওর ঐ আলোময় ধোঁয়া এবং তীব্র গন্ধ আমাকে স্বপ্নাবিষ্ট করে। কিন্তু এ কালের ঐ হতভাগা দেশলাই-কাঠিগুলো আমার ভাবালুতা অনেকখানি ভোঁতা ক'রে দিয়েছে।

তারপর, গাঁদাফুলও কম নয়। ছেলে-বেলায় গ্রামের রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়ে যখনই একটি প্রতিবেশিনীর বাগানের সামনে গাড়ী দাঁড়াতো অমনি তিনি আমার জন্যে একটি গাঁদাফুলের তোড়া বেঁধে দিতেন। তাঁর সেই নম্র-নিরীহ মুখশ্রী, সাদাসিদে আটপৌরে পোষাক, আর সেই ছোট্ট কুটীর—সব মিলে এমন একটি স্মৃতি ঐ গাঁদাফুলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে, ঐ ফুল দেখলেই আমি যেন কি একটা বস্তু ফিরে পাই। সেই মেয়েটি এখন গ্রামের গীর্জ্জা-সংলগ্ন কারখানায় ঘুমিয়ে আছেন; তাঁর শিয়রে শ্লেটরঙের পাথরখানা শেওলায় সবুজ হয়ে গেছে, গত কয় বছরে একটু হেলেও পড়েছে। সে বাগানের আর যা-কিছু সব কোন্ কালে মন থেকে মুছে গিয়েছে, কিন্তু ঐ গাঁদাফুলের একটু আভাসমাত্রে আমার মনে কত-কি ভিড় ক'রে আসে!

—আর ঐ 'অমরত্ব'-ফুল; শরৎকালে আমাদের মাঠে-বাটে যখন দেখা দেয়, তখন তার সেই মৃদুগন্ধ আমার চোখে একটা স্বপ্নের ঘোর আনে! ওর ওই ম্লান রঙের নীরস খস্‌খসে পাপড়িগুলোতে যেন সমাধি-ঘরের গন্ধ লেগে আছে—সেই

সব গাছ-গাছড়া, মশলাপাতির গন্ধ, যা' দিয়ে প্রাচীন মিশরে রাজাদের মৃতদেহকে "মামি" ক'রে মিশরবাসীরা পিরামিডের ভিতরে রেখে দিত। ঐ ফুলের প্রাণহীন পাপড়িতে যে একটি ক্ষীণ, বিষণ্ণ গন্ধ পাই, সে যেন অমরতারই গন্ধ; কিন্তু তাই বলে' আমার চোখ যে কেন হঠাৎ জলে ভ'রে ওঠে—যেন এক মধুর স্বপ্নে আমি স্বর্গের সেই জীবন-নদীর তীরে আস্ফোডেল ফুলের বনে বিচরণ করি, তার কারণ খুঁজে পাইনে।

—এই রকম ব্যক্তিগত কাহিনী নিয়ে এত সময় নষ্ট করতাম না—যদি না এই প্রসঙ্গে একটা ভারি নতুন কথা বলবার থাকতো। সেটা এই। মনের সঙ্গে ঐ যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সম্পর্ক—আসলে ওর মূলে আছে একটা দৈহিক কারণ। আমার অধ্যাপক-বন্ধু বলেন, যত ইন্দ্রিয় আছে তার মধ্যে ঐ ঘ্রাণেন্দ্রিয়টাই সাক্ষাৎভাবে মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে—আবার, এ কথাও ঠিক যে, আমাদের যতকিছু ভাব-চিন্তা, ঐ মস্তিষ্কই তার কারখানা। আরও ঠিক ক'রে বলতে হলে,—ঘ্রাণেন্দ্রিয় একটা পৃথক কোন 'স্নায়ু' নয়—মস্তিষ্কেরই একটা অংশ। আমি যে সব ঘটনার কথা বল্‌লাম তার মূলে ঐ দেহযন্ত্রটারই ক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নেই—সে কথা আমি জোর ক'রে বলব না, কিন্তু ব্যাপারটা এমনি অদ্ভুত যে তা মনে রাখবার মত।

—আমার সেই অধ্যাপক-বন্ধুটি—তাঁর কথা তোমাদের কাছে এর আগে দু'একবার বলেছি—কাল আমাকে বলেছিলেন যে, কে একজন কয়েকখানা পত্রিকায় তাঁকে গাল দিতে আরম্ভ করেছে। শুনে আমি বললাম, "ঐ রকম গাল তোমাকে তো খেতেই হবে, এবং প্রার্থনা করি, আরও কিছুকাল তোমাকে যেন মাঝে মাঝে একটু আধটু ঐ রকম গাল খেতে হয়। আর দশজনের বুদ্ধি বা স্বভাব শোধরাতে গেলে তারা যে তোমায় গাল-মন্দ করবে না—এ কেমন কথা? লোকেদের দোষগুলো নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করলে তারা তা' আদৌ পছন্দ করে না—তুমি বোধ হয় তাই করেছিলে?" অধ্যাপক একটু হাসলেন। "এখন তোমাকে একটা কথা বলি শোন। যে-বয়সে মানুষ—বিশেষ করে' বক্তা ও লেখক জাতের মানুষ—লোকের সুখ্যাতি ছাড়া আর কিছু করে না, সে বয়সে পৌঁছুতে তোমার আর বেশি দেরি নেই। 'পীচ' কিংবা 'পেয়ার'-ফলের মতই—মানুষও একেবারে পেকে প'চে যাবার ঠিক আগে, কিছুকাল খুব মিষ্টি হ'য়ে ওঠে।

জানিনে, সেটা স্বভাবের বশে হয়, না—শেষে বুঝতে পারে যে, যতই সাধু-উদ্দেশ্য নিয়ে পরের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করতে যাওনা কেন, তার মত বৃথা-কাজ আর কিছু নেই। অতএব, আমি দেখে খুসী হয়েছি যে, এখনো তোমার কিছু জীবনী-শক্তি অবশিষ্ট আছে, আর কিছুদিন পরে তুমি সেই 'পীচ' আর 'পেয়ার'-ফলের মত মিষ্টি রসে ভরে' উঠবে।"

ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে যে-যুবকটি, সে ব'লে উঠল, "ঐ যে উপমা-দেওয়া বা তুলনা করিবার শক্তি, ওটা দেখলে সত্যি ভারি হিংসে হয়। দেখে অবাক হয়ে যাই—এক-একজন মানুষ সব সময়েই কেমন উপমা দিয়ে কথা বলে—এমন দুটো বস্তুকে একসঙ্গে জুড়ে দেয়, যাদের কোন একটা বিশেষ দিক দিয়ে না দেখলে, কোন সাদৃশ্যই চোখে পড়ে না। তখন আশ্চর্য্য বোধ হয়—ঐ সাদৃশ্য এতদিন আমরা দেখতে পাই নি কেন! আমার মনে হয়, ওটা একটা অসাধারণ শক্তি।"

—তুমি ওকে অসাধারণ বলছ? কিন্তু জগতে সব জিনিসের মধ্যেই যে সব জিনিস রয়েছে! কেবল যার মনের যেমন প্রসার ও গভীরতা, সেই অনুপাতে সে একের মধ্যে বহুকে, এবং বহুর মধ্যে এক-কে দেখে! এর মত সহজ কথা আর হ'তে পারে না। স্যার আইজাক নিউটন যখন সেই কথাটা বলেছিলেন—সেই বালক আর সমুদ্রতীরে কতকগুলো নুড়ি-কুড়োনোর কথা, তখন তিনি তার অর্থ কি, তা' ভেবে দেখেছিলেন? তিনি কি সেই নুড়িগুলোকে বড় তুচ্ছ জিনিস মনে করেছিলেন?—ঐ ছোট্ট নিরেট বর্ত্তুলগুলোর ভিতরে ভূ-গোলকের অন্তর্নিহিত সকল শক্তি-স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে; সুদূর শনিগ্রহ কিম্বা কাল-পুরুষের মেখলায় যে সব বিরাট বস্তুপিণ্ড আছে, তাদের সঙ্গে ঐ ছোট্ট নুড়িটিও এক অদৃশ্য সূত্রে যুক্ত ও বিধৃত হয়ে আছে; ওর পানে চেয়ে—ওকে ধ্যান ক'রে মহাজ্ঞানী দেবর্ষিরা সমস্ত জড়সৃষ্টির মূলতত্ত্বটা ধরে ফেলতে পারেন; ও হচ্ছে সেই মহা-শক্তির মহিমময় আসন—যে শক্তি আকাশময় গ্রহ-নক্ষত্রের ঐ বিরাট জপমালা রচনা করার পর জড়জগতের প্রত্যেক অনুপরমাণুকে শাসনে রেখেছেন।

ধর্ম্মশাস্ত্র-অধ্যয়নকারী সেই ছাত্রটি আমার এই কথাগুলো যেভাবে নিলে, তা'তে মনে হ'ল, তার ভিতরে কিছু পদার্থ আছে। সে অবিশ্যি তখনই আমার ঐ কথা মেনে নিলে না—ফেলেও দিলে না। উপস্থিত সেগুলোকে টৌপের মত

গিলে টেনে নিয়ে গেল তার সেই চার-তলার ঘরে, সেখানে সে অবসর মত ওর একটা মীমাংসা করবে।

*　　*　　*　　*

—সাহিত্যিকদের পক্ষে হাস্যরসের দিকে ঝোঁক দেওয়া বিপদজনক। যতক্ষণ তিনি হাসতে পারবেন, ততক্ষণ পাঠকেরাও তাঁর সঙ্গে হাসবে, কিন্তু যেই তিনি গুরু-গম্ভীর হ'তে চাইবেন, অমনি সেই হাসিটা তারা উল্টে তাঁর উপরেই প্রয়োগ করবে। কিন্তু এর ভিতর একটা গভীর তত্ত্ব আছে, সেটা হঠাৎ চোখে পড়ে না। তোমরা বোধ হয় কখনো ভেবে দেখোনি যে, যে-ব্যক্তি তোমাদের হাসাতে চায়— তোমরা তার চেয়ে নিজেদের একটু উঁচু মনে কর,—তা' সে মুখভঙ্গি করেই হাসাক, আর পদ্য লিখেই হাসাক। সে সময়ে তোমাদের কি মনে হয় না যে, তোমরা তাকে ঐ যে হাসাবার অধিকার দিয়েছ, সে একটা অনুগ্রহ; নিজেদের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য বা আত্মমর্য্যাদা যেন কতকটা ত্যাগ ক'রে তাকে ঐ অনুমতি দিয়েছ বলেই সে নানারকম কসরত দেখিয়ে রাজা ও রাণীদের আনন্দবর্দ্ধন করছে।

—আরে, না-না! আমি যে মাঝে-মাঝে তোমাদের হাসাই, তাতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। আমার ডেস্কে এমন কিছু আছে যা' পড়ে শোনালে তোমরা হয়তো মুচকে' মুচকে' হাসবে। এর পর একদিন সেটা পড়তেও পারি—কিন্তু একটা সর্ত্তে; পড়বার সময়ে যদি একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি ত'হলে সেটা তোমাদের সহ্য করতে হবে। কিন্তু আজ এখনই নয়। জগৎ-বিধানে রঙ্গরসের স্থানও আছে তাতে সন্দেহ নেই—ওটা মানুষের আবিষ্কার নয়, ভগবানের মাথা থেকেই বেরিয়েছে; তার প্রমাণ—এরিষ্টোফেনিস বা শেকস্‌পীয়ারের বহু পূর্ব্বে বিড়াল-ছানাগুলো কত তামাসা দেখিয়েছে; বানরেও কত রকমের মুখভঙ্গি করে! এও ভারি আশ্চয্যি যে, পরলোকের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমরা যে একটি উচ্চ ধারণা খাড়া করেছি তার প্রধান উপাদান হচ্ছে—সর্ব্ব বিষয়ে অতিশয় গাম্ভীর্য্য। সেখানে কোন রকমের হাস্য-পরিহাস—কোন আচমকা রসিকতা বা কবির-লড়াই-এর মত বাক্যরসের ফুলঝুরি থাকতে পারবে না। অর্থাৎ, যাঁদের আমরা আনন্দধামের অধিবাসী বলি, তাদের আনন্দ করবার অর্দ্ধেক উপকরণ আমরা কেড়ে নিয়েছি। এমন অনেকে আছেন, যাঁরা ইহলোকে থাকতেই সেই হাসিহীন অনন্ত জীবনের আশায়, এবং তার উপযুক্ত হবার জন্যে প্রাণের স্ফূর্ত্তি ও মুখের প্রফুল্লতা দুইই নির্ব্বাসিত ক'রে দিয়েছেন।

(৫)

—অধ্যাপক-বন্ধুটি বললেন, "একটা লিরিকের ভাব যখন আমার মাথায় ঢোকে, সে যেন বন্দুকের গুলির মত কপালটা ভেদ ক'রে আসে ; গুলি যখন এসে লাগে, তখন আমার গাল বেয়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়তে থাকে—মনে হয়, মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাসে হ'য়ে গেছে। তারপর, শির-দাঁড়াটা বেয়ে যেন একটা কেন্নুই সড়-সড় ক'রে নামতে থাকে ; তারপর যেন দম আটকে আসে ; তারপর বুকটা ধড়াস্ ক'রে উঠে ; তারপর হঠাৎ মুখখানা লাল হ'য়ে যায়, আর মাথার ভিতরে দপ্ দপ্ করতে থাকে ; তারপর একটি খুব বড় দীর্ঘশ্বাস, এবং সঙ্গে সঙ্গে কবিতাটি লেখা হ'য়ে যায়।"

আমি বললাম, "তা' হলে তোমাকে ঐ কবিতার জন্যে একটুও ভাবতে হয় না ? অমনি ক'রে হঠাৎ চ'লে আসে, বলছ ?"

"না, মোটেই তা' নয় ; আমি বলেছি—কবিতাটা লেখা হ'য়ে যায়, কাগজে কপি করার কথা তো বলিনি। এরকম কবিতামাত্রেরই যেমন একটা আত্মা আছে, তেমনি দেহও আছে। ঐ দেহটা, অর্থাৎ সেই কপিটাই লোকে পড়ে, প্রকাশক তারই জন্যে কবিকে পয়সা দেয়। কবিতার আত্মাটা অমনি একটা প্রবল বেগে কবির আত্মায় জন্মগ্রহণ করে ; কতকগুলো মিষ্টি কথার জট-বাঁধা একটা ভাব হ'য়ে কবির মাথায় আসে। ঐ রকম জন্মলাভ না করা পর্য্যন্ত সেই মিষ্টি কথাগুলো যেন পরস্পরকে ভালবেসেছিল মাত্র, এতদিনে তাদের পরিণয় হল ! কিন্তু তা' ব'লে ঐ বিয়ের বরযাত্রীর মতো দশ-বারোটা শ্লোক ধরা দেবে কিনা তার ঠিক নেই। তবে, যে-মুহূর্ত্তে কবির মুখখানা ফ্যাকাসে মেরে গিয়েছিল, তখন থেকে ঐ রকম একটা সম্ভাবনা হয়ে আছে বটে। প্রাচীনেরা কবি-কল্পনাকে যে একটা বাইরের জিনিস ব'লে স্থির করেছিলেন তা'তে আশ্চর্য্য হ'বার কিছু নেই। বাগ্‌দেবী বা সরস্বতী, কিম্বা একটা দৈবী প্রেরণা বা ভাবোন্মাদনা—সবই বাইরেকার জিনিস, অর্থাৎ, মানুষটার আপন সম্পত্তি নয়। কিন্তু আমি এমন কবিতা লিখিনে, যার কপিটাও সুপাঠ্য হয়ে ওঠে ; তা' আমি পারিনে, সেদিক দিয়ে আমি অপদার্থই বটে। যদি কখনো তেমন কোন কবিতা আমি কপি করে' থাকি, যা' পড়বার মতো, তা'হলে আমি তার বাহন মাত্র, কেবল মধ্যস্থের কাজ করেছি।"

ধর্ম্মশাস্ত্রের সেই ছাত্রটি জিজ্ঞেস কর্‌লে, "আচ্ছা, যে কবিতা ঐ রকম কাউকে ধরে, তার ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তাকে সেই ব্যক্তি কি নিজের মনে ক'রে খুসী হ'তে পারে ?"

আমি বল্‌লাম, "যতক্ষণ কবিতাটা তাজা থাকে, অর্থাৎ কবির রক্তের তাপটা তা'তে লেগে থাকে,ততক্ষণ যে তা'কে ভাল লাগে, এ আমি জানি। তারপর যখন কিছুক্ষণ পরে ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে, তখন আর তার প্রতি তেমন টান থাকে না।"

"অনেকটা আটার তৈরী কেকের মত আর কি !"—যার নাম জন, সেই ছেলেটা ব'লে উঠল।

—আলোচনাটা এই দিকে মোড় ফিরছে দেখে আমার ভালই লাগল, কারণ, ও বিষয়ে আমার কিছু বল্‌বার ছিল। মিনিট খানেক চুপ করে' আবার আরম্ভ কর্‌লাম।

--আমার বিশ্বাস, আমি মাঝে মাঝে যে-সব কবিতা তোমাদের প'ড়ে শোনাই, তার রস বেশ গভীর ক'রে তোমরা আস্বাদন করতে পারো না, কারণ, তখনো বড় কাঁচা কি-না,—বেশ মজে' ওঠেনি।

—কাঁচা বলতে আমি কি বুঝি ; তা' তোমরা বোধ হয় জানো না। কতকগুলো জিনিস আছে যাদের কিছুদিন ফেলে রাখলে, তবে ব্যবহারযোগ্য হয় ; আবার এমনও আছে যে, অনেকদিন ব্যবহার না করলে তাদের গুণ টের পাওয়া যায় না। এই শেষের দলে যারা পড়ে, তাদের মধ্যে আমি দু'টির নাম করব—বেহালা, আর কবিতা। বেহালা—আহা, Amati, কিম্বা Stradivarious-এর হাতের তৈরী সেই বেহালা ! কি মধুর তার আওয়াজ—স্বর্গীয় ! সেকালের বড় বড় ওস্তাদের হাতে বেজেছে কতদিন ধরে' ! শেষে ছড়ি আর ধরতে পারে না, আঙুল চালনা করবার শক্তি আর নেই—সেগুলো শক্ত হয়ে গেছে। তারপর কোন তরুণ অনুরাগীকে সে তার সেই বেহালাখানা দিয়ে গেল ; তার প্রাণে যত সুর ছিল সব সে ঐ বেহালায় বাজালো। কখনো তাকে দিয়ে গোপন-প্রেমের অস্ফুট গুঞ্জন করায়, কখনো তাকে অব্যক্ত কামনার রুদ্ধ আবেগে ক্রন্দন করায় ; কখনো গভীর ব্যথার আর্ত্তনাদে, কখনো বা অসীম নৈরাশ্যের হাহাকারে সে তাকে ঝন্‌ঝনিয়ে তোলে। যখন সে মরে' গেল, তখন সেই বেহালা হয়তো এক পুরুষ ধরে' কোন আর্ট-প্রেমিকের সংগ্রহশালায় ঘুমিয়ে রইল ; যখন সেই সংগ্রহ একদিন নীলামে বিক্রি হয়ে গেল, তখন সেই বেহালাখানা আবার

বেরিয়ে এসে হয়তো কোন রাজপ্রাসাদের অর্কেষ্ট্রায় সুরের ঝড় বহিয়ে দিলে—বাদক দলের অধিনায়ক যে, তার প্রবল কর-সঞ্চালনে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো তার তন্ত্রীগুলো। কখনো ঋণের দায়ে কারারুদ্ধ কোন সুরশিল্পীর হাতে নির্জ্জন কারাকক্ষে; কখনো বা মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনীর উৎসঙ্গে। আবার সেখান থেকে ফিরে' কোন উদ্দাম, অবৈধ ভোগ লালসার বিলাস মণ্ডপে; সেখানে সে এমন অট্টহাসি ও চীৎকারে অভ্যস্ত হয়েছে যে, মনে হবে, তার ভিতরে কতকগুলো প্রেত-পিশাচ বন্দী হয়ে আছে! তারপর সে আবার ফিরে এসেছে কোন নিরীহ সৌখীন সুরশিল্পীর হাতে, সে তাকে সবল রাগ-রাগিণী দিয়ে প্রকৃতিস্থ করেছে; আবার সে—সেই প্রাচীন ওস্তাদের হাতে যেমন, তেমনি সুরে বাজতে থাকে। যখন এমন একখানি বেহালা আমাদের হাতে আসে, তখন তার পরতে পরতে যেন সুর ভ'রে রয়েছে; সেই তন্ত্রীগুলিতে যত রাগ-রাগিণী এতকাল ধ'রে বেজেছে, তাদের রং-বেরঙের মাধুরী ঐ পুরণো বেহালাখানায় পুঞ্জীভূত হয়ে আছে!

—এখন কবিতার কথা। সেও ঠিক ঐ বেহালার মত পুরণো হওয়া চাই—বহুদিন ধ'রে' বহু পাঠকের সঙ্গে তার ভাব-বিনিময় হওয়া চাই। কবিতাও ঐ রকম শোষণ-ধর্ম্মী, তাই যত পুরণো হয় ততই রস-গভীর হয়ে ওঠে। আমার বক্তব্য এই যে, কবিতা যত খাঁটি হবে, ততই আমাদের প্রাণ ও মনের রস বেশি ক'রে শোষণ করতে পারবে,—আমাদের মনুষ্যত্বের যা-কিছু সার তা' সেই কবিতায় ঘনীভূত হয়ে উঠবে, যেমন—প্রেমের কোমলতা, পৌরুষের বীর্য্য, বেদনার বিষাদ, আশার উৎফুল্লতা; সে যেন তার নিজের রং ছাড়া আর একটা রং—সে রং সে পেয়েছে পাঠকদের থেকে। তা'হলে দেখতে পাচ্ছ, কোন কবিতার রস আমাদের সমস্ত সত্তাটা দিয়ে আস্বাদন করতে হ'লে বেশ কিছু সময় লাগে, কারণ তাকে এমন হ'য়ে উঠতে হবে, যে তার প্রত্যেক ভাবটির—প্রত্যেক চিত্রটির রঙে, যতদূর সম্ভব, আমাদের সমস্ত অন্তরটা ছুপিয়ে নিতে পারা চাই।

তারপর, সম্পূর্ণ নতুন কবিতার যে ছন্দ-ধ্বনি সেও একটা সদ্য-তৈরী বেহালার আওয়াজের চেয়ে মিষ্টি হ'তে পারে না।

* * * *

—খুব সামান্য একটা কিছুর থেকে কত বড় বড় সিদ্ধান্ত করা যায়! এর একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত হচ্ছে—মানুষের চালচলন, কথা-বলবার ভঙ্গি—অনেক

সময়ে দাঁড়ানো বা বসার ভঙ্গিও ; কিম্বা মুখের একটা বোল থেকেও তুমি গোটা মানুষটাকে বুঝে নিতে পারবে। জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা যেমন কেবলমাত্র একটা দাঁত বা পায়ের অস্থি থেকে কোন এক প্রাগ্‌ঐতিহাসিক অতিকায় জন্তুর সমস্ত আকৃতিটা অনুমান করতে পারেন, এও ঠিক সেই রকম। কোন ব্যক্তি আগে কি ছিল, পরেই বা কি হতে পারে তা অনুমান করা যেতে পারে—শুধু তার কথার একটা ভঙ্গি থেকে ; ঐ একটা কথাতেই তার শিক্ষা-দীক্ষা, তার মনের পরিচ্ছন্নতা এক আঁচড়েই ধরা পড়ে।

ধর্ম্মশাস্ত্রের ছাত্রটি ব'লে উঠল—"সে পরে কি হবে তাও জানা যেতে পারে ? কেন, যে ব্যক্তি 'টাকা' না বলে 'ট্যাকা' বলে, সে কি ভবিষ্যতে বড় হ'তে পারে না ?"

—পারবে না কেন, মশাই ? আমাদের এই গণতন্ত্রের সমাজে সবই সম্ভব। কিন্তু যে-ব্যক্তিকে ভবিষ্যতে একটা বড়-কিছু হ'তে হবে—সেই সম্ভাবনার জন্যেই, গ্রাম্য ভাষা এবং অশিষ্ট রীতি বর্জ্জন করার সুবুদ্ধি তার হবেই !

—আমি জানি, এই প্রাতরাশের টেবিলে বসে' আজ আমি যত কথা বল্‌ছি তাতে আমার মুখ থেকে দু'চারটে ভুল-শব্দ বেরোবেই, পরের দিন পর্য্যন্ত সেগুলো আমার মনেও পড়বে। জেনেশুনেও আমি যে এমন ভুল করে' বসি, তার জন্যে, ভাষার বিশুদ্ধি-রক্ষক যারা, তারা আমাকে ক্ষমা করবে না—এ কথা মনে হ'লে নিজের উপর ভয়ানক রাগও হয়। কিন্তু তাই ব'লে, সেই সব শুদ্ধাচারী ব্যক্তিকে দোষ দিতে পারিনে—আমি নিজেই তো ঐ রকম ভুল বা অপরিচ্ছন্ন ভাষাকে নিন্দনীয় মনে করি। তবে একটু তফাৎ আছে ; জানা সত্ত্বেও লেখায় বা বক্তৃতায় ঐ যে অসাবধানতা ঘটে সে এক রকম, আর ভদ্রবেশধারী ব্যক্তিদের ভাষায় ঐ যে গ্রাম্যতা বা অপরিচ্ছন্নতা যেন একটা অভ্যাসের মত বলেই মনে হয়—শিক্ষিত সমাজে তা একেবারে অসহ্য।...

অনেকে মাঠে বেড়াবার সময় দেখে থাকবেন, কোথাও একখানা বড় পাথর পড়ে আছে, কতকাল তা' কেউ জানে না। তার চারপাশ দিয়ে, যেন একটা বেড়ার মত, লম্বা লম্বা ঘাস উঠেছে। হয়তো একদিন হঠাৎ কারো মনে হ'ল—তেমন হওয়াও স্বাভাবিক—"বাঃ ওটা অনেকদিন ঐ রকম পড়ে রয়েছে !" অমনি ছড়ির আগাটা দিয়ে, কিম্বা পা'টা তলায় চালিয়ে দিয়ে পাথরখানা দিলে উল্‌টে ; নইলে যেন স্বস্তি হচ্ছিল না ! যেমন বাড়ীর গিন্নীরা তাওয়ার উপরে

কেকখানা উল্টে দেন—মনে করেন, এতক্ষণে ওপিঠের রংটা বেশ ঘোরালো হয়ে এসেছে। যাই উল্‌টে দেওয়া, অমনি পাথরখানার তলায় সে কি হুলুস্থুল বেধে গেল! প্রথমে, তলাকার সেই ঘাসগুলো, পাথরের তলায় চেপ্টে থাকার দরুণ একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেছে—যেন কেউ ধুয়ে ইস্ত্রি ক'রে দিয়েছে! তারপর, কতরকমের পোকা! কারো পিঠ শক্ত, কারো নরম; সব কিলবিল ক'রে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তারা সেই অন্ধকারে জন্মে অন্ধকারে বড় হয়ে উঠেছে। সেই জন্মান্ধ কীটগুলোর উপরে যাই সর্ব্বব্যাধিনাশক সূর্য্যকিরণ এসে পড়ল, অমনি সে কি হুড়োমুড়ি, হুটোপাটি! যাদের ঠ্যাং আছে, তারা ঠেলাঠেলি ঠোকাঠুকি করতে করতে, সামনের কোন বাধা না মেনে, মাটির তলায় কোন গর্ত্ত বা ফাটলের খোঁজে ছুটলো; ঐ সূর্য্যালোক তাদের পক্ষে বিষ! পরের বছর সেই জায়গায় দেখবে, নধর সবুজ ঘাস দুলছে; ডাণ্ডেলিয়ন ও বাটারকাপ ফুল ফুটে রয়েছে; তাদের সেই সোনারঙের ছোট ছোট গোল চাকতিগুলোর উপরে, যেন দেবদূতের মত সুন্দর ফড়িং এসে বসেছে; কোথাও বা প্রজাপতি ব'সে আছে—তাদের চিত্রিত চওড়া পাখা দুটি খুলছে আর বন্ধ করছে! দেখলে মনে হবে, সবাই যেন একটা মহত্তর জীবনের স্পন্দনে স্পন্দিত হচ্ছে।

—যে ছোকরাকে সবাই 'জন' ব'লে ডাকে, সে তার অভ্যাসমত মন্তব্য করলে (আমি তা' গ্রাহ্য করিনে—যদিও সময়ে সময়ে তাকে শাসন করা আবশ্যক মনে করি), আমি নাকি ঐ প্রজাপতি নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করছি।

—বললাম, কথাটা ঠিক নয়। ঐ যে সব উপমা—প্রজাপতি এবং বাকি সবগুলো—সকলেরই একটা মানে আছে। ঐ পাথরখানা হচ্ছে—অতি প্রাচীন কুসংস্কার, ঘাসগুলো হচ্ছে—মানুষের স্বভাব, যার উপর ঐ পাথরখানা চেপে থাকার দরুণ সেটা একেবারে বিবর্ণ অসাড় হয়ে গেছে; আর ঐ যে নানান রকমের কীট, ও হচ্ছে—যত কঠিন কুপ্রবৃত্তি, যা' অন্ধকারে বেড়ে ওঠে। বহুকালের পুরাণো ঐ মিথ্যে কুসংস্কারকে সত্যের লাঠি বা আর কিছুর চাড়া দিয়ে খুলে ধরার নামই হচ্ছে—পাথরখানাকে উল্‌টে দেওয়া; তা' সে মুখখানা শক্ত করেই হোক, আর আমোদ ক'রেই হোক। পরের বছর, মানে—পরবর্ত্তীকাল; তখন মানুষের যে স্বভাব এমন বিবর্ণ বিকৃত হয়ে পড়েছিল, তাই আবার সূর্য্যের আলো পেয়ে সতেজ ও দীর্ঘাকার হয়ে উঠবে, তার রংও হবে স্বাস্থ্য-সুন্দর। তখন সেই পুনরুজ্জীবিত মানব সমাজে স্বর্ণ বিহঙ্গেরা এসে বাসা

বাঁধবে। মাটির তলায় যে কীট দেহ লুকিয়ে ছিল, তার থেকে রঙীন প্রজাপতি বেরিয়ে এসে উপরকার বায়ুমণ্ডলে উড়ে বেড়াবে, ঐ ফড়িংগুলো যেন ঊর্দ্ধ লোকের সৌন্দর্য্য-দেবতা—তারা উড়ে এসে মানুষের আত্মার উপরে পাখা মেলে বসবে। ঐ পাথরখানা না সরালে এসব কিছুই হোত না!

—এ কথা মনেও ভেবোনা যে, কোন প্রাচীন মিথ্যা সংস্কার বা কু-বিশ্বাসের আবরণ উঠিয়ে দিলে, তার তলাকার ঐ সব অগণিত বীভৎস জীব কিল্‌বিল্ ক'রে উঠবে না, একটা ভীষণ হুটোপাটি লেগে যাবে না। একবার ডাঃ জনসন তাঁর একখানা প্রতিবাদ-পুস্তিকার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন হ'ল না দেখে নিরাশ হয়ে বলেছিলেন, "কই, আমাকে তো তেমন প্রাণ খুলে কেউ গাল দিলে না!" গাল দিলেই বুঝতে হবে —ওষুধটা ধরেছে। আঘাতের প্রতিঘাতটা যদি বেশ প্রবল না হয়, তবে জানবে সেটা ঠিক জায়গায় খুব জোরে লাগে নি।

—আমার কথার প্রতিবাদ করে কেউ যদি কাগজে ছাপায়? আমি তা'হলে কি করি? জবাব দেবো কিনা? না, আমি তার জবাব দেবো না। আমার অধ্যাপক-বন্ধু একবার আমাকে যা বলেছিলেন, সে আমি কখনো ভুলবো না। তিনি বলেছিলেন, সকল বাদ-প্রতিবাদে—বিজ্ঞানে যাকে 'হাইড্রস্ট্যাটিক প্যারাডক্স (Hydrostatic Paradox) বলে, তাই আছে।

সে জিনিসটা কি, তোমারা বোধ হয় জানো না? একটা কাঁচের নল যদি বাঁকানো হয় তবে তার দু'দিকে দু'টো ডাল হবে তো? এখন যদি তার একটা ডাল আমার এই পাইপের ডাঁটির মতো সরু হয়, আর অপরটা এত মোটা হয় যে, তাতে সমুদ্রের জলও ভ'রে রাখা যায়—তবু দু'টোতেই সেই জল মাথায়-মাথায় সমান হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। বাদপ্রতিবাদেও ঠিক তেমনি; অর্থাৎ, একদিকে যদি অতি বড় মূর্খ থাকে, তার অপরদিকে যদি মহাপণ্ডিত কেউ থাকে, তবু ঐ মূর্খটা পণ্ডিতের সমকক্ষতা লাভ করে; মূর্খটা সে কথা ভাল করেই জানে, তাই পণ্ডিতকে গাল দিয়ে তাকে ঐ রকম বাদ-প্রতিবাদে টেনে আনতে চায়।

—কে কার কাছে কেমন বাক্য আশা করতে পারে, তা'—আমার মতে—কিসের উপর নির্ভর করে, তোমরা জানতে চাও? আমি বলব ওর মূলে আছে —মনের উপর কতকগুলি প্রভাব, যেমন—সামাজিক, পারিবারিক, সাম্প্রদায়িক, এবং রাজনৈতিক। এ হ'ল এক ধরণের প্রভাব; দ্বিতীয় রকম প্রভাব হচ্ছে—

উৎকৃষ্ট খানার, অর্থাৎ যে সব ভদ্রলোক সমালোচনা-বিভাগে আছেন, তাঁদের মাঝে মাঝে উত্তমরূপে আহার করানো।

—একে ঘুষ বলতে পারো না। একজন দিচ্ছে বাছা-বাছা বিশেষণের প্রশংসা, আরেকজন দিচ্ছে উঁচুদরের ভোজ্য; তুই পক্ষই ভোজ দিচ্ছে—রীতিমত বিনিময়! একজন সেটা টেবিলের উপর সাজিয়ে দিচ্ছে, আরেকজন দিচ্ছে পত্রিকার পৃষ্ঠার উপরে। আমার মনে হয়, এই রকম ভোজের যে একটা মন-গলানো প্রভাব আছে, আমি তা' কাটিয়ে উঠতে পারতাম না। যদি কারো মুন আমি খাই—সেই মুনকে রসনা-তৃপ্তিকর করবার জন্যে; সে তারই আনুষঙ্গিক নানারসের উপাদেয় ভোজ্য প্রস্তুত ক'রে আমাকে খাওয়ায়, তা'হলে কিছুতেই আমি প্রাণ ধরে' তাকে গাল দিতে পারবো না। যদি তার সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতে হয়, তা'হলে আমার ভাণ্ডারে যত সুললিত শব্দ আছে—সব গেঁথে আমি তার গলায় ঘুঙুরের মালার মত পরিয়ে দেবো। এই যে সামাজিক সহৃদয়তার চর্চ্চা, এতেই সকলকে মিথ্যা-বাদী হ'তে হয়—খুব স্পষ্ট না হ'লেও কথাগুলোর সত্য-অংশটা অনেক পরিমাণে ভোঁতা হয়ে যায়।

—তোমরা কি মনে কর "আমাদের বিদেশস্থ সংবাদদাতার পত্র" ব'লে খবরের কাগজে যে-ধরণের মিথ্যা গল্প সাজিয়ে দেওয়া হয়—তাতে কারো কোন অনিষ্ট হয়? না, তা' হয় না; আমি তো অনিষ্ট হওয়ার কোন কারণ দেখিনে। 'আরব্য উপন্যাস' কিম্বা 'গলিভারের ভ্রমণ কাহিনী' প'ড়ে লোকে সুখ পায়, কিন্তু বিশ্বাস করে না—এও তেমনি।

(৬)

—মানুষের মস্তিষ্ক-যন্ত্রটা যত কম জটিল হয়—ততই তা' বন্ধুতার, এমন কি, তারো চেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের উপযোগী হয়। ঘড়ির কলকজাও যত বেশি হয়, ততই হাঙ্গাম বাড়ে—বড় সাবধানে ব্যবহার করতে হয়। প্রতিভাবান পুরুষদের হৃদয়ে যে সব প্রবল আবেগ উৎপন্ন হয়, সে হচ্ছে আত্ম-প্রীতির আবেগ। বড্ড বেশি অনুভূতিশীল যারা তাদের মনে অনেক রকমের ঝড় ওঠে—ভয়ানক আক্ষেপ-বিক্ষেপ হয়; তেমন মানসিক উপদ্রব থেকে মুক্ত যে মন, যে-মন খুব শান্ত ও স্বভাব-সরল—যা'তে কোন সূক্ষ্মতা বা জটিলতা নেই, সেই মনই হচ্ছে প্রেম বা বন্ধুতা করবার মন। আমি কিন্তু মনের কথাই বলছি, এমন কথা বলছিনে যে,

বুদ্ধির গভীরতা হ'লে ভালবাসা হয় না; তা'লে মানুষের একটা বড় গুণকে ছোট করা হয়। কিন্তু অপর পক্ষে, একথাও বলব যে, যার হৃদয়ের আবেগ বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে যায়—যেমন, ঐ অতিরিক্ত অনুভূতিপ্রবণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি—সে জীবনে অপর কোন একজনকে সুখী করতে না পারলেও জগৎকে কয়েক পৃষ্ঠা কাব্য বা কয়েকটা অতিমূল্যবান চিন্তা দিয়ে যেতে পারে।

—যার সঙ্গে তোমার হৃদয়ের অতি-নিকট সম্পর্ক ঘটেছে, সে যদি তোমার পাণ্ডিত্য, পড়া-শোনা, তোমার উচ্চ রস-চর্চ্চায় যোগ দিতে না পারে, তাতে কিছু আসে যায় না। মনের ঐ রকম সাথী যদি পেতে চাও, তার জন্যে কেতাব আছে—কত বিদ্বান মানুষ আছে। যতই বলনা কেন, জগতে যেখানে যত সত্যি-কার ভালবাসা বা বন্ধুত্ব হয়েছে,—সব ঐ বিদ্যাহীন, এমন কি নিরক্ষর লোকদের মধ্যে।

—কিন্তু প্রাণের সেই গভীর অনুরাগ তুমি যদি এমন একটা মাটির ঢেলার উপরে ঢেলে দাও—যা' সেই প্রেমের কিরণে একটুও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না, হাতে হাত, বা অধরে অধর রাখলে একটু সরস বা উষ্ণ হবে না—তার মত আত্ম-বলিদান আর নেই; সব চেয়ে তা' নিদারুণ হয় মেয়েদের বেলায়; অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারাই প্রেমের যজ্ঞ-বেদীতে ঐ রকম আত্মোৎসর্গ করে।

—একটু আগে যে কথাটা বলেছি—তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে; নিরক্ষর মূর্খ যারা, তাদের মধ্যেই বেশির ভাগ ঐ রকম ভালবাসা ও বন্ধুত্ব দেখতে পাওয়া যায়; অবিশ্যি দু'একটা ব্যতিক্রমও চোখে পড়ে। দেখ, বই আমিও ভালবাসি, সঙ্গী বা শিক্ষাদাতা হিসেবে তাদের মূল্য আমি একটুও কমাতে চাইনে। কিন্তু এ কথা স্মরণ না ক'রে পারি নে যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ যাঁরা তাঁরা শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ছিলেন না; এবং শ্রেষ্ঠ বিদ্বানেরাও শ্রেষ্ঠ মানুষ হ'তে পারেন নি। বই সম্বন্ধে আমার একটা কথা হচ্ছে এই। যে সব মানুষের মন সুস্থ ও শক্ত তারা সময়ে সময়ে অনুভব করবেই যে, মানুষের লেখা যত পুঁথি আছে—সব জড় করলেও, মানুষ তার চেয়ে বড়।

ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন যিনি, সেই ছাত্রটি ব'লে উঠলেন—"শেক্‌স্‌পীয়ারের চেয়ে যে নিজেকে বড় মনে করতে পারে—তার নিজের সম্বন্ধে ধারণাটা কিছু বেশি উঁচু বলতে হবে!"

আমি বললাম—"ভায়া হে, কথাটা কি জানো? যে-ব্যক্তি কখনো এমন কিছু

অনুভব করেনি যাকে সে বাক্যের অগোচর ব'লে বুঝতে পেরেছে, সে চিরদিন ঐ বাক্যের দাস হয়েই থাকবে। আমার বিশ্বাস হয় না যে, এমন মানুষও আছে! অত কেন? সঙ্গীতের অসীম শক্তির কথাই ধর না। ওর বাসস্থান হচ্ছে নিছক অনুভূতির ক্ষেত্রে—বুদ্ধির ক্ষেত্রে নয়। তার সেই ভাবগুলোকে অক্ষর দিয়ে বাঁধা যায় না—সে অনির্ব্বচনীয়! তবেই দেখ, মানুষের প্রাণের গভীরতম আবেগের সঙ্গে বাক্য-অর্থের সম্বন্ধ কতটুকু! 'রোমিও ও জুলিয়েট' পড়ে' কেউ যে শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে গেছে, এমন কখনো শুনেছ? কিম্বা ডেস্‌ডিমোনাকে ঐ রকম অসতী-অপবাদ দেওয়াতে কেউ আত্মহত্যা করেছে? আমি কিন্তু এক তরুণী বিরহিনীর কথা জানি, সে মাত্র কিছুদিনের জন্যে স্বামীর কাছ-ছাড়া হয়েছিল। সে সময়ে সে কোন হৃদয়বিদারক কবিতা লেখেনি। এমনিতেই মেয়েটি বড় ধীর ও নীরব-প্রকৃতির ছিল, তার সে সময়ের মনোভাব সে কারো কাছে ব্যক্ত করে নি। কিন্তু একটু একটু ক'রে তার রং ফ্যাকাসে হয়ে এল, সর্ব্ব-অঙ্গে কেমন একটা পাণ্ডুতা ছড়িয়ে পড়ল। অধিকাংশ মানুষের গভীর হৃদয়-ব্যথা প্রকাশ করবার ভাষা ঐ একটি—অমনি ক'রে শুকিয়ে শেষে ম'রে যাওয়া। তুমি শেক্‌স্‌পীয়ার-পড়ার কথা বলছ—তোমার মতে, শেক্‌স্‌পীয়ারই হচ্ছেন মানব-মনীষার উচ্চতম শিখর; তাই একথা শুনে আশ্চর্য্য হয়েছ যে, একজন সাধারণ মানুষেরও এমন অনুভূতি হতে পারে, যা' শেক্‌স্‌পীয়ারের কাব্যের ঐ বাক্যগুলার চেয়ে বড়! কিন্তু একটু ভেবে দেখ। একটা বালকের শেক্‌স্‌পীয়ার-পড়া আর কোল্‌রিজ বা হেগেলের পড়া অবিশ্যি এক নয়, ঐ দুই স্তরে অনুভূতির মাত্রাটা দু'রকম হবে। তবু দু'জনের পক্ষেই একটা কথা সত্য; যে একটুখানির বেশি নিতে পারে না, আর যে অনেক বেশি নিতে পারে—দু'য়েরই মনে নাটকখানা পড়ে যে অনুভূতি জাগে—তা' লেখককে ছাড়িয়ে যায়—লেখক যেমন বা যিনিই হোন। অর্থাৎ, লেখার মধ্যে লেখক যতটুকু লেখকের, পাঠকের ঐ ভাবাবেগের তুলনায় তা' ছোট না হ'য়ে পারে না।

—আমার মনে হয়, শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটক যারা পড়ে, তাদের অনেকেরই সেই রকম একটি উচ্চ ভাবাবস্থা হয়—যেমনটি নাকি গানের দ্বারা হয়। তখন তারা বইখানা ফেলে দিয়ে মনের সেই রাজ্যে প্রস্থান করে—যেখানে ভাষার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। আমরা—তুমি, আমি, সকলেই—খুব উজ্জ্বল বুদ্ধি বা বোধ-শক্তি দাবি করতে না পারি, কিন্তু আমরাও মাঝে মাঝে এমন একটা অতীন্দ্রিয়

ভাবরাজ্যের আভাস পাই, যেখানে—যতই বুদ্ধিহীন হই না কেন—পার্থিব জ্ঞানের শেষতম প্রান্তে একটা বিরাট চক্রপথ পরিভ্রমণ করতে থাকি।

—একথা কবুল করতে লজ্জা নেই যে, সময়ে সময়ে আমিও—সেই যে বন্ধুর কথা বলেছি, তার মত—ঐ কেতাবগুলোকে সহ্য করতে পারি নে। আমি পুঁথির চেয়ে জীবনকে বড় মনে করি। আমার মনে হয়, পৃথিবীতে প্রতিদিন যে লক্ষ লক্ষ জন্ম ও মৃত্যু ঘটছে, তার সেই সুখ-দুঃখ, প্রেম-হিংসা, জয়-পরাজয়ের কাহিনীতে গভীর মানবীয় মহিমার কাব্যরস যে-পরিমাণে সঞ্চিত হয়ে থাকে—পৃথিবীতে যত বই আজ পর্য্যন্ত লেখা হয়েছে সব একত্র করিলেও, ঐ রসের সমান হবে না। ঠিক এই মুহূর্ত্তে সমস্ত পৃথিবীময় যত ফুল ফুটেছে, এবং তার থেকে যে সুগন্ধরাশি স্বর্গের দিকে উঠছে, তার তুলনায়, মানুষ এ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ এসেন্স তৈরী করে' বোতলে ভরেছে, তা' নিতান্তই সামান্য বলতে হবে।

—তোমরা নিশ্চয় মনে কর, তোমাদের কাছে বা আর কোনখানে এই রকম সব কথা বলবার জন্যে, আমি বই পড়ে' সদ্য সদ্য তৈরী হয়ে আসি? না, অমন কাজ আমি কখনো করিনে। আমার একটা নিয়ম হচ্ছে এই যে, যে সব বিষয়ে আমি অনেকদিন ধরে' চিন্তা করেছি কেবল তাই সকলকে শোনাবো, 'আর নিজে শুনবো সেই সব কথা—যা কেউ সম্প্রতি ভাবতে সুরু করেছে। বিদ্যা আর গুঁড়ি-কাঠ এই দুটো বস্তুই বেশ কিছুকাল জলে-রোদ্দুরে শক্ত করে' নিয়ে তবে ব্যবহার করতে হয়। একটা ভাবকে মাথার ভিতরে ঠেলে দিয়ে, সে' ভাবটার গুরুত্ব অনুসারে—এক ঘণ্টা, একদিন, বা এক বছর তাকে আর নাড়বে না। পরে যখন সেটাকে বার করবে, দেখবে সে আর ঠিক তেমনটি নেই। একটা খুব সোজা, পরিচিত দৃষ্টান্ত নিলেই তো হয়; যেমন ধর—কথা কইতে কইতে হয়তো একটা নাম মনে এলো না; সেটাকে তখনই মনে আনবার চেষ্টা না ক'রে তুমি তোমার আলাপটা চালিয়ে যাও; ততক্ষণ তোমার ঐ মন কিন্তু অজ্ঞাতসারে কাজ করছে, তার প্রমাণ, তুমি হয়তো একটা সম্পূর্ণ অন্য কথায় এসে গেছ—এমন সময়ে হঠাৎ নামটা তোমায় মনে প'ড়ে যাবে।

* * * *

—আমার অধ্যাপক বন্ধুটি একদিন বড় মনমরা ভাবে কথা বলতে লাগলেন। প্রথমটা কিছুতেই অনুমান করতে পারছিলাম না—দুর্ঘটনাটা কি রকম এবং কোথায় ঘটেছে। শেষে জানলাম, কে একজন তাঁকে 'বৃদ্ধ' বলেছে! যখন তাঁর বয়স ২৫।২৬

ছিল, তখনো কেউ কেউ তাঁকে 'বুড়ো' ব'লে ডাকতো। সে হচ্ছে আদর করে ডাকা; কিম্বা বেশি চেনাশোনা থাকলেও ঐরকম ডাকতে পারে। আইরিশদের স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ঐ ব'লে ডাকে; স্ত্রী ডাকেন 'বুড়ো', স্বামী ডাকেন 'বুড়ী'। "কিন্তু সেদিন যা' শুনলাম—তা'তে তোমার কি মনে হয়? একজন অপরিচিত ছোকরা আমাকে উদ্দেশ ক'রে আড়ালে বলছে–'বৃদ্ধটি বড় ভালো লোক'। 'বৃদ্ধ' বলতে আমি এমন কাউকে বুঝি—যার মাথার উপরদিকটা চক্‌চক্ করছে, কেবল আশে পাশে কয়েকগাছি পাকা চুল; রাস্তায় চলবার সময়ে যার কোমর একটু বেঁকে যায়; হাতে একটা লাঠি—খুব সাবধানে আস্তে আস্তে পা ফেলে চলছে; যে লোক সব সময়ে সেকালের গল্প বলতে ভালবাসে এবং একালের লোকদের দুর্ব্বুদ্ধি দেখে হাসে বা রাগ করে; কতকগুলো নীরস নীতি-কথা আঁকড়ে পড়ে' আছে যে; রাত্রে যখন আর সবাই ঘুমোয় তখন সে জেগে থাকে; তার জীবনটাও রাত্রিকালের একটা ছোট মোম-বাতির মত;—যদি হঠাৎ উল্‌টে না যায় তো কোন রকমে বছরের পর বছর মিট্‌মিট করে' জ্বলতে থাকে। একেই আমি 'বুড়ো হওয়া' বলি।

"এখন তুমিই বল, আমার কি সেই অবস্থা হয়েছে? বরং এখনও আমার সে বয়সও হয়নি, যে বয়সটা, বালজাকের মতে–ওর নাম কি—সব চেয়ে আশঙ্কাজনক —বিশেষ করে' সেই সব মা-মাসীদের পক্ষে, যাদের মেয়েরা বড় প্রেম-কাতুরে।

আমি জিগ্যেস করলাম—"সেটা কোন্ বয়স?—সংখ্যা-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে?" অধ্যাপকবর বললেন—"বায়ান্ন"।

আমি বললাম, 'বালজাকের কিন্তু ভেবে দেখা উচিত ছিল, গ্যেটে তাঁর গল্পগুলোর সম্বন্ধে কি বলেছিলেন; তার প্রত্যেকটি যেন নারীর হৃদয় খুঁড়ে' বার করা হয়েছে! কিন্তু 'বায়ান্ন' যে বড় বেশি হ'য়ে পড়ল!'– বললাম, "অধ্যাপক-প্রবর 'তুমি ঐ জানালাটার আলোয় এসে দাঁড়াও তো।'

অধ্যাপক যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, 'তোমার চুল শাদা হয়েছে'। অধ্যাপক বললেন, 'আজ কুড়ি বছর ঐ রকমই আছে।' 'আর, চোখের কোনে ঐ যে 'কাক-নখ'– ঐ গভীর কুঞ্চন-রেখা?' শুনে অধ্যাপক হাসলেন। আমার বড় সুবিধে হল, কারণ, তা'তে সেই দাগগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল—আধ-ফোলা একখানা হাত-পাখার উঁচু দাঁড়াগুলোর মত সেই রেখাগুলো চোখের কোণ থেকে রগ পর্য্যন্ত প্রসারিত হ'ল। অধ্যাপক ব'লে উঠলেন, "ওসব

বাজে কথা! আমার হাতের গুলি দেখেছ?"—এই ব'লে জামার হাতাটা গুটিয়ে আমাকে তাঁর বাহু সবটা খুলে দেখালেন। আমি বললাম "একটু সাবধানে থাকবেন; এ বয়সে জামা খুলে' ঐ রকম ঠাণ্ডা লাগাবেন না! এক কালে তা' সহ্য হ'ত ব'লে এখন আর হবে না।' অধ্যাপক বললেন, "এসো, বাজি রাখছি—তোমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দাঁড় টানবো, হাঁটবো, ঘোড়া ছোটাবো, সাঁতার কাটবো।" আমি বললাম "অনেক সময় শক্তি না থাকলেও, সাহস থাকে।"

অধ্যাপক অপ্রসন্নভাবে বিদায় নিলেন। কয়েক হপ্তা পরে আবার হাসি-হাসি মুখে এসে হাজির—হাতে একটা লেখা। সেটা আমার কাছেই আছে, যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে, তার থেকে কিছু কিছু পড়ে' শোনাচ্ছি।

অধ্যাপকের প্রবন্ধ

বৃদ্ধ বয়স কখন আরম্ভ হয়, তাহা সকলেই বলিতে পারে। মানুষের দেহটা যেন একটা অগ্নিকুণ্ড, তাহাতে সত্তর বৎসরের কিছু কম বা বেশি ঐ আগুন জ্বলন্ত থাকে। একজন বড় রসায়ন-শাস্ত্রবিদ্ হিসাব করিয়া বলিয়াছেন, বৎসরে উহাতে তিনশত পাউণ্ড কার্ব্বন পুড়িয়া থাকে।

নামজাদা ফরাসী বিজ্ঞানীরা দেখাইয়াছেন যে, ত্রিশবছর বয়স পর্য্যন্ত ঐ দহন-কার্য্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, পঁয়তাল্লিশ পর্য্যন্ত সমানভাবে থাকে, তার পরেই হ্রাস পাইতে থাকে। যখন হইতে কমিতে থাকে, তখনই বার্দ্ধক্য সুরু হয়।

ডাঃ জনসন যে বলিয়াছিলেন,—পঁয়ত্রিশ হইতে জীবন-স্রোতে ভাটা সুরু হয়, তেমন হালকা কথা আমি জানি না। আমি বলিয়াছি, আরও দশ বৎসর ঐ আগুন পূর্ণতেজে জ্বলিতে থাকে। প্রাচীন রোমান-জাতি এই সত্যটির প্রায় কাছাকাছি পৌঁছিয়াছিল,—তাহারা সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইবার বয়স—১৭ হইতে ৪৬ ধার্য্য করিয়াছিল।

কিন্তু এসব হাঙ্গামায় কি কাজ? আগুন যখনই নিবিতে আরম্ভ করে, তখনই তো মানুষ বুড়া হয়। সেই বুড়া-বয়সের সহিত নূতন পরিচয়-কালে ভদ্রলোকের মত শিষ্ট-ব্যবহার করাই উচিত। পরিচয়টা এই ধরণের হইতে পারে, যেমন—

"মিঃ বৃদ্ধ বয়স, ইনি হচ্ছেন—শ্রীযুক্ত অধ্যাপক; শ্রীযুক্ত অধ্যাপক, ইনি হচ্ছেন—মিঃ বৃদ্ধ-বয়স।

বৃ-ব। শ্রীযুক্ত অধ্যাপক, আমি আপনার স্বাস্থ্য কামনা করি। কিছুদিন

ধ'রে আপনার সংবাদ আমি নিচ্ছিলাম, যদিও আপনি আমাকে চিনতেন না। চলুন, দু'জনে রাস্তায় একটু ঘুরে আসি।

অধ্যা। (একটু পিছাইয়া) তার চেয়ে আমার পড়বার ঘরে বেশ নিরিবিলিতে ব'সে দু'জনে আলাপ করলে কেমন হয়? আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এই যে আপনি বললেন, লোকে আপনাকে চিনবার আগে আপনি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক করেন—সে কেমন করে হয়?

বৃ-ব। আমার নিয়মই এই যে, অন্ততঃ পাঁচ বছর কারো সঙ্গে বসবাস না করে' আমি তার উপরে আমার পরিচয়টা চাপাই নে।

অধ্যা। তা'হলে আপনি বলতে চান যে, আপনি অতদিন আমার সঙ্গে বসবাস করেছেন!

বৃ-ব। হাঁ, তা' বই কি। তারও আগে আমার কার্ডখানা আপনাকে দিয়ে গিয়েছিলাম, আপনি তা' পড়ে দেখেন নি, অথচ সেটা আপনার কাছেই রয়েছে।

অধ্যা। কোথায়?

বৃ-ব। আপনার দুই ভুরুর মাঝখানে—ঐ যে তিনটি গভীর রেখা খাড়া-ভাবে টানা রয়েছে, ঐখানে। আপনার তর্জ্জনী ও মধ্যমা দিয়ে ভুরুর ভিতর দিককার দুই কোণ টিপে ধরে' আঙুল দুটো ফাঁক করুন দিকি' তা'হলে আমার হাতের ঐ স্বাক্ষর মুছে গিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমার কার্ডখানা রেখে যাবার আগে ওখানটা ঐরকমই ছিল।

অধ্যা। আপনি দেখা করতে এলে লোকে সাধারণতঃ কি ব'লে পাঠায়?

বৃ-ব। বলে, 'বাড়ী নেই'। তখন কার্ডখানি রেখে আমি চলে' যাই। পরের বছর আবার আসি, সেই এক জবাব পাই। তখন আরেকখানি কার্ড রেখে যাই। এমমনি পাঁচ কি ছ' বছর, কখনো দশ বছর, কিম্বা তারো বেশি যাওয়া-আসা করতে হয়। শেষে যখন কিছুতেই ঢুকতে দেয় না তখন জোর করে' সামনের দরজা ভেঙ্গে, কিম্বা জানালা গলিয়ে ঢুকে' পড়ি।"

কিছুক্ষণ এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল। তখন বৃদ্ধবয়স আবার বেড়াইতে যাইবার কথা উত্থাপন করিল। আমাকে একটা লাঠি, এক জোড়া চশমা, এবং এক জোড়া উঁচু বুট দিতেও চাহিল। আমি বলিলাম, ধন্যবাদ! আমার ও সবের প্রয়োজন নাই; আমি কেবল আপনার সহিত একটু আলাপ করিতে চাহিয়াছিলাম। এই বলিয়া, আমি পোষাক পরিয়া একাই গট্ গট্ করিয়া রাস্তায় বাহির হইলাম;

পরে পা মচ্‌কাইয়া আছাড় খাইলাম; ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইল; তারপর কোমরে বাত হওয়ায় বেশ কিছুকাল শয্যা আশ্রয় করিলাম;—তাহাতে সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিবার অবকাশ মিলিল।…

প্রথম যখন কেহ কাহাকে 'বুড়া' বলিয়া ডাকে তখন সে চমকিয়া উঠে।…

বুড়া বয়সের দুর্গতি আমরা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতাম না, যদি না দেখিতাম, আমাদের চারিপাশে আরও অনেকে আমাদের মতই, বা আমাদের চেয়ে দুর্গতি ভোগ করিতেছে। সকল বয়সেই আমরা আমাদের সমবয়সীদের কথাই ভাবি।

(৭)

—ধর্ম্মশাস্ত্র পড়ছে যে ছোকরা সে হঠাৎ জিগ্যেস করলে, "আচ্ছা, কবিদের প্রাণ সবচেয়ে খুলে যায় কিসে? আপনি কি বলেন?"

বললাম—কেন, এ তো পড়েই রয়েছে। ভেতর থেকেও যেমন একটা ঠেলা চাই, তেমনি বাইরেও উদ্দীপনার একটা কারণ থাকা আবশ্যক। শুধু একটাতেই কাজ হয় না। সূর্য্যের আলো না পেলে গোলাপ ফোটে না, তেমনি ফার্ণের ফুলও যে কোন স্থানে দেখা দেবে না।

—কবির প্রাণের পক্ষে সূর্য্যের আলো কি রকম হওয়া চাই? সে আমি বলবো না। তেমন আলো অনেককে নষ্ট করেছে—অনেকেই শেষ পর্য্যন্ত ফুটে উঠতে পারে নি।

"তেমন আলো কারা?"—কথাটা জিগ্যেস করলেন স্কুলের শিক্ষয়িত্রীটি।

বললাম, মেয়েরা। তাদের ভালবাসাই কবির প্রাণে প্রথম উদ্দীপনা সঞ্চার করে, তাদের প্রশংসা পেলেই তাঁরা ধন্য হন।

শুনে শিক্ষয়িত্রীর মুখ একটু রাঙা হয়ে উঠল বটে, কিন্তু তিনি খুসী হয়েছেন বলে' মনে হ'ল। জিগ্যেস করলেন, আমি কি সত্যই তাই বিশ্বাস করি? বললাম, হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস তাই। অন্ততঃ আমি—যতক্ষণ না তাঁদের খুসী করতে পারি, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হতে পারিনে। মেয়েরা কবিতার দোষগুলো ধরতে পারে না বটে, কিন্তু তারাই সকলের আগে কবিতার রং আর গন্ধ টের পায়। ঐ একই বোধশক্তি পুরুষের বুদ্ধিতে জুড়ে দাও—সেটা হবে ধনুকের ছিলে, আর মেয়েদের বুদ্ধিতে যুক্ত হ'লে সেটা হবে—বীণার তার।

—যাকে সৃষ্টিশক্তি বলে, সব কবির তা' থাকে না। কিন্তু প্রত্যেক সাহিত্যে তেমন কবি অনেক মিলবে যারা অতিশয় ভাবপ্রবণ—সেই ভাবগুলোকে তারা তাদের কবি-স্বভাবের বশে বড় কোমল মধুর সুরময় ভাষায় প্রকাশ করতে পারে।

যে গুলোর মাথায় ঐ সৃষ্টিশক্তি থাকে সেগুলোর প্রত্যেকটি বিধাতার নিজের হাতে-গড়া; আর যারা ঐ রকম ভাবপ্রবণ ব'লে কবি হয়, তাদের তিনি সেই একই মাটি দিয়ে গড়েন বটে, কিন্তু হাত দিয়ে নয়—ছাঁচে ফেলে।

ধর্ম্মশাস্ত্রের ছাত্রটি জিগ্যেস করলেন, "আপনার কি মনে হয়, যাঁরা প্রতিভাশালী কবি তাঁরা কোনরকম নেশার শরণাপন্ন হন না?"

মানুষমাত্রেই সাধারণতঃ এই ক'রকম নেশার বশীভূত হয়, যথা—গান, কবিতা, বা ধর্ম্ম; আবার অনেকেই প্রেমের নেশায় বুঁদ হ'য়ে থাকে। একটা না একটা নেশা চাই-ই; একজন বিখ্যাত মহিলা বলেছিলেন যে, একবাটি ঝোল খেয়েও তাঁর নেশার উদ্রেক হয়।

একটা কথা তোমরা শুনে রাখ—আমি মাঝে মাঝে একটা আড্ডায় যাই—সে হচ্ছে কয়েকজন প্রতিভাবান পুরুষের মজলিস; যেখানে যে রকমের ভাবুকতা ও হৃদয়াবেগের ঝড় বইতে থাকে, তা' মদের চেয়েও উত্তেজক,—তারই প্রতিষেধকরূপে আমি মদ খাওয়া আবশ্যক মনে করি।

মদ খেয়ে একেবারে উচ্ছন্ন গেছে এমন মানুষ আমি খুব বেশি দেখিনি; যে ক'জনকে আমি মদ খেতে দেখেছি, তারা বদ্ধ মাতাল হবার আগেই অধঃপাতে গিয়েছে।

* * *

এমন সব সুন্দরী আছেন, সুন্দরী হ'লেও সুরসিকা ন'ন—তাঁরা রাস্তায় চলবার সময়ে কি রকম ব্যবহার করতে হয় জানেন না। স্বভাবই বল, আর সামাজিক একটা অভ্যাসই বল—কোন সুন্দর মুখের পানে পুরুষমাত্রেই অন্ততঃ দু'বার চাইবে, তাতে ভদ্রতা বা ভক্তির হানি হয় না। প্রথমবারের চাওয়াটা হচ্ছে প্রয়োজনের বশে—রাস্তায় কেউ সামনে পড়লে তাকে পাশ কাটিয়ে যাবো কি না তা' ঠিক করতে হবে তো? যদি সেই প্রথম দেখাটায় এমন কোন চেহারা চোখে পড়ে যা' দেখলে চমকে উঠতে হয়, তা'হলে দ্বিতীয়বার চাওয়াটা অন্যায় নয়; অবিশ্যি হাঁ করে অসভ্যের মত তাকিয়ে থাকা নয়—দৃষ্টিটা হবে প্রশংসাপূর্ণ, যেমন

সামনে দিয়ে কোন দেবীর মূর্ত্তি নিয়ে গেলে তার দিকে লোকে চেয়ে থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এমন অনেক গ্রাম্যস্বভাবের সুন্দরী যুবতী আছেন, যাঁদের দিকে ঐ রকম চাইলে তাঁরা যেন মূর্চ্ছা যান! কিন্তু সত্যিকার বড়ঘরের মেয়ে যাঁরা তাঁরা রাস্তায় বেরোবার সময় ঐ সব মান-অভিমান ঘরেই ফেলে রেখে যান। তাঁরা বেশ জানেন যে, রাস্তা হচ্ছে একটা চিত্র-প্রদর্শনী, সেখানে বনেটের ফ্রেমে বাঁধা যত সুন্দর মুখ দেখাবারই জিনিস এবং তা' দেখবার অধিকার সকলেরই আছে।...

—আমার অধ্যাপক বন্ধুটির মাথায় কতগুলি ডিম্বের আবির্ভাব হয়েছে। [কথাটা শোনবামাত্র সকলে উচ্চহাস্য করে উঠলেন, আমি তা'তে কান দিলাম না।] অন্ততঃ পাঁচ-ছ'জন পুরুষের মস্তিষ্ক-পাত্রে ঐ রকম বীজ-ডিম্ব উৎপন্ন হয়, যার থেকে পরবর্ত্তীদের—কিম্বা একটা শতাব্দীর—সভ্যতা ও চিন্তাধারা জন্মলাভ করে। সেই সব ডিমগুলোকে তখনও পুঁথির আকারে পাড়বার সময় হয়নি, এমন কি, মুখের বাক্যেও তা' দেবার যোগ্য হয়নি। তাই সেই রকম লোকদের সঙ্গে ক্রমাগত মেলামেশা ক'রে, নানান উপায়ে, ঐ প্রাথমিক চিন্তা-বীজগুলো আদায় ক'রে নিতে হয়। তখন সে সব চিন্তার আকারও অপরিস্ফুট; ছাঁচও এমন নতুন যে, চিনতে পারাই মুশকিল,—বেশ কিছুদিন লাগে তার অর্থ বুঝতে। তবু তাদের সঙ্গে ঐ রকম আলাপ করা ছাড়া উপায় নেই—কথাগুলো যে তখনো বইতে ধরা দেয়নি!

শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলে উঠল—"কিন্তু টাটকা মিথ্যাগুলো তো চট্‌পট বইএর ভিতরে ঢুকে পড়ে!"

কথায় বাধা দিলেও, আমি সমানে বলতে লাগলাম।—আমার অধ্যাপক-বন্ধু বলেন, যে সব চিন্তা কথায় বা লেখায় ব্যক্ত হয়, তা' মল-মূত্রের মত; অপরের পক্ষে তা' দুধ বা বিষ হ'তে পারে, কিন্তু সেটা এমন একটা বস্তু—যা ঐ ব্যক্তি প্রথমে নিজে হজম করে', পরে বাইরে ফেলে দেন। কোন একটা চিন্তা যেই মনের মধ্যে বেশ পেকে উঠেছে, অমনি সেটাকে স্বভাবের বশেই লোকে মুখের আলাপে, কিম্বা বইএর লেখায় বিদেয় করে দেবার চেষ্টা করে; কিন্তু যখন সেটা বীজেরও-বীজ-আকারে মাথার ভিতরে বসে' থাকে—ফুটে ওঠবার একটা সম্ভাবনা মাত্র আছে—তখন সেটাকে তাঁর কাছ থেকে বাগানো বড় শক্ত!

তোমরা হয়তো জিগ্যেস্ করবে, এই রকম ডিম্ব-বীজ কাদের মস্তিষ্কে সবচেয়ে

বেশি আছে? আমি তেমন ব্যক্তিদের নাম করব না। ঐ সব নতুন নতুন চিন্তার উৎপাদক যারা তাদের সংখ্যা খুবই কম; যারা সেইগুলোর দালালী করে তাদের সংখ্যাই বেশি। আবার, যারা তার খুচরো-কারবার করে তারা তো অগুন্তি! সাধারণের কাছে, এরা সবাই এক দরের লোক—সবাই মিলে এক-সঙ্গে এমন জট পাকিয়ে আছে যে, বেশ কিছুকাল কেটে না গেলে সেই জট খুলতে যাওয়া বৃথা; তাই সেই সব চিন্তার আদি মনীষী আর ঐ সব, দালাল আর দোকানদার সবাই সমান হ'য়ে আছে।

(৮)

—আমি আমার মনের বাগান থেকে বাছাবাছা ফুল তুলে তোমাদের হাতে অনেকবার দিয়েছি, কিন্তু এইবার আমি সেই বাগানেরই কয়েকটি অন্য জিনিস তুলে আন্‌ছি, ইচ্ছে হয় তোমরা তাকে নিতান্ত বাজে জিনিস ব'লে ফেলে দিও। কিন্তু তবু—তবু—এগুলো ফুলের চেয়ে এক হিসেবে দামী; ফুল না হ'লেও ফুলের বীজ বটে! অনেক মালী সামান্য কিছু বক্‌সিস্ পেলেই বাগানের সেরা ফুল তুলে তোড়া বেঁধে দেবে, কিন্তু কোন দামী ফুলের বীজ সে সহজে হস্তান্তর করবে না।...

পড়ে' যদি কারো হাসি পায় আমি কিছু বলব না, তার সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হবে তা'ও তাকে জান্‌তে দেব না; কিন্তু তোমাদের কেউ যদি নিজেরও এমনি সব ছোট ছোট সুমধুর স্মৃতিকথার রস দিয়ে রসিয়ে নিয়ে এর প্রাণটার ভিতরে প্রবেশ করতে পারো, তা'হলে বুঝবো, সে একজন সত্যিকার কবি,—অর্থাৎ, এরপর সে আর কখনো কবিতা লিখতে চাইবে না; যে সব গুণ থাকলে কাউকে একটা বড় উপাধি দেওয়া যেতে পারে—আমার মতে, এরপর ঐ রকম প্রলোভন ত্যাগ করতে পারা—তার মধ্যে একটি।

স্কুলের শিক্ষয়িত্রী তাঁর চেয়ারখানায় একটু নড়ে' বসলেন—মুখের একটি পাশ আমার দিকে ফিরিয়ে। [তাঁর বুকে যে পিন্‌টা দেখা যাচ্ছে, তার সঙ্গে কয়েকটা পাকা চুল জড়ানো রয়েছে—নিশ্চয় তাঁর মায়ের। আমার স্পষ্ট মনে আছে, তিনি যেদিন প্রথম এই বোর্ডিং-এ আসেন, তখন গৃহস্বামিনীর কন্যা আমাকে বলেছিল যে, তিনি সম্প্রতি একটা বড় শোক পেয়েছেন। তাই বুঝি তাঁর মুখ এমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল? আহা, মহাগুরুর সেবা—অন্তিমকালের সেই মাতৃ-সেবা—কত বড়

কাজ! নিজের দেহের রক্ত শুকিয়ে তিনি সেই মুমূর্ষু মাকে কিছুদিন বাঁচিয়ে রেখেছিলেন; শুধু গাল দু'খানি কেন—ভিতরের বুকটাও যে তা'তে শীর্ণ হয়ে যায়! এমন পুণ্যবতীরা ধন্য! আমাদের সকলেরই শেষ আশ্রয় হবে—এঁদেরই দু'খানি কোমল সেবা-নিপুণ হাত, আর করুণাভরা হৃদয়।]

আমি বললাম, তোমাদের কাছে আমার বিগত-জীবনের দুই একটি কথা বলব—তেমন ব্যক্তিগত কথা সকলে বলে না, কিন্তু তোমাদের কি তা' ভাল লাগবে?

শিক্ষয়িত্রী বললেন, "শুধু ভাল লাগবে? প্রাণ ভরে' শুনবো!"

বড় মিষ্টি তাঁর কণ্ঠস্বর, সে সময়ে যেন আরো ভাল লাগল। ধর্ম্মশাস্ত্রের সেই ছাত্রটি বললেন, "আমরা শোনবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।"***

প্রথমেই বললাম, আমার জীবনে কেবল দু'বার দুটি কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম—সে এত মিষ্টি যে শুনতে ভয় হয়।

"ভয় হয়!" শিক্ষয়িত্রী বলে উঠলেন।—হাঁ, আমি রীতিমত ভয় পেয়েছিলাম। শুনে মনে হয়েছিল, এমন মেয়ে থাকতে পারে, যার কণ্ঠস্বর যেন কোন একটি পুরুষের হৃদয়তন্ত্রীর সঙ্গে একসুরে বাঁধা; সেই কণ্ঠস্বর একবার মাত্র শুনে' তেমন মেয়ের সঙ্গে সে যমের বাড়ী যেতেও কিছুমাত্র ইতঃস্তত: করবে না। সেই দুই কণ্ঠস্বর কাদের? দু'জনেই জার্ম্মান মেয়ে। একজন ছিল হোটেলের পরিচারিকা—তার চেহারা এমন-কিছু নয়। আমার ঘরের চাবিটা পাওয়া যাচ্ছিল না; তখন সেই টিউটন-নন্দিনীকে ডাক পড়ল। সরলা কুমারীটি বোধ হয় সদ্য দেশ থেকে এসেছে—তার কথায় পল্লীগ্রামের টান এখনও রয়েছে; চাপতে গিয়ে পারে না, তাই ভারি মিষ্টি শোনায়। সে যখন সেই কণ্ঠের মৃদু কলধ্বনিতে তার সরল প্রাণের দুঃখ ও বিস্ময় প্রকাশ করলে, তখন মনে হল, চাবিটা যেন তার সন্তান, চাবিটাও মা-হারা হয়েছে! যদি তার মুখ ও দেহের লাবণ্য সেই কণ্ঠস্বরের সমান হ'ত, তা'হলে একথা বলতে পারি—"

শিক্ষয়িত্রী আমার কথায় তাঁর চক্ষুদুটি এমন বিস্ফারিত করলেন যে, আমাকে একটু থেমে যেতে হল।

আমি বলতে যাচ্ছিলাম—তা'হলে আমি জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতাম।

দ্বিতীয় যে কণ্ঠস্বরের কথা বলেছি—সেও আর এক জার্ম্মান রমণীর। জানি,

একথা বললে রক্ষা থাকবে না যে, আমেরিকার জলমাটিতে কারো কণ্ঠস্বর তেমন মিষ্টি হ'তে পারে না।

শিক্ষয়িত্রী জিজ্ঞেস করলেন "সেই কণ্ঠে এমন কি ছিল?"

বলব কি, তাঁরও কণ্ঠস্বর এমন মিষ্টি মনে হ'ল যে, আমার সেই দণ্ডেও ভুল সংশোধন ক'রে বলা উচিত ছিল—না, দুটি নয়, তিনটি কণ্ঠস্বর আমায় মুগ্ধ করেছে। তা'হলে একটু আগে নিজের দেশের প্রতি যে নেমক্‌হারামি করেছি তা' করতে হ'ত না। বললাম, "আর কিছু নয়,—তাতে পরিপূর্ণ নারীত্বের একটি অপূর্ব্ব প্রকাশ ছিল!"

এই যে দুটি সুধাকণ্ঠ শুনেছিলাম তার থেকেই আমার মনে একটা ধারণা জন্মেছিল যে, স্বর্গে যাবার সময়ে সেই মুক্তোর দরজা দিয়ে ঢোকবার কথা যদি সত্য হয়, তা'হলে সে সময়ে দরজার ভিতর দিক থেকে যে সঙ্গীতের ধ্বনি কাণে আসবে, তা' নিশ্চয় এই রকম!

শিক্ষয়িত্রী বললেন, "আমার দিদির গলা যদি শুনতেন আপনি!"

বল্‌লাম, "যদি আপনার মত হয়, তবে সে যে খুব মিষ্টি, তাতে সন্দেহ কি?"

তিনি বললেন, "আমার গলা যে এমন-কিছু তা' কখনো মনে হয়নি।"

"আপনি তা' বুঝবেন কেমন ক'রে? মানুষে যেমন নিজের মুখ নিজে দেখতে পায় না, তেমনি নিজের কণ্ঠস্বর কেমন তা' কখনো জানতে পারে না। কণ্ঠস্বরের আয়নাও নেই। অবিশ্যি, আমরা যখন কথা কই, তখন তার একটা আওয়াজ আমাদের কাণেও আসে, কিন্তু লোকে যেমনটি শোনে সে তেমনটি নয়। আমার বিশ্বাস, যদি কোন একটা অপর মূর্ত্তি আমার গলায় কথা কয়, তাকে কিছুতেই আমার গলা ব'লে মনে হবে না।

*　　*　　*　　*

সবাই চ'লে গেলে, শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে আরও দু'একটি কথা হচ্ছিল, এমন সময়ে, যে ছোঁড়াটার নাম জন, হঠাৎ সে ঘরে এসে ঢুকলো, শিক্ষয়িত্রীও একটু পরে চ'লে গেলেন। ছোঁড়াটা তখন একটা চেয়ারে বসে', আরেকটার উপরে পা দু'টো তুলে দিয়ে বলতে লাগল—

"খাসা দেখতে মেয়েটিকে, না?"

আমি বল্‌লাম "বড় ভদ্র"!

"একটা কতবড় স্কুল চালাচ্ছে! খুব নাম হয়েছে। কত কি পড়ায়—ল্যাটিন,

ইটালিয়ান ; আবার গানও শেখায় ! খুব বড় ঘরের মেয়ে, হঠাৎ অবস্থা খারাপ হ'য়ে পড়ে। তখন কিছুমাত্র দমে' না গিয়ে সোজা ঐ কাজটা নিলে ; কাজেও এমন দড়, যেন ঐ কাজের জন্যেই ও জন্মেছে। হ্যাঁ, একখানা মেয়ে বটে ! ওকে আমি নিশ্চয় বিয়ে করতাম, কিন্তু উপায় নেই যে ! তা'হলে আরও দুটো-তিনটে গলায় দড়ি দেবে।"

আমার বোধ হয়, ছোঁড়াটার এতবড় একটানা বক্তৃতা আমি আর কখনো শুনিনি। ওর কথাগুলো একটুও বদলাতে পারলাম না, তার কারণ—সেই যে ম'সিয়ে বুকোঁ বলেছেন—"ষ্টাইলটাই হচ্ছে মানুষ"—এ হচ্ছে তারই একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত।

* * * *

—আমার মনে হয় না যে, আমি সত্যিই কাউকে ঘৃণা করি। একথা অস্বীকার করব না যে, কারো কারো চেহারা দেখলে আমার মেজাজ বিগড়ে যায় ; কিন্তু যে সব দোষের জন্যে ভিতরকার মানুষটাকে লোকে ঘৃণা করে—হঠাৎ কোন কারণে রেগে না গেলে আমি তেমন মন্দ মানুষকেও সুচক্ষে দেখি। তবে ঐ যে বললাম, কারো কারো চেহারা মোটেই ভালো লাগে না, তাই ক্রমে সে সব লোকের সঙ্গ ত্যাগ করি—যেমন লোকে কাণা-খোঁড়া দেখলে করে ; ভালবাসলেও তাদেরকে ঘরের বাইরে রাখি।

ধর্ম্মশাস্ত্রের ছাত্রটি জিজ্ঞেস করলে, মানুষে-মানুষে যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ, কিম্বা স্বাভাবিক বিকর্ষণের ভাব থাকে তার সম্বন্ধে আমার মত কি ? প্রথম দর্শনেই যে প্রেম হয়, একথা আমি মানি কিনা ?

বললাম, দেখুন মশাই, সব পুরুষই সব মেয়েকে ভালবাসে, ওটা একরকম স্বতঃসিদ্ধ। প্রকৃতির আদালতে এই আইন মেনে নেওয়া হয়েছে যে, পুরুষমাত্রেই মেয়েমানুষকে ভালবাসবে, যদি না বাসে তবে তাকে তার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। আমার একখানা খুব পুরণো আইন-গ্রন্থ আছে তাতে বলছে, সে ক্ষেত্রে পুরুষ অনেক রকমের সাফাই দিতে পারে ; যথা—(১) সে ঐ অভিযোগকারিণীকে কখনো দেখেনি ; (২) তার বয়স বড় কম ; (৩) কিম্বা বড় বেশি ; (৪) তার চেহারার কতকগুলি দোষ আছে—ভয়ানক কালো, কিম্বা মুখশ্রী বড়ই বিদ্‌ঘুটে ; (৫) তার ভালবাসার পরিধি বা পরিসর বড় সংকীর্ণ—ইতিমধ্যেই সেটুকু আরেকজন দমন করেছেন। এমনি আরও আছে। কিন্তু তৎসত্বেও মানতে হবে

যে, প্রত্যেক পুরুষ তার স্বভাবধর্ম্মে, এবং কর্ত্তব্যের শাসনে, প্রত্যেকটি মেয়ে-মানুষকে ভালবাসতে বাধ্য। অতএব ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াচ্ছে—প্রত্যেক মেয়েমানুষ যেন প্রত্যেক পুরুষকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বলছে, সে তাকে ভালবাসে না কেন—তার কৈফিয়ৎ দিক্। ঠিক যে স্পষ্ট কথায় বা লিখিত ভাষায় সে কথা বলছে তা' নয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কতকগুলো সাঙ্কেতিক উপায় আছে, যথা—সোণার গহনা, সিল্কের পোষাক এবং আরও অনেক কিছু। সেইগুলোই পুরুষকে ডেকে বলে—আমার দিকে চেয়ে দেখ, এবং যা' কর্ত্তব্য তাই কর—অর্থাৎ আমাকে ভালবাসো। পুরুষও বারবার নানারকমের ওজর করে, অক্ষমতার নানা কারণ দেখায়। এই পর্য্যন্ত সেই আইনের বইখানাতে লেখা আছে; কিন্তু এর পরেও একজন প্রাচীন পণ্ডিতের উক্তি আছে যে, প্রত্যেক নারীও প্রত্যেক পুরুষকে ভালবাসে—যদি তেমন কোন বিঘ্ন না থাকে।

(৯)

শিক্ষয়িত্রী তাঁর উপরের ঘর থেকে নেমে এলেন,—তাঁর চুলে একটি গোলাপ, জুনমাসের সদ্য-ফোটা লাল গোলাপ। তিনি সকালে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, তাই আরও দুটো গোলাপ সঙ্গে ক'রে এনেছেন—তাঁর দুই গালে। সে কথা আমি তাঁকে বললাম—যতটা সম্ভব মিষ্টি ক'রে, এবং উপলক্ষটার উপযোগী করে। তাতে তাঁর গালের রং বসরাই গোলাপের মত লাল হয়ে উঠল। বললাম, আপনি প্রাতরাশের পর আমার সঙ্গে একটু বেড়াতে যাবেন—সেই এল্‌ম-গাছগুলো দেখতে? ঐ গাছের গল্প আগে একবার করেছিলাম। মিথ্যে বলব না, তাঁর প্রতি ভদ্রজনোচিত একটু যে অতিরিক্ত শ্রদ্ধা আমার ছিল, ঐ কথায় তা' প্রকাশ করে ফেলেছিলাম; সেটা ঐ রকম বোর্ডিঙের সমাজে একটু বাড়াবাড়ি বটে; তাই তিনি যে লজ্জায় লাল হয়ে উঠবেন—এমন আশা করা অন্যায় হয়নি। হ'ল ঠিক তার উল্টো; তাঁর মুখখানি যেন একটু ম্লান হ'য়ে উঠল, একটু পরেই হাসিমুখে বললেন, "বেশ তো!" কিন্তু তিনি স্কুলটার দিকেই যাবেন; এই ব'লে তাঁর বনেটটা আনতে গেলেন। একটু পরেই নেমে এলেন—মাথায় কোন বাহারে টুপি নয়—সেই অশৌচকালে পরবার টুপি। তবু সেই টুপিতে-ঘেরা মুখখানি বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল—হাতে একখানি স্কুলপাঠ্য বই।

যুবতী শিক্ষয়িত্রী সঙ্গে আমার প্রথম প্রাতঃভ্রমণ

রাস্তার এক্‌টা মোড়ে এসে তিনি বললেন; 'এই পথ দিয়ে গেলে শীঘ্র পৌঁছনো যাবে—সব চেয়ে সোজা পথ এইটে।' আমি বললাম, 'তা' হ'লে ওটা দিয়ে যাবো না'। শিক্ষয়িত্রী ঠাকৃরুণ একটু হেসে বললেন, "আচ্ছা, আমার এখনো প্রায় দশ মিনিট হাতে আছে, একটু ঘুরে' যাওয়া চলবে।"

আমরা একটা এমন স্থানে এসে দাঁড়ালাম—যার চারিদিকে বাড়ী। আমি বললাম "ঐ দিকে তাকিয়ে দেখুন—ঐ যে ওদিককার কোণের বাড়ীটা, ঐখানে আমার অধ্যাপক-বন্ধু অনেকদিন বাস করেছিলেন। ক'দিন হ'ল, তিনি ঐ দেহটা ত্যাগ করেছেন।"

"দেহত্যাগ!"

আমি বললাম, তা' নয়তো কি? আমরা মরবার সময় যেমন দেহত্যাগ করি, বাড়ী ত্যাগ করাও তেমনি দেহত্যাগ নয় তো কি? মানুষ যখন বাড়ীটাতে আর সুস্থ থাকে না, তখনই সেটা ত্যাগ করে—ঠিক যেমন আত্মা যখন দেহের জরা আর সহ্য করতে পারে না, তখনই সেটাকে ছেড়ে যায়। দেহটাকে যেমন আমাদের বাসা-বাড়ী বলা হয়—যে-বাড়ীতে বাস করি, সেও তেমনি দেহ নয় কি?

সেদিন অধ্যাপক আমাকে যা' বলেছিলেন, তা' শুনবেন?

"হাঁ, বলুন না।"

অধ্যাপক বলেছিলেন, "বাহিরের যতখানির সঙ্গে মানুষের মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—তার অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তির অধীন যেটুকু এবং যতখানি—তাই তার দেহ। ঐ ছোট ঘরখানা—যেখানে ব'সে আমি আমার প্রবন্ধগুলো লিখেছিলাম, ওটা আমার দেহেরই অংশ; একজন পক্ষাঘাত-রোগীর হাত-পা, যদি তার দেহের অংশ হয়—তবে তার চেয়ে বেশি।

"পেঁয়াজের যেমন খোলা—একটার উপর আরেকটা সাজানো থাকে, মানুষের আত্মাটাকে ঘিরে' তেমনই কতকগুলি এক-কেন্দ্রিক খোলা বা খোলস সাজানো আছে। প্রথম—তার ঐ রক্ত-মাংসের প্রকৃতিদত্ত পোষাকটা; তার উপর একটা কৃত্রিম পোষাক—সরু-মোটা সুতোয়-বোনা; তৃতীয় খোলসটা হচ্ছে ইটকাঠের তৈরী—তা' একটা ছোট ঘরও হ'তে পারে, কিম্বা প্রকাণ্ড প্রাসাদও

হ'তে পারে। সবশেষ ঢাকনা হ'ল—এই বিশাল বহির্জ্জগৎ—মহাকাল যেন একটা প্রকাণ্ড চাদরে তাকে আল্‌গা ক'রে ঢেকে রেখেছে!"

এর পর তিনি বললেন, "সেদিন যখন ওখানকার বাস উঠিয়ে এলাম, তার আগে ধারণা করতেই পারিনি যে, এতদিন ধ'রে আমি ঐ বাড়ীটাতে একরাশ শিকড় নামিয়েছিলাম। বলতে কি, এমন একটা কোণ, গর্ত্ত বা ফাটল ছিল না, যেখানে একটা-না-একটা শিকড় প্রবেশ করেনি! যখন বিদায়ের দিনে একটা শেষ মোচড় দিয়ে সেগুলোকে ছাড়িয়ে নিচ্ছিলাম—তখন বুক দিয়ে আঁকড়ে-ধরা প্রাণীর মতই তাদের আর্ত্তনাদ শুনতে পাচ্ছিলাম।"...

অধ্যাপক প্রায় বিশ বছর ঐ বাড়ীটায় বাস করেছিলেন—বললেন "ঐ দেয়ালগুলো যেন চিরদিন সুখে শান্তিতে থাকে—ওদের ভিতরে আমি অনেক সুখের দিন যাপন করেছি।"

আমি ও শিক্ষয়িত্রী যখন স্কুলবাড়ীর দরজায় পৌঁছলাম, তখন—আমি যে বসরাই গোলাপের কথা বলেছি—তার রং এমন গাঢ় হয়ে উঠেছে যে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল, প্রত্যেকদিন সকালে এম্‌নি বেড়াতে পারলে ওঁর স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হবে। অতএব স্থির করলাম, আমার সঙ্গে প্রত্যহ এইরকম স্বাস্থ্যকর প্রাতঃভ্রমণে যোগ দেবার জন্যে ওঁকে অনুরোধ করব।

* * *

শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে আরও কতবার বেড়াতে বেরিয়েছি তা' ঠিক ক'রে বলতে পারবো না। আমার কিন্তু বিশ্বাস, প্রত্যেকদিন সকালে এইরকম ভ্রমণ তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী হয়েছিল।

এ কথা সত্যি যে, সে সময়ের যা' কিছু কথাবার্ত্তা, তার বেশির ভাগ আমাকেই চালাতে হয়েছিল। সেই সব আলাপ যদি আমি বিস্তারিত ভাবে জানাতে চাই, তা'হলে আবার প্রকাশক-বন্ধুরা কি পরামর্শ দেবেন তা' জানি—বলবেন, ভাল ক'রে সবাইকে পড়াতে হ'লে একখানা স্বতন্ত্র বই-এর আকারে ছাপানো দরকার—অবশ্য আমার নিজেরই খরচে, এবং লোকসানের ভয় না ক'রে।

—যে মেয়েমানুষকে কেহ ভালবাসে, সে যত বেশি কথা না কয়—চুপ ক'রে থাকে, ততই ভাল। যতক্ষণ চুপ ক'রে থাকে, ততক্ষণ তার কাজটা তাকে করতে হয় না, অর্থাৎ, তার যা বলবার, তা সেই নীরবতার দ্বারা বলা হয়ে যায়—যেন প্রকৃতি দেবী তার ভার নেন। কিন্তু যখন সে কথা কইতে থাকে তখন সে

কাজটা তাকে নিজেই ক'রে নিতে হয়। পুরুষের ভাষায় প্রেম ভাল গলে না, বড় কম মাত্রায় মিশে' থাকে ; কিন্তু মেয়েমানুষের কথার দুটি অক্ষরেও এতখানি প্রেম গলে মিশে' থাকে যে, পুরুষ তার সবটুকু হৃদয়ে ধারণ করতেই পারে না।

—এই যে সব কথা আমি লিখছি, এর সবটা বা একটুও আমি সেই যুবতীকে বলেছিলাম কিনা, কিম্বা সে সব বচন বেকনের বই থেকে মুখস্থকরা, না বালজাকের উপন্যাস থেকে চুরী-করা, কিম্বা অবস্থাবিশেষে নিজেরই অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহ করা—তা'ও আমি বলতে পারিনে। অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিও তার চেয়ে বুদ্ধিহীন কথা বলেছেন, আবার, অনেক মূর্খও তার চেয়ে সারবান কথা বলেছে! সে যাই হোক, আমি আর তিনি দু'জনে বড় সুখে অনেক দূর পর্য্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় বেড়িয়েছি, এবং অনেকক্ষণ ধ'রে ভাল ভাল আলাপ করেছি ; সে সব আলাপ কি কি বিষয়ে হয়েছিল, তা' আমি সকলকে বলতে বাধ্য নই।

—একেবারেই কিছু বলব না এমন কথা বলছিনে ; তোমরা যদি কোনরকম চাপ না দাও, তা'হলে আপনা হ'তেই এত কথা ব'লে ফেলব যা' বলা হয়তো ঠিক নয়। মানুষের স্বভাবই এই যে, কেউ যদি জোর করে, তা'হলে সে তার গোপন কথা কিছুতেই প্রকাশ করবে না।

—নানারকমের বই এবং শিক্ষার নানা পদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা আলাপ করতাম। তাঁর তো এ সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক—এবং জানতেনও। হ'তে পারে, আমার বিদ্যে তাঁর চেয়ে বেশি, কিন্তু শীঘ্রই বুঝতে পারলাম যে, তাঁর পড়াশুনা এবং আমার পড়াশুনায় ঠিক ততখানি তফাৎ—যতখানি নাকি, লাইব্রেরীর বইগুলো ঝাড়-পোঁছ করার কাজে পুরুষ ও মেয়ের মধ্যে তফাৎ। পুরুষটা এক-গোছা পালক দিয়ে ঝপাঝপ ঝাড়তে থাকে, আর মেয়েটি আস্তে আস্তে একটুকরো কাপড় নিয়ে কাজটি সুরু করে। পুরুষটার মত সে অত ধূলো উড়োয় না, সে ধূলো নাকে মুখে ঢুকতে পায় না। সে সমস্ত কোণগুলো পরিষ্কার করে, বইয়ের শুধু মলাট নয়—পাতাগুলিকেও বাদ দেয় না।

—কিন্তু লেখাপড়ার চাইতে জীবন সম্বন্ধে আলোচনায় আমাদের দু'জনের মতের মিল হ'ত আরো বেশি। এ বিষয়টা আমার একটু ভাল জানা আছে বলেই বিশ্বাস—এমন কিছু বলতে বা লিখতে পারি যা পড়বার বা শোনবার মত।

তরুণী শিক্ষয়িত্রীরও জীবনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। কচিৎ কখনো এমন একটি মানুষ চোখে পড়ে যার সঙ্গে তুলনায় এই চলমান লোকযাত্রার সবাইকে বড়

ছোট মনে হয়। ইনি সেই রকম একজন। সুখ-সম্পদ তাঁকে ত্যাগ করে গিয়েছে দুঃখই হয়েছে তাঁর শিক্ষাগুরু; সামনে রয়েছে আত্মীয়-স্বজনহীন এই সহরের জীবন, আর জীবিকার উপায়—ঐ একঘেয়ে পরিশ্রম। তবু আমি তাঁর সেই শান্ত স্থির মুখের পানে চেয়ে দেখলাম, তাঁর সেই চোখে, ঠোঁটগুলিতে, এমন কি, মুখের প্রত্যেকটি রেখায় লেখা রয়েছে—এ নারীকে বিধাতা ভালবাসবার জন্যেই সৃষ্টি করেছেন! তিনি নিজে তা জানেন না; সেই চাকরীর মত নীরস কঠোর কাজটিকে তিনি হৃদয়ের যে নিষ্ঠা দিয়ে বরণ করেছেন,—সেই প্রাণের সেই নিষ্ঠা অতিবড় প্রেমিকেরই প্রেমের পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্য।

এই রকম ভ্রমণসুখ যতদিন উপভোগ করেছিলাম, একদিনও তাঁর সঙ্গে একটিও প্রেমের কথা কইনি। বিশেষ করে সেই একদিন!—সেদিন প্রেমের কথার দিক দিয়েও যেতে পারিনি; অথচ—না, ভারি আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে! সেদিন আমার কথা কইতেই একটু বাধো-বাধো ঠেকছিল। বোর্ডিঙের এই বৈঠকে তেমন সঙ্কোচ আমার কখনো হয় নি, এখানে তো আমি নিজেকে একজন মুরুব্বি বলেই মনে করি। কিন্তু কি জানি কেন, সেদিন ঠিক সেই সময়ে আমি মনের জোর হারিয়ে ফেললাম। আসল কথা, সেই দিনই আমি লিভারপুল যাবার জন্যে একটা কেবিন ভাড়া করেছিলাম; এমন কথাও ছিল যে, ইতিমধ্যে কোন কারণ ঘটলে ঐ ভাড়া-করাটা বাতিল হয়ে যাবে। শিক্ষয়িত্রীকে এ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে কিছু জানতে দিই নি।

আমরা তখন সরকারী ময়দানটার উপর দিয়ে চলেছি। তোমরা জানো ঐখান থেকে অনেকগুলো রাস্তা চারদিকে বেরিয়ে গেছে। ওর মধ্যে একটা খুব বড়—সমস্ত মাঠটা পার হয়ে একেবারে বয়েলষ্টন ষ্ট্রীটে গিয়ে পড়েছে। ওটাকে আমরা 'দূরের পথ' নাম দিয়েছিলাম। ঐ পথটা আমাদের প্রিয় ছিল।

সেদিন ঐ পথটার মাথায় এসে মনটা বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়ল। বোধ করি দু'-দু'বার কথাটা বলতে গিয়ে মুখ দিয়ে আর বেরুলো না। শেষকালে কোন রকমে আমি প্রশ্নটা ক'রেই ফেললাম—

"আমরা দু'জনে দূর-পথেই নেমে পড়ি—কি বলেন?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়, আমার খুব ভাল লাগবে।"

"তবু রাজি হ'বার আগে একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখুন—আমি ধরে' নেবো, এপথে আর ছাড়াছাড়ি হবে না।"

শিক্ষয়িত্রী একটু চমকে' পিছিয়ে দাঁড়ালেন, যেন কেউ তাঁকে হঠাৎ একটা তীর ছুঁড়ে মেরেছে।

পথের পাশেই একটা খুব বড় গ্রানিট পাথর পড়েছিল, সেটা একটা বসবার জায়গা। বললাম, যদি আপত্তি না থাকে, এইখানে বসে' একটু বিশ্রাম করি আসুন। তিনি অতি মৃদুস্বরে বলে উঠলেন—

"না, না, বসবো না, আমি আপনার সঙ্গে দূর-পথেই যাবো।"

যে বুড়ো ভদ্রলোকটি আমাদের বৈঠকে রোজ সামনে বসেন, দেখি তিনি চলেছেন একটু দূরে। আমরা তখন নির্জ্জন রাস্তাটার প্রায় মাঝামাঝি এসে পড়েছি—মহিলাটির বাহু আমার বাহুতে বাঁধা; বুড়োটি আমাদের দেখে বড় মিষ্টি স্বরে বলে উঠলেন—

"এই যে! নমস্কার,—বেশ, বেশ!"

(১০)

আর যে বেশিদিন আমি এই বৈঠকে সকলের সঙ্গে আলাপ করতে পারবো সে সম্ভাবনা নেই। কাজেই যে ক'টা দিন আছে, তারি মধ্যে আমার কথা—যা' পারি, বলে' নেবো। এমন দু'চারটে রকমারি বিষয়ে আলাপ করবো—যা' এখানে থাকলে কখনো না কখনো—অন্ততঃ একবারও—আমাদের বৈঠকে উত্থাপন করতাম।

এই আলাপগুলো পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর থেকে, আমি পদ্য ও গদ্য-লেখায় ভরা অনেক রকমের চিঠি পেয়েছি। শেষেরখানা আজই সকালে পেলাম—বেশ ছোট্ট ঝরঝরে একটি কবিতা, নিউ অর্লিয়েন্স থেকে আসছে। সবগুলোতেই এক অনুরোধ—আমি যেন কোন পত্রিকায় ছাপিয়ে দিই। দু'-চারখানা বেশ ভাল লেগেছে, পড়ে মনে হয়েছে, আমি যাদের মুখ দেখিনি—এমন কত বন্ধু আমার আছে। যদি কারো লেখা তোমার ভাল লাগে, তবে সে কথা তাকে জানাতে দ্বিধা কোরো না। হয়তো বেচারী মনে করছে, তুমি বিরক্ত হও, তাই নিজেও সে অস্বস্থ-বোধ করে; তেমন অবস্থায় একটা ভাল কথা যদি তাকে লেখো তা'হলে সে মনে জোর পাবে। আমাকে কেউ যদি মিষ্টি মিষ্টি ক'রে ঐ রকম লেখে, তা' পড়লে আমার চোখ বুজে আসে, মনে কেমন আরামের একটি সুড়-সুড়ি লাগে। কিন্তু তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকে যে সব লেখা পাই তা' আমি যেন

ছাপাবার জন্যে কোন সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিই, এই তাদের ইচ্ছে। ওদের ধারণাই নেই, সম্পাদক কেমন লোক, পাঠকেরা কি চায়, এবং তারা নিজেরাই বা কেমন লেখক। এদের একজনকে আমি উত্তরে এই কথাগুলো লিখেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভেবে দেখলাম না-পাঠানোই ভাল। এমন তো আরও অনেককে ঐ রকম কড়া উপদেশ দেওয়া উচিত—ঐ একজনকে দিয়ে তার মন খারাপ করি কেন ?"

"স্নেহাস্পদেষু,

আমার মনে হইতেছে, তোমার বয়সে আমি যতটা বুদ্ধিমান ছিলাম, তুমি তার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। তুমি এক লম্ফেই খ্যাতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিতে চাও। কিন্তু ঐরকম ইচ্ছা একটা অতিসাধারণ ব্যাধি বলিলেও হয়। যশটা যাহাদের কাছে বড় নয়, তাহারাই প্রায় যশস্বী হইয়া থাকে। যাহারা মনে মনে বলে—"যাক্ গে, এখন আর কিছু নয়, একটা নাম করে' নিতে হবে।"—তারা ও জিনিসটা কদাচিৎ পায়। ঐ যে যশোলাভের অধীরতা— উহার ফলে খ্যাতি নয়—অখ্যাতিই ঘটে ; শেষে এমন স্থানে গিয়া দাঁড়াইতে হয়—যেখানে যত বাচাল আর মূর্খদের ভিড় ; কিম্বা সেই সকল দুর্ব্বৃত্তদের দলভুক্ত হইতে হয়, যাহারা নানাবিধ কৌশল করিতে গিয়া শেষে ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

"…নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে তোমার যদি সত্যকার বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে, এমন কিছু কর, যাহা দ্বারা সেই প্রতিভা আপনিই প্রমাণিত হয়। তেমন লেখা যদি লিখিতে পারো, তবে মাসিক বা দৈনিকের সম্পাদক নিজেরাই তোমাকে খুঁজিয়া লইবে—স্কুলের বালকেরা যেমন খুঁজিয়া বাহির করে, কোন্ গাছে কোন্ ফল পাকিয়াছে। ভাল কিছু লিখিতে পারিলে সম্পাদকেরা তাহা লুফিয়া লইবে। মনকে এই বলিয়া ভুলাইও না যে, তুমি নূতন লেখক বলিয়া তোমার লেখাগুলি তাহারা ফেরৎ পাঠায়। বরং কোন নূতন লেখকের ভাল লেখা প্রকাশ করিতে পারিলে তাহারা যেমন খুসী হয় তেমন আর কিছুতে নয়।

হয়তো তোমার প্রতিভা আছে, আবার নাও থাকিতে পারে,—কিন্তু জানিবে কেমন করিয়া ? যদি থাকে তবে তাহাতে তোমার যতখানি প্রয়োজন—জগতের প্রয়োজন তাহারো বেশি।

নেপোলিয়ন জিজ্ঞাসা করিতেন "লোকটা কাজের পরিচয় কী দিয়াছে ?" তুমি কাজ কতটুকু করিয়াছ ? তুমি তোমার কাজকে তোমার মনোমত যে মর্য্যাদা

দিয়াছ, আর সকলে যদি তাহা না দেয় তবে তুমি তাহাদিগকে গালি দিতে পারো না। তোমার সাধ্যমত সুন্দর করিয়া একটা কিছু রচনা কর, তারপর অপেক্ষা করিয়া থাক—তোমারও সময় আসিবে।

আমাকে তুমি যে কবিতাগুলি পাঠাইয়াছ তাহা যে পড়িবারও যোগ্য নয়, এমন কথা বলিব না; আবার, এমন কথাও জোর করিয়া বলিতে পারি না যে, সেগুলিতে ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। তুমি হয়তো মনে করিবে, আমার কথাগুলো বড় স্পষ্ট, এমন কি, শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। কিন্তু ইহাও জানিও যে, সংসার আমার চেয়ে স্পষ্টবাদী, কাল আমার চেয়েও নির্ম্মম। আমার বন্ধু-হস্তের এই আঘাত অপেক্ষা সাধারণের হস্তে বেশ কিছুকাল উত্তম-মধ্যম পাইতে যদি ভাল লাগে, তবে সাহস করিয়া তাহাই বরণ কর; কিন্তু মনে রাখিও, একটা হাটুরে গাড়ীতে যদি বিশ মণ আলু বোঝাই করা হয়, তবে, পথের ঝাঁকানিতে সব চেয়ে ছোট আলু-গুলাই একেবারে তলায় গিয়া পড়ে।"

—যখন এই ধরণের চিন্তা করি তখন আমার সব চেয়ে বেশি মনে পড়ে পদ্য-লেখকদের কথা, কারণ, সাহিত্যিকদের মধ্যে এমন অবুঝ, আত্মাভিমানী, অসন্তুষ্ট মানুষ আর নেই। যদি দেখা যায়, কোন যুবকের কাব্যি-রোগ হয়েছে, তা'হলে বুঝতে হবে, ছেলেটা অপদার্থ, কারণ এটা নিশ্চয় জেনো যে, শতকরা নিরানব্বই জনের কবিতা অতিশয় নিম্নস্তরের। ঐ যে কতকগুলো মিল-দেওয়া লাইনের জাবর-কাটা যার ভাবও নেই, অর্থও নেই, ওটা হচ্ছে এক রকম নেশার জিনিস অভ্যাস করা—যাতে ঘুম আসে; ও'তে শরীর-মন দুর্ব্বল হয়ে পড়ে—কোন পদার্থ আর থাকে না। কাব্যি-রোগের ঐ অপবাদটা দূর করতে হ'লে, ঐ কবিতার দ্বারাই তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, তার কিছু পদার্থ আছে।……

—এই যে কথাগুলো বলছি—এগুলো বড় কটু, একটুও ভদ্র নয়, তা জানি। কিন্তু এ আমি কোন একজন বিশেষ ব্যক্তিকে লক্ষ্য ক'রে বলছিনে; এই বই-এর পাঠকদের তো নয়ই। ভগবান রক্ষা করুন! এই রকম অপ্রীতিকর সত্যের নামে আমি যেন তেমন কাউকে গাল দিয়ে না বসি—কোন কোমলপ্রাণ তরুণ বা তরুণী কবির মুখের উপর এমন আঘাত না করি, যার ফলে তাদের সেই প্রথম প্রভাতী-গানের কুহরণ থেমে যায়; হয়তো পরে সেই স্বরলহরী শুনে জগৎ মুগ্ধ ও স্বপ্নাবিষ্ট হ'ত। যে সব রোগীদের কোন আশাই নেই তাদের সম্বন্ধে আমি খুব সহৃদয় হবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হয় নি।

—নাম যা' হয় একটা দিলেই হবে; বয়স আঠারো, তারুণ্যের অভিমান আছে; গাল চড়ানো, হাতগুলো বেশ চওড়া—গাঁটগুলো বড়; গাঁয়ের যুবতী মেয়েরা তাকে নিয়ে দু'তিনবার রগড় করেছে; সংবাদপত্রে সে প্রায়ই ভারি ভারি বিষয়ে লেখনী কণ্ডূয়ন করে, যথা—শাশ্বত সত্য, মানবাত্মা, যৌবন, আত্মজয়, প্রভৃতি। এহেন যুবক একবার আমাকে কয়েক ছড়া পদ্য পাঠিয়েছিল; পড়ে' দেখি তাতে ঘুরে ফিরে এই ক'টা কথা প্রায় হাজার বার এসেছে;—"কোন একটা সুর নাকি বড় মধুর; যা' সুদূর তাই মধুর; সুদূরের সঙ্গে মধুরের একটি গভীর সম্পর্ক আছে; এমন মধুর সুর আছে যা' বিধুর করে; সুরমাত্রেই সুদূরকে মধুর করে।" আমাকে লিখে জানাতে বলেছে, তার ঐ কবিতাগুলো কেমন হয়েছে, এবং এর পর সে কি করবে।

এখন তোমরা বল দেখি—আমি কি করি? সোজাসুজি আমার মতটা জানিয়ে দেব কি? এবং তার সঙ্গে একখানা টিকিটও পাঠিয়ে দেবো—যা' দেখালে পরে কোন বাতুলালয়ে ভর্তি করে নেবে? তেমন নিষ্ঠুর হ'তে অবিশ্যি আমি চাইনে, কিন্তু মিথ্যে কথাই বা বলি কি ক'রে? কাজেই সে যে একটি গর্দ্দভ সে কথা চেপে গিয়ে, একটু মিষ্টি ক'রে তাকে লিখতে হ'ল;—সে যেন প্রথমে ভালো ভালো কবিতাকে আদর্শ ক'রে তার মক্স করে; আর কবিতা-লেখা ছাড়া অন্যান্য কাজও করে, যেমন—বাগানে কোদাল-পাড়া, জামা-শেলাই করা; দোকানের খাতা-রাখা, ইত্যাদি। সবচেয়ে সাবধান থাকবে একটি বিষয়ে—যা' লিখবে তা' ছাপাবার জন্যে ব্যস্ত না হওয়া; তা'তে কোন লাভ নেই। যে অপোগণ্ড কবি একবার ছাপার হরফের স্বাদ পেয়েছেন, তার পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেছে।

আমার ফাইলে দু'খানা চিঠি আছে—একখানি তোষামোদের, আরেকখানি ভয়ানক আস্ফালনের। প্রথম খানির উত্তরে আমি ভদ্রভাষায় যে সৎপরামর্শ দিয়েছিলাম—দ্বিতীয়খানি তারই জবাব। একটা কথা নিশ্চিত ব'লে জেনে রেখো—ব্যতিক্রম প্রায় হয় না—সে হচ্ছে এই যে, যারা তোমার মতামত জানতে চায়, তারা আসলে তোমার প্রশংসা দাবি করে; তার কমে কিছুতে খুসী হবে না।

যারা পত্রিকার সম্পাদক, অথবা সম্পাদকের সঙ্গে যাদের জানাশুনো আছে, তাদের কাছে আরেক ধরণের আবেদন-পত্র আসে, তাতে অনেক সময়ে বড় মুস্কিলে পড়তে হয়—দুঃখও হয়। হয়তো কেউ আরেকজনের পক্ষ হয়ে আবেদনে জানিয়েছে—সে ব্যক্তির অবস্থা বড় খারাপ, সে লিখে' কিছু উপার্জ্জন করতে চায়;

চিঠির সঙ্গে একটা লেখাও পাঠিয়েছে। লেখাটা বিশেষ কিছু নয়, বরং ছাপার অযোগ্য বলাই ঠিক। একটা যে কথা আছে—"যার যেমন বুদ্ধি তার তেমন ধন," তা' যদি সত্যি হয়, তা' হ'লে—দারিদ্র্য অর্থে বুদ্ধির অভাব, বা যোগ্যতার অভাব ; দেখতেও পাওয়া যায় তাই। এর ব্যতিক্রম হয়তো আছে, কিন্তু সে খুব কম। এদিকে যিনি সম্পাদক তাঁর একটা দায়িত্ব আছে ; যারা টাকা দিয়ে তাঁর পত্রিকার গ্রাহক হয়, তাদের জন্যে যতদূর সম্ভব ভাল লেখাই তাঁকে সংগ্রহ করতে হবে। তা' না ক'রে তিনি যদি দয়াপরবশ হ'য়ে ঐরকম লেখা ছাপান, তা'হ'লে সেটা হবে সেই ডাকাতদের মত দানশীলতা—যারা ধনীদের টাকা লুট ক'রে গরীবদের বিতরণ করত।

(১১)

দূরের পথ

হ্যাঁ, শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে সেইটেই আমার শেষ বেড়াতে যাওয়া। তখন স্কুলের একটা টার্ম শেষ হয়েছে, পরের টার্ম আরম্ভ হবার আগেই ; যিনি তাঁর সহকারিণী ছিলেন—চমৎকার মেয়েটি !—তাঁকেই এঁর জায়গায় নিযুক্ত করা হ'ল। তার কারণ, যিনি এতদিন ঐ পদে কাজ করছিলেন তাঁর একটা অন্য রকম ব্যবস্থা হয়ে গেল কিনা! অতএব এখন আমি যাঁর সঙ্গে বেড়াতে বেরুলাম, তিনি আর শিক্ষয়িত্রী ন'ন, তাঁকে এখন থেকে যে-নামে ডাকতে হবে সে হচ্ছে—আচ্ছা, থাক, এত ব্যস্ত হওয়া ভাল দেখায় না। আমি এখনো তাঁকে শিক্ষয়িত্রী নামেই ডাকবো —তোমাদের কাছেও তিনি ঐ নামে শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছেন।

* * * *

—'আর দেরী করবারই বা প্রয়োজন কি ? বেশি দেরী করলে শেষে সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে সেখানকার ভাল সময়টাকে পুরোপুরি পাওয়া যাবে না।'

হাতের মধ্যে যে হাতখানি ছিল, তা' ঈষৎ কেঁপে উঠল, চোখ দু'টি অবনত হ'ল। শেষে সেই গুরুতর বিষয়টির সম্বন্ধে দু'জনের মধ্যে একটা রফা করা গেল— ঠিক হ'ল, বসন্ত ঋতুর শেষদিনটিতে শুভকার্য্য সম্পন্ন করা যাবে।

ততদিন আমি কিন্তু আমার বৈঠকের বক্তৃতা ছাড়িনি— আমার এই বিবরণী পড়ে' সবাই তা' বুঝতে পারবেন। সংবাদটা বোর্ডিংে প্রচার হবার পর কয়েক-দিন ধরে' সবাই যেন আমাকে একটু বেশি আদর-স্নেহ দেখাতে লাগলেন, তাঁদের

সেই ভালবাসা আমারও হৃদয় স্পর্শ করেছিল। সকলেই আগের চেয়ে ভক্তিভরে আমার বক্তৃতার প্রত্যেক কথাটি শুনতে লাগলো।

—তোমাদের সকলের বোধ হয় ধারণা এই যে, যেহেতু আমি এক বিধবার বোর্ডিং-গৃহস্থালীতে এতদিন বাস করছি, অতএব আমার বিষয়-সম্পত্তি তেমন কিছু নেই। তোমরা শুনলে নিশ্চয় দুঃখিত হবে না যে, যদিও বড় বড় ব্যবসায়ের মালিকেরা যাকে ধনী বলে আমি তেমন কিছু নই, তবু যে সব মাঝারি-রকম সুখ-সম্ভোগের কথা আমি আমার 'সুখ'-কবিতাটিতে বর্ণনা করেছি, তার কোনটাই আমার সামর্থ্যের বাইরে নয়—আমি যদি তা' ভোগ করতে চাই। কিন্তু দেখলাম, এই মহিলাটির রুচি কিছু ভিন্ন রকমের—উনি পরের দুঃখ নিবারণ করতে পারলেই সুখী হ'ন ; এ পর্য্যন্ত টাকাটা-সিকিটার উপর দিয়েই সে অভ্যাস কতকটা বজায় রাখতে পেরেছেন। আমি অবিশ্যি খুব বেশি বিলাসিতার প্রস্তাব করিনি।

একদিন হঠাৎ তাঁকে ব'লে ফেললাম—

"তুমি জানো, এখন তোমার আর সেই পূর্ব্ব-অবস্থা নেই?" উত্তরে তিনি বললেন, 'জানি, আমি যা' চেয়েছিলাম ভগবান তার বেশি দিয়েছেন আমাকে। আমি যে কখনো এত ভালবাসা পাব, তা' মনে করি নি।'

বেশ বুঝতে পারলাম কথাগুলিতে নারী-হৃদয়ের একটি গভীর প্রতিবেদন আছে, শেষের দিকে তাঁর গলার স্বর বড় মৃদু হয়ে এ'ল—যেন চুপি-চুপি কথা বলছেন। আমি বললাম—"আমি সে কথা বলিনি, আমি বলছিলাম—মানে বলছিলাম যে,—তুমি—অর্থাৎ কিনা, আমি—দূর হোক গে! কি বলতে কি যে বলি! আমি বলছিলাম, যে, এখন থেকে তুমি—লোকে যাকে বলে—বড়লোকের গিন্নী",—ব'লেই মুখের পানে চেয়ে রইলাম—ভাবখানা কি হয় দেখবার জন্যে।

কোন ভাবান্তরই হ'ল না! বললেন—

"হাঁ, তোমার কথার থেকে বুঝতে পারছি, আমাকে আর জীবিকার জন্যে পরিশ্রম করতে হবে না—তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। এ বিষয়ে আরও যা জানবার তা' পরে তোমার মুখে শুনবো।"

একটা অপ্রত্যাশিত সু-খবর দিয়ে চমকে' দিতে গিয়ে এমন বিড়ম্বনা আমার ভাগ্যে আর কখনো ঘটে নি।

* * * *

বসন্তের শেষদিনটি এসে পড়ল। একেবারে গীর্জ্জেয় যাওয়াই আমরা স্থির

করেছিলাম। কিন্তু বোর্ডিংএ আমাদের জন্যে বেশ একটু আয়োজন করা হয়েছিল। যেখান থেকে যত কিছু উপহার এসেছিল, সব সাজিয়ে দেওয়া হ'ল; কিন্তু তার মধ্যে আমার বোর্ডিং-সাথীদের উপহারগুলি আমায় বড় ভাল লেগেছিল, দেখে বুঝলাম—প্রত্যেকেই একটা কিছু দিয়েছে। গৃহস্বামিনী কিছুতেই শুনলেন না—নিজের হাতে সুন্দর, একখানি "ক'নে-কেক" গড়েছেন। তাঁর মেয়ে খুব দামী কাপড়ে বাঁধানো একখানি কবিতার বই উপহার দিয়েছে; তার সামনের পাতায় খুব যত্ন ক'রে সুশ্রী অক্ষরে এই ক'টি কথা লেখা রয়েছে—

পবিত্র পরিণয়-বন্ধনে দুইটি হৃদয় এক-হওয়া উপলক্ষে—

শ্রীমতী——করকমলেষু

"সদাই যেন হাসির কিরণ ঘেরিয়া থাকে তারে"

সব শেষে যে একটি উপহার এলো—সে হচ্ছে একটা পুরণো চারকোণা বাক্স, কর্পূরের গন্ধ—বেশ ক'রে বাঁধা—এবং উপরে শীল-মোহর-করা। বাক্সটার একদিকে একটা কালির লেখা প্রায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে—"কলিকাতা, ১৮০৫।" খুলে দেখি, ভিতরে একখানা কাশ্মীরী শাল, আর তার সঙ্গে একখানা চিঠি আছে। চিঠিতে, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি যিনি ঠিক সামনে বসতেন, তিনিই লিখেছেন—ঐ জিনিসটা তিনি অনেকদিন তুলে রেখেছিলেন; নিয়ে কি করবেন ঠিক করতে পারেন নি। সেই যুবা-বয়সে তিনি যখন জাহাজে কাজ করতেন তখন থেকে আজ পর্য্যন্ত ওটার ভাঁজ পর্য্যন্ত খোলা হয় নি। আজ যদি আমার ইনি ওখানা খু'লে তাঁর কাঁধের উপর মেলে' দেন—তা' দেখে তিনি আবার তাঁর সেই যুবা-বয়স ফিরে পাবেন।

বেচারী ব্রিজেট ওরফে 'বিড়ি'—বাড়ীর ঝি; কাজ ক'রে ক'রে তার হাত দু'খানা লাল্‌চে হ'য়ে গেছে—সেও আর কিছু না পেরে একটা ছোট তামার ব্রেষ্ট-পিন প্রাতরাশের সময়ে তার 'স্কুল-ঠাক্‌রুণে'র প্লেটের নীচে রেখে দিয়েছিল। 'স্কুল-ঠাকুরাণী'ও তাঁর বুকে সেটা পরতে চাইলেন, আমি কিন্তু তার উপরে একটা গোলাপ -ফুল বসিয়ে দিলাম।

* * * *

বোর্ডিঙের মেম্বার হিসেবে সেই আমার শেষ টেবিলে বসা—শেষ প্রাতরাশ; অতএব সেদিন আমি কিছু বক্তৃতা না ক'রে পারলাম না। বললাম—

"বিদায় বন্ধুগণ! তোমাদের সকলকে এবং প্রত্যেককে আমি বিদায়-সম্ভাষণ

জানাচ্ছি। অনেকদিন তোমাদের সঙ্গে কাটলো—বিদায় নিতে কষ্ট হচ্ছে। তোমরা আমার প্রতি অশেষ সৌজন্য করেছ, তার জন্যে ধন্যবাদ; আরও ধন্যবাদ এই জন্য যে, আমি তোমাদের শিক্ষা বা আমোদ দেবার জন্যে যখন যা' বলেছি তাই তোমরা পরম স্নেহে ও ধৈর্য্য ধ'রে শুনেছ। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন!"

তারপর টেবিলটা ঘুরে' একে একে সকলের সঙ্গে করমর্দ্দন করলাম।

আধ ঘণ্টা পরে প্রাতরাশের সমস্ত সরঞ্জাম, মায় টেবিল-ঢাকা কাপড়খানাও তুলে নিয়ে গেল। আমি সেই খালি টেবিলটা, একবার এদিক থেকে ওদিকে, আবার ওদিক থেকে এদিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম, আর—আশ্চর্য্য কি?—আমিও তো আর সকলের মতই একটা মানুষ!

কিন্তু মনের এই ভাবটা সেই মুহূর্ত্তে কেটে গেল যখন, এই সব পুরণো বন্ধুদের সামনেই—আরও কেউ কেউ ছিলেন যাঁদের আপনারা হয়তো চেনেন না—আমি গীর্জ্জের বেদীতে আমার সেই প্রিয়জনটিকে চির-সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করলাম। সেই যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ঠিক সামনেই বসতেন, তিনিই কন্যাকর্ত্তা হয়ে কন্যা সম্প্রদান করলেন—কিছুতেই ছাড়লেন না।

তারপর এখন আমরা দু'জনে পরম শান্তিতে সেই 'দূর-পথ' বেয়ে চলেছি। শিক্ষয়িত্রী মহাশয়াকে আর ছাত্রের সন্ধানে বাইরে কোথাও যেতে হয় না, ঘরেই শিক্ষা-দেবার লোক পেয়েছেন; আমার জীবনের স্বপ্নগুলো একে একে সবই সত্য হয়েছে।

গ্রন্থরচনা ও রচনা-রীতি

[জর্ম্মান মনীষী শোপেনহাউ-এর (Schopenhauer) 'On Authorship and Style'-প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদ হইতে]

(১)

প্রথমতঃ, লেখক দুই শ্রেণীর আছে। এক, যাহারা কোন একটা 'বিষয়ে' কিছু লিখিয়া থাকে; আর এক, যাহারা 'লেখার দায়ে' লেখে। প্রথম শ্রেণীর এমন চিন্তা বা অভিজ্ঞতা আছে যাহা জ্ঞাপন করার যোগ্য বলিয়া বিশ্বাস করে; দ্বিতীয় শ্রেণীর টাকা চাই, টাকার জন্যই লেখে। ইহারা লিখিবে বলিয়া, লেখার জন্যই ভাব ও চিন্তা তৈয়ারী করিয়া লয়; লেখা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়—একই কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, টানিয়া বুনিয়া যতদূর সম্ভব লম্বা করে; আরও একটা লক্ষণ এই যে, ইহাদের চিন্তার ধরণটাই বাঁকা; কথাগুলা অর্দ্ধসত্য, ভালো করিয়া বলিতেও পারে না, যেন একটা দ্বিধার ভাব আছে—যুক্তিগুলাতেও একটা জবরদস্তির ভাব; অনেক কিছু এড়াইয়া যাইতেও চায়, পাছে ধরা পড়ে। এইজন্য ইহাদের রচনায় দৃঢ়তা ও স্পষ্টতার বড়ই অভাব।

অতএব বুঝিতে বিলম্ব হয় না, ইহারা কাগজের পৃষ্ঠা ভরাইবার জন্যই লিখিয়া থাকে। সত্যকার সুলেখক যাঁহারা, তাঁহারাও অনেক সময়ে এই কর্ম্ম করেন। যেমন, Lessing-এর "নাট্য-শাস্ত্রে"র কোন কোন অংশ; এমন কি Jean Paul-এর অনেকগুলি উপন্যাস এইরূপ। যেমনই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে, অমনই, তেমন গ্রন্থ ফেলিয়া দিবে, কারণ সময়ের মূল্য আছে। বস্তুতঃ যখনই কোন লেখক এইরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি পাঠককে ঠকাইতে চাহেন; কারণ, তাঁহার গ্রন্থরচনার একমাত্র কৈফিয়ৎ এই যে, পাঠককে তাঁহার সত্যই কিছু বলিবার আছে। সাহিত্যের সর্ব্বনাশ হয় এই দুইটির জন্য—টাকার জন্য গ্রন্থরচনা, এবং গ্রন্থস্বত্ব-সংরক্ষণ। যাহারা কোন গভীর ও মৌলিক চিন্তা প্রচার করিবার জন্যই লেখনী ধারণ করে, তাহাদের লেখাতেই কিছু পদার্থ থাকে। বিদ্যার বিভিন্ন বিভাগে, যদি মাত্র কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ থাকিত তাহা হইলে মানুষের কি উপকারই হইত! যতদিন গ্রন্থরচনার দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করার সুযোগ থাকিবে, ততদিন মানুষের এই সৌভাগ্য হইবে না। মনে হয়, টাকা জিনিষটাতেই কোন

অভিশাপ আছে; কারণ, যে মুহূর্ত্তে কোন গ্রন্থকার টাকার জন্য লিখিতে আরম্ভ করে তখনই তাহার লেখা খারাপ হইতে থাকে। বড় বড় লেখকের উৎকৃষ্ট পুস্তকগুলি যে কালে রচিত হইয়াছিল, তখন তাঁহারা—হয় পয়সার জন্য লিখিতেন না, নয় খুব অল্প মূল্য পাইয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে স্পেন-দেশের একটি প্রবাদ-বাক্যে—"একই থলির মধ্যে অর্থ ও খ্যাতি দুই-ই থাকে না।" এখন প্রায় সকল দেশে সাহিত্যের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে তার কারণ, যাহারই টাকার প্রয়োজন, সেই বই লিখিতে বসিয়া যায়; পাঠকেরাও এমন মূর্খ যে, সেই পুস্তক কিনিয়া পড়ে। ইহার পরবর্ত্তী বিষময় ফল—ভাষাটি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

অনেক কু-লেখক, সাধারণ পাঠকের ঐ নির্ব্বুদ্ধিতার সুযোগে জীবিকা-সংস্থান করিয়া থাকে; কারণ ঐ সাধারণেরা সদ্য-ছাপা বই ভিন্ন আর কিছু পড়িবে না। ঐ যে লেখকের কথা বলিয়াছি, উহারাই Journalist, ঐ নাম বড় যথার্থ হইয়াছে, উহার অর্থ—"দিন-মজুর"।

লেখকগণের আর এক প্রকার শ্রেণীভেদ করা যাইতে পারে, তাহাতে তিনটি শ্রেণী মিলিবে। এক, যাহারা লিখিবার পূর্ব্বে নিজেরা কোন চিন্তা করে নাই, হয় কবে কি দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে, তাহারই ব্যাখ্যান করে, নয়, সরাসরি অপর লেখকের লেখা হইতে তাহাদের চিন্তা সংগ্রহ করে; এই শ্রেণীর লেখকের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িবে সেই সকল লেখক, যাহারা লিখিতে বসিয়া চিন্তা করে; ইহারা লিখিবার জন্যই চিন্তা করিতে বাধ্য হয়, ইহাদের সংখ্যাও অল্প নয়। তৃতীয় আর এক শ্রেণীর লেখক আছেন, ইঁহারা লিখিবার পূর্ব্বে,—সে প্রয়োজন না হইতেই—চিন্তা করিয়াছিলেন। ইঁহারা চিন্তাশীল বলিয়াই লেখনী ধারণ করেন, এমন লেখক বড়ই বিরল।

* * *

সুগভীর ভাব-চিন্তার তাগিদে লেখনী ধারণ করেন, এমন লেখক যদিও খুবই কম, তথাপি তাঁহাদের মধ্যেও এমন লেখক আরও কম, যিনি 'মূল বিষয়টি'র সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন; অধিকাংশই, সেই বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে—সেই অপরের লেখা বইগুলির উপরে—তাহাদের চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করেন; অর্থাৎ, সেই বিষয়ে অপরের চিন্তারাজির অনুচিন্তন করিয়া থাকেন। ইঁহারা, নিজেদের চিন্তার খোরাক বা প্রেরণার জন্য অপরের চিন্তার উপরে নির্ভর করেন; এইজন্য ইঁহারা কখন পরের প্রভাব এড়াইতে পারেন না, ইঁহাদের রচনা

সম্পূর্ণ মৌলিক হইতে পারে না। অপর পক্ষে, ঐ অতি অল্পসংখ্যক যাঁহারা, তাঁহাদের চিন্তাধারা উদ্রিক্ত হয় একেবারে সাক্ষাৎ বিষয়টি হইতে; তাই ইঁহারা বিষয়টার অর্থ নূতন করিয়া আবিষ্কার করেন। এই শ্রেণীর লেখকেরাই জগৎ-সাহিত্যে অমরতা লাভ করেন। ইহাও বলিয়া রাখি যে, আমি এখানে উচ্চতর সাহিত্য-রচয়িতাদের কথা বলিতেছি—মদ চোলাই করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে যাঁহারা গ্রন্থ রচনা করেন তাঁহাদের কথা নয়।

যে লেখক তাঁহার লিখিবার বিষয়টি নিজেরই মাথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার লেখাই পড়িবার যোগ্য। যাহারা কলের সাহায্যে বই প্রস্তুত করে, যাহারা কেবল সংকলন করে, এবং যাহারা সাধারণ ইতিহাস-লেখক—সে ধরণের লেখকেরা তাহাদের বিষয়বস্তু সোজা অপর গ্রন্থ হইতে আহরণ করে। নিজের প্রণীত গ্রন্থে যাহা আছে, তাহা যদি সেই ব্যক্তির জানা থাকিত, তবে সে তো মহাপণ্ডিত হইয়া উঠিত! অনেক সময়ে তাহারা কি বলিতেছে তাহা ভালো বুঝিতে পারা যায় না, বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার অর্থ করা যায় না। আবার, যে সকল বই হইতে তাহারা নকল করে, সে সকলও ঐ ধরণের রচনা! এজন্য সংকলন-গ্রন্থগুলা যতদূর সাধ্য না পড়াই কর্ত্তব্য;—একেবারে ত্যাগ করাও যায় না, কারণ, ঐরূপ গ্রন্থে বহুশতাব্দীর চিন্তারাজি অতিক্ষুদ্র সংক্ষিপ্ত আকারে সংগৃহীত হইয়া থাকে।

কোন একটা বিষয়ে যাহা সর্ব্বশেষে লেখা হইয়াছে তাহাই সবচেয়ে নির্ভুল—এমন ভুল ধারণা আর নাই। লোকে মনে করে, শেষের লেখা বই আগের লেখা বইয়ের চেয়ে উৎকৃষ্ট হইবেই, পরিবর্ত্তন মাত্রেই উন্নতির প্রমাণ। আসলে, সত্যকার চিন্তাশীল বা তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন লেখক দেখিতে পাওয়াটাই আশ্চর্য্যের কথা। কোন বিষয়ে গুরুতরভাবে চিন্তা করিবার আগ্রহ কয়জনের আছে, বা সত্যসন্ধানই বা কয়জনে করে? সর্ব্বত্র ইঁদুর ও আরসোলার উৎপাত। চিন্তাশীল মনীষীরা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর কেরামতী করিবার জন্য ইহারা দিবারাত্রি ছটফট করিতেছে। পুরাণো গ্রন্থগুলির এইরূপ সংশোধিত নব নব সংস্করণ হইতে কোন বিষয়ে উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভের আশা বাতুলতা মাত্র। নূতন গ্রন্থ-রচনা কালে পুরাতনগুলির সাহায্য অবশ্যই লওয়া হইয়াছে, কিন্তু সে কেমন ভাবে? নূতন লেখক প্রায় প্রাচীন গ্রন্থ ভালো করিয়া বুঝিতেই পারেন না, তাহাদের ব্যবহৃত শব্দগুলি ঠিকমত উদ্ধৃত করেন না; ফলে যে কথাটা পূর্ব্ব-গ্রন্থে

অতিশয় সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা হইয়াছিল, নূতন গ্রন্থে তাহা জটিল ও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ, সেই প্রাচীন লেখক পরের চিন্তার ধার ধারিতেন না, নিজস্ব টাট্‌কা তাজা চিন্তাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তা' ছাড়া, এই নূতন লেখকেরা প্রাচীনের উৎকৃষ্ট চিন্তাগুলাই বাদ দিয়া থাকে, বুঝিতেই পারে না সেগুলার মর্ম্ম কত গভীর। তৎপরিবর্ত্তে ইহারা নিজেদের মনের মত নিকৃষ্ট, গুরুত্ব-হীন চিন্তাই মূল্যবান মনে করিয়া, সেই সকলের আড়ম্বরপূর্ণ আলোচনা করে।

বিজ্ঞান-বিদ্যার ক্ষেত্রে, কেহ যদি হঠাৎ নাম করিতে চায়, তবে একটা খুব নূতন-কিছু বাজারে আনিয়া হাজির করে। এই নূতন বস্তু প্রায়ই আর কিছু নয় —পূর্ব্বের কোন একটি স্বীকৃত তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণ করিয়া, নিজের মিথ্যাটিকে প্রতিষ্ঠিত করা। কখন কখন এই চেষ্টা কিছুকালের জন্য ফলবতী হয়, তারপর, সেই পুরাতন সত্য মতটিতে আবার ফিরিয়া যাইতে হয়। ইহারা আত্মপ্রচার ছাড়া আর কিছুকেই প্রয়োজনীয় মনে করে না; এবং রাতারাতি যশোলাভ করিবার জন্য, প্রথমেই—যাহা সর্ব্ববাদী-সম্মত তাহার ঠিক বিপরীত একটা মত জাহির করে; ইহাদের মস্তক গোময়পূর্ণ বলিয়া এইরূপ নাস্তিকতার পথই তাহাদের একমাত্র পথ না হইয়া পারে না; যে সকল সত্য এতকাল স্বীকৃত হইয়াছিল তাহাই অস্বীকার করিতে হয়।

ইহা সত্য যে, কোন বিষয়ের মূল তত্ত্বটি অধিগত করার পর, ইদানীং সে সম্বন্ধে আরও কি লিখিত হইয়াছে, তাহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক। তথাপি, সাধারণ ভাবে, অন্যত্রও যেমন তেমনই এখানেও একটা নিয়ম মানিয়া চলা উচিত, তাহা এই যে, যাহা নূতন তাহা প্রায়ই উত্তম নহে; তার কারণ, উত্তম যাহা তাহা বেশিদিন নূতন থাকে না।

গ্রন্থের নামকরণে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য; কারণ, চিঠির ঠিকানার মতই ঐ নামের দ্বারা তাহাকে পাঠকবর্গের নিকট পৌছাইয়া দেওয়া হয়। নাম যদি খুব দীর্ঘ হয়, বা অর্থহীন হয়, কিম্বা দ্ব্যর্থপূর্ণ হয়, তবে তেমন নাম ভাল নহে; যদি তাহা মিথ্যা বা ভিন্নার্থবোধক হয়, তবে তো কথাই নাই—তেমন গ্রন্থ ভুলঠিকানাযুক্ত চিঠির দশা প্রাপ্ত হয়। আর যদি চুরি-করা নাম হয়, অর্থাৎ অপর কোন বইয়ের নাম হয়, তবে তাহার মত মন্দ আর কিছু হইতে পারে না; কারণ, প্রথমতঃ উহা একরূপ সাহিত্যিক চৌর-কর্ম্ম; দ্বিতীয়তঃ, উহার দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে, ঐ লেখকের লেশমাত্র মৌলিকতা নাই।

(২)

পুস্তকমাত্রেই, লেখকের নিজস্ব চিন্তার বাহন ছাড়া আর কিছুই নয়। ঐ চিন্তা দুই কারণে মূল্যবান হইতে পারে,—এক, উহার বিষয়; দুই, বক্তব্য বিষয়টাকে কেমন আকারে বা ভঙ্গিতে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে; অর্থাৎ লেখক, সেই বিষয়টার সম্বন্ধে নিজে কিরূপ চিন্তা করিয়াছেন।

বিষয় বলিতে—যত-কিছু অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ বাস্তব তথ্যের উপরে যাহা কিছু নির্ভর করে—প্রাকৃতিক হউক, বা ইতিহাসই হউক—বিশেষ বা ব্যাপক অর্থে সেই সকল বস্তু বুঝিতে হইবে। প্রতিপাদ্য বিষয়টিই যখন গ্রন্থের প্রধান অভিপ্রায়, তখন লেখক যিনিই হউন তাহাতে কিছুই যায় আসে না, বিষয়ের গৌরবেই গ্রন্থের গৌরব। কিন্তু কোন গ্রন্থের রচনা-রূপটাই যদি তাহার বিশেষত্ব হয়, তবে, লেখকের গুণাগুণই একমাত্র বিচার্য্য হইয়া থাকে। কোন গ্রন্থের বিষয়টা হয়ত সকলের সুপরিচিত, বুঝাইবারও কিছু নাই, কিন্তু বুঝাইবার ভঙ্গি বা রচনার রূপটাই এমন—অর্থাৎ, সেই অতিপরিচিত বিষয়টা এমন এক ভাবে নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, তাহাই গ্রন্থখানির গৌরব; সে ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের কৃতিত্বই মুখ্য—গ্রন্থের মূল্য তাহারই উপরে নির্ভর করে। অতএব, এই দিক দিয়া কোন গ্রন্থ যদি উৎকৃষ্ট ও অদ্বিতীয় হয়, তবে তাহার লেখকও তেমনই। তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, লেখক হিসাবে তিনিই তত উৎকৃষ্ট যিনি রচনার বিষয়বস্তুর উপর যত কম নির্ভর করেন; বরং সেই বিষয় যত পুরাতন ও বিশেষত্বহীন হইবে তাঁহার গৌরবও সেই পরিমাণে অধিক হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গ্রীক ট্রাজেডির তিনজন অমর কবির নাম করা যাইতে পারে—ইঁহারা তিনজনেই একই বিষয় লইয়া নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

অতএব, কোন গ্রন্থ যখন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে, তখন উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে—সেই খ্যাতি উহার বিষয়বস্তুর জন্য, না, রচনা-ভঙ্গির জন্য।

অতিশয় সাধারণ, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও অতিশয় মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিতে পারে, তার কারণ, ঐরূপ গ্রন্থের যাহা বিষয় বা উপাদান, তাহা সেই ব্যক্তিই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই সকল গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাহাতে নানা দূর দেশের বিবরণ আছে; এমন নৈসর্গিক ব্যাপারের বর্ণনা আছে যাহা কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে; যাহাতে নানারূপ সমীক্ষণ (experiment)

বা পরীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধ হইয়াছে ; যাহাতে এমন সকল ঐতিহাসিক ঘটনার বিবৃতি আছে যাহা গ্রন্থকার স্বচক্ষে দেখিয়াছে, কিম্বা যেগুলার সন্ধানে অনেক দিন ধরিয়া বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছে, এবং অনেক প্রামাণিক গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছে।

অপর পক্ষে, যাহা সকলে জানে সে বিষয়ে লিখিতে হইলে, রচনার রূপ বা ভঙ্গিটাই আসল—লেখককে তাহার উপরেই নির্ভর করিতে হয়। এমন পুস্তকও যদি পাঠ্যহিসাবে মূল্যবান হয়, তবে অসাধারণ প্রতিভাশালী লেখকই তাহা রচনা করিতে পারে। কারণ, পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর পুস্তকে যাহা আছে তাহার মত চিন্তা, শুধু ঐ লেখকই নয়—যে-কোন অপর লেখকও করিতে পারে ; ঐ বিষয়টা তাহার মনে যে ছাপ দিয়াছিল, সেটা ঐ বিষয়েরই ছাপ, তাহার বেশি কিছু নহে ; এবং যেহেতু বিষয়মাত্রেই সকলের পক্ষেই সমান, অতএব, যে-কোন অপর লেখক তাহার মনে ঐ ছাপটা পাইবে।

কিন্তু জনসাধারণ ঐ বিষয়টাকেই বড় মনে করে, রচনার রূপ তাহারা বুঝে না ; এইজন্য তাহাদের চিত্তবৃত্তির সম্যক উৎকর্ষ কখনো হয় না। কাব্য-পাঠকালে উহারা কবিতার বিষয়টা লইয়া যেরূপ মাতিয়া উঠে, তাহা অতীব হাস্যকর। এই সকল সাধারণ পাঠক কবির সাংসারিক অবস্থা ও কবি-জীবনের ঘটনাবলী অতিশয় যত্নসহকারে জানিয়া লইতে চায়, তার কারণ, তাঁহার কাব্যের মূলে যে বস্তুগত প্রেরণা বা অভিপ্রায় ছিল, তাহাই ইহাদের মত পাঠকের কাব্য বুঝিবার পক্ষে বড় আবশ্যক—এমন কি, শেষ পর্য্যন্ত সেইগুলাই কবির কাব্য অপেক্ষা অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে। ইহারা গ্যেটের (Goethe) সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা হইয়াছে তাহা পাঠ করিতে যত উদ্‌গ্রীব, গ্যেটের কাব্য পড়িতে তত নয়। এই যে রচনার রূপ অপেক্ষা রচনার বিষয়ের প্রতি অধিকতর আকর্ষণ ইহার তুলনা দিতে হইলে বলিতে হয়, এ যেন একটি কারুকার্য্যময় পাত্রের গঠন-সুষমা ও অঙ্গ-চিত্রণ উপেক্ষা করিয়া তাহার উপাদান-মৃত্তিকা ও সেই রঙগুলার রঞ্জন-পদার্থকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করিয়া দেখা। বিষয়-বস্তুকেই প্রাধান্য দিয়া রচনাকে চিত্তগ্রাহী করিবার এই যে চেষ্টা, অর্থাৎ, সাধারণের সেই কুপ্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া অতিশয় নিন্দার্হ ; বিশেষ করিয়া সেই শ্রেণীর রচনায়—যাহার রূপটা অর্থাৎ রচনা-ভঙ্গিটাই সর্ব্বস্ব, যেমন কাব্য প্রভৃতি। তৎসত্ত্বেও, অতিনিকৃষ্ট একদল নাট্যকারের কাজই হইয়াছে এমন ধরণের নাটকে রঙ্গালয়গুলা ভরিয়া তোলা—যাহাতে

নাটকের ঐ বিষয়টাই বড়। ইহার প্রমাণ, তাহারা রঙ্গমঞ্চের উপরে যে-কোন বিখ্যাত ব্যক্তিকে দাঁড় করাইয়া দেয়—তেমন ব্যক্তির জীবনে নাটকোচিত কিছু থাকুক বা নাই থাকুক।

(৩)

যতক্ষণ না বাক্যের প্রান্তে আসিয়া ঠেকে ততক্ষণ কোন ভাব বা চিন্তা জীবন্ত থাকে, তার পরেই উহা যেন প্রস্তরীভূত ও প্রাণহীন হইয়া যায়; তথাপি ঐ আকারেই তাহা কল্পান্তস্থায়ী হইয়া থাকে—যেমন অতি-পূর্ব্ব যুগের জীব বা উদ্ভিদ্-দেহের শিলা-পঞ্জর। উহার ঐ অতি ক্ষণিক জীবিত-দশাকে সেই অবস্থার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে—যে অবস্থায় তরল বস্তুকণাগুলি দানা বাঁধিবার উপক্রম করে।

যে মুহূর্ত্তে কোন চিন্তা বাক্য-রূপ ধারণ করে, সেই মুহূর্ত্তে তাহা আমাদের চেতনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়—অর্থাৎ, তাহাতে আমাদের ব্যক্তিগত অনুভূতির সেই অসীমতা বা গভীরতা আর থাকে না। যখন হইতে উহা অপরের সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায় তখন হইতে উহা আর আমাদের প্রাণের বস্তু নয়।

লাঠির সঙ্গে ভ্রমণের যে সম্পর্ক, লেখনীর সহিত চিন্তারও ঠিক সেই সম্পর্ক বটে; কিন্তু ছড়ি হাতে না থাকিলেই যেমন আরও স্বচ্ছন্দে চলা যায়, তেমনই হাতে কলম না থাকিলেই চিন্তার কাজটি আরও উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়। মানুষ যখন বুড়া হইতে থাকে তখনই তাহার লাঠি ও কলমের প্রয়োজন হয়।

মনের ভিতরে যখন কোন একটি তত্ত্ব জন্ম লইয়াছে, কিম্বা একটি কোন নূতনতর চিন্তাবস্তু দৃঢ়মূল হইয়াছে, তখন তাহা একটি জীব-দেহের মতই আপন প্রকৃতি অনুসারে বাড়িতে থাকে; কারণ, তাহা বাহির হইতে কেবল সেইরূপ খাদ্য সংগ্রহ করে যাহা তাহার সেই ধাতু-প্রকৃতির অনুরূপ বা অনুকূল; অপর পক্ষে, যে সকল পদার্থ তাহার পক্ষে হানিকর, বা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তাহাকে হয় বর্জ্জন করে, কিম্বা, একবার গ্রহণ করিয়া থাকিলে পুনরায় বাহির করিয়া দেয়।

কোন গ্রন্থ অমর হইতে হইলে তাহার এত গুণ থাকা চাই যে, কেহই এককালে সবগুলির মূল্য বুঝিতে পারিবে না। ফলে, সকল যুগেই সেই সকলের কয়েকটি মাত্র মানুষের মনোহরণ করিবে—এক এক যুগে এক এক ধরণের গুণ। এইরূপে, যুগ হইতে যুগান্তের মনুষ্যসমাজের রুচি ও মনোভাবের পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও, তেমন

গ্রন্থ কখনও খ্যাতিহীন হইবে না—কোন যুগে সেই খ্যাতির কারণ একরূপ, কোন যুগে বা আর একরূপ হইবে।

এমন গ্রন্থের লেখক যিনি, অর্থাৎ যাঁহার গ্রন্থ এইরূপ চিরজীবী হইবার সামর্থ্য রাখে—ভবিষ্যৎ কালের বিভিন্ন ও বিচিত্র মানব-মন যাহার রসাস্বাদন করিবে—তেমন গ্রন্থের গ্রন্থকার সারা জগতেও, তাঁহার মনের দোসর খুঁজিয়া পাইবেন না; ঐ যে অতিরিক্ত স্বাতন্ত্র্য, উহার জন্যই, তিনি আর সকলের বিপরীত না হইয়া পারেন না।—এমন কি, তিনি যদি অতিদীর্ঘ পরমায়ু লাভ করিয়া, পর পর কয়েক পুরুষের মধ্যে বাস করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার ঐ অবস্থা ঘুচিত না, কেহই তাঁহার 'মনের মিতা' হইত না। যদি তিনি বিশেষ যুগের বিশেষ সমাজের মানুষ হইতেন, তবে তাঁহার চিন্তারাজি—অপর সকলের মতই শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয় না কেন, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন হইত।

প্রায় প্রত্যেক যুগে, সাহিত্যেই হোক আর শিল্পকলাতেই হোক, একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়,—যদি কোন অসত্য ধারণা, অভব্য ফ্যাশন, বা অভদ্র আচার একবার চলিয়া যায়, তবে তাহাই সকলের বড় প্রিয় হইয়া থাকে। যাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা বড়ই অল্প, তাহারা ঐগুলাকে অনুকরণ ও অভ্যাস করিতে অধীর হইয়া উঠে। যাহারা বুদ্ধিমান, তাহারা উহার কি মূল্য তাহা জানে—তাই ঘৃণা করে, এবং চলতি ফ্যাশনের সম্মান হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু কয়েক বৎসর যাইতে না যাইতে সাধারণ মানুষেরাও ঐ ফ্যাশনের ফাঁকি ধরিয়া ফেলে, তখন তাহারাও উহাকে পরিহাস করে; এতদিন যে সকল রচনা এত ভাল লাগিয়াছিল, সেগুলা তখন রংছুট হইয়া যায়—সস্তায় তৈয়ারী বাড়ীর দেয়াল-ঢাকা পলস্তারার মত। অতএব, যে মত বা চিন্তাকে আমরা বরাবরই আমাদের অন্তরে মিথ্যা বলিয়াই জানি, তাহাই যখন স্বীকৃত হয়, জনসাধারণ যখন উচ্চরবে তাহার জয় ঘোষণা করে—তখন দুঃখিত না হইয়া বরং হৃষ্ট হওয়াই উচিত। শীঘ্রই উহার আবরণ খসিয়া পড়িবে, এবং তখন ঠিক ঐরূপ উচ্চরবেই সে কথার ঘোষণাও হইবে; যেন একটা ফোঁড়া ফাটিয়া গিয়াছে।

লেখকের মানস-মুখের যে আকৃতি, তাহারই নাম 'ষ্টাইল'। মানুষের চরিত্র বুঝিবার পক্ষে, তাহার দৈহিক আকৃতি অপেক্ষা ঐ মানস-আকৃতি আরও নির্ভরযোগ্য। অপর ব্যক্তির রচনাভঙ্গি অনুকরণ করা, আর মুখে একটা মুখোস-পরা একই। মুখোসটা যতই নিপুণ হউক, শীঘ্র তাহা বিরস ও দৃষ্টিকটু

হইয়া উঠে, কারণ উহার জীবন নাই, উহাপেক্ষা অতি কুৎসিত জীবিত-মুখও ভালো। ভাষার যদি কোন কৃত্রিম ভঙ্গিমা থাকে, তবে তাহা মুখ-বিকৃতি বা ভ্যাংচানির মত। যে ভাষায় লোকে লিখিয়া থাকে, তাহাকে সেই জাতির বিশিষ্টমুখাকৃতি বলা যাইতে পারে; গ্রীকদের ভাষা হইতে ক্যারিবিয়ান দ্বীপের অধিবাসীদের ভাষা পর্য্যন্ত—সর্ব্বপ্রকার ভাষার সহিত সর্ব্ব-প্রকার পার্থক্য তাহাতে আছে।

পরের ভাষা ও রচনারীতির দোষ লক্ষ্য করা একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম—কারণ, তদ্দ্বারা নিজেদের রচনায় অনুরূপ ত্রুটি সম্বন্ধে সতর্ক হইতে পারি।

কোন লেখকের রচিত গ্রন্থের প্রাথমিক মূল্য, বিচার করিবার পক্ষে সমস্ত বইখানি পড়িয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই; তিনি কোন্ বিষয়ে কি লিখিয়াছেন তাহা না জানিলেও চলে; তাহা করিতে হইলে আদ্যোপান্ত পড়িতে হয়। তিনি—কি লিখিয়াছেন তাহা নয়—কেমন লিখিয়াছেন, কেবল ইহাই দেখিয়া লইলে যথেষ্ট। তাঁহার চিন্তার সেই যে প্রকার বা ভঙ্গি—তাহার সাধারণ লক্ষণ ও মূল প্রকৃতি—রচনার ঐ ষ্টাইলেই নিখুঁতভাবে প্রকাশ পাইবে। মনের ঐ যে আকারগত বৈশিষ্ট্য উহা তাঁহার সকল রচনাতেই সমান—বিষয়বস্তু যেমনই হৌক্, বক্তব্য যাহাই হৌক। উহাই সেই আদি উপাদান যাহা হইতে তাঁহার চিন্তা ও ভাবনারাশি গড়িয়া উঠিয়াছে—সেই ভাবনা বা চিন্তা যতই বিভিন্ন হউক। এক ব্যক্তিকে কোন পথিক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, অমুক স্থানে পৌঁছিতে কতক্ষণ লাগিবে? তাহাতে ঐ ব্যক্তি বলিয়াছিল, তুমি কেমন হাঁটো দেখি; তাহার অর্থ, তোমার চলনভঙ্গি দেখিলেই বুঝিতে পারিব তুমি কতক্ষণে কতখানি পথ যাইতে পারিবে। আমারও ঠিক তাই; আমিও কোন পুস্তকের কয়েকখানা পাতা পড়িলেই বুঝিতে পারি, উহার দৌড় কতখানি।

অন্তরের অন্তরে এই সত্যটি অনুভব করে বলিয়াই, অতি সাধারণ লেখকেরা, তাহাদের নিজস্ব স্বাভাবিক ষ্টাইলকে ঢাকিবার চেষ্টা করে। যেমন সে ইহা বুঝিতে পারে, অমনই বাধ্য হইয়া নিজের স্বাভাবিক ভঙ্গি ত্যাগ করে; ঐ স্বাভাবিক ভঙ্গিটি রক্ষা করার সাহস কেবল তাহাদেরই আছে যাহারা নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন—নিজেদের উপর যাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। প্রতিভাহীন লেখকদের পক্ষে এমন সঙ্কল্প করাই অসম্ভব যে—মনে যাহা আছে, তাহাকে ঠিক তেমনটি করিয়াই ব্যক্ত করিব; তাহারা মনে করে, লেখা যদি

বড় সরল হয়, তবে তাহাদের গৌরবহানি হইবে। যদি কোনরূপ কুবুদ্ধি না করিয়া, যতই সাধারণ হউক—যে কয়টা কথা প্রকৃতই তাহার কথা, সেইগুলিকে বিনা আড়ম্বরে, অতিশয় সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে প্রকাশ করিত, তবে তাহাই সুপাঠ্য হইত, এমন কি, বিষয়ের দিক দিয়া হয়তো শিক্ষাপ্রদও হইত। তাহা না করিয়া, তাহারা গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, ফলে ভাষাটাকে কৃত্রিম ও জটিল করিয়া তোলে; নূতন নূতন শব্দ তৈয়ারী করে, এবং বাক্যের স্তূপে বক্তব্যটাই চাপা পড়িয়া যায়। অনেকেই তাহাদের ভাষা খুব গুরু-গম্ভীর করিতে চায়, যাহাতে লেখা খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গভীর বলিয়া মনে হইতে পারে;—লোকে তাহার অর্থ সহসা বুঝিতে না পারিয়া মনে করিবে, ভিতরে অনেক কিছু আছে। এইজন্যই তাহারা চিন্তাগুলাকে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা করিয়া দেয়—খুব সংক্ষিপ্ত, দ্ব্যর্থপূর্ণ এবং অতিশয় বিরুদ্ধ ভাব-সমন্বিত বাক্যরাশি রচনা করে। এতদ্ব্যতীত এমন লেখকও আছে, যাহারা কথার পর কথা গাঁথিয়া যায়—নিজেরা তাহার বিন্দুবিসর্গ বুঝেনা; ভাবে. অপর কেহও তাহাদের সেই কথার অর্থ সহজে বাহির করিতে পারিবে না। ইহাদের আর কোন উদ্দেশ্য নাই—কেবল নূতন নূতন ভঙ্গির আবিষ্কার, আর অর্থের পরিবর্ত্তে বাক্যের পরিবেষণ; উহার দ্বারা বিদ্যাবুদ্ধির অভাবটাকেই বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাব বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চায়। এই উদ্দেশ্যে, উহারা একবার এটা, একবার ওটা—এইরূপ কত রকমের ভঙ্গিমার কসরৎ করিয়া থাকে, যেন পাণ্ডিত্যের এক-একটা পাগড়ী পরিতেছে! বড়ই কৌতুককর! ঐরূপ অভিনব ভঙ্গির দ্বারা অর্ব্বাচীন পাঠক-সমাজ কিছুকাল প্রতারিত হয়; তার পরই ফাঁকি ধরা পড়ে, লোকে বুঝিতে পারে, ঐ ভঙ্গি একটা প্রাণহীন কৃত্রিম মুখোসমাত্র—তখন তাহাদের হাসির ভয়ে, নূতন একটা কিছু উদ্ভাবন করিতে হয়।

কিন্তু ঐ যে দুর্ব্বোধ্যতার ছদ্মবেশ, উহাই সবচেয়ে বেশিদিন টিকিয়া থাকে,—একমাত্র জার্ম্মানীতেই ইহা সম্ভব; Fichte ইহার আদি-গুরু, Schelling উহার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, পরাকাষ্ঠা হইয়াছে Hegel-এর হাতে; প্রত্যেকেই যথোচিত সুফলও লাভ করিয়াছেন। অথচ, লোকে বুঝিতে পারে না যে, এমন করিয়া লেখাই সবচেয়ে সহজ; অপর পক্ষে, গভীর বিষয়গুলি সহজবোধ্য করিয়া লেখার মত দুরূহও কিছু নাই। যদি লেখকের কিছুমাত্র বিদ্যাবুদ্ধি থাকে, তবে সে আমার ঐ উপরে বর্ণিত ভঙ্গিমাগুলির শরণাপন্ন হইবে না, সে নিজে

যেমন লেখাতেও তাহা তেমনই প্রকাশ করিতে পারিবে। যে একটা বিষয়ে লেখক মাত্রেরই সতর্ক থাকা উচিত তাহা এই যে, যতটুকু বিদ্যা তাহার আছে তাহার অধিক দেখাইবার চেষ্টা যেন না করে; সেইরূপ করিলেই পাঠকের মনে সন্দেহ জাগে যে, তাহার কোন বিদ্যাই নাই; কারণ, কেহ যদি কিছুর ভাণ করে, তবে বুঝিতে হইবে ঠিক সেই বস্তুই তাহার নাই। এইজন্যই কোন লেখককে স্বভাব-সরল আখ্যা দিলে সেটা প্রশংসা বলিয়াই গণ্য হয়, কারণ তাহার অর্থ এই যে, সেই লেখক নিজেকে নিজের মত করিয়া প্রকাশ করিতে পারে।

সাধারণতঃ সরল ও অকৃত্রিম যাহা তাহাই মানুষকে আকৃষ্ট করে—যাহা কিছু কৃত্রিম তাহাতে ঘৃণার উদ্রেক হয়। এইজন্য সরলতা যেমন সত্যের একটি লক্ষণ, তেমনই প্রতিভারও বটে। চিন্তার সৌন্দর্য্যই ষ্টাইলকে সুন্দর করে; অপর পক্ষে, যে সকল লেখকের চিন্তাশক্তি নাই, চিন্তা-করার ভাণ আছে, তাহাদের রচনা-কৌশলই তাহাদের চিন্তার সৌন্দর্য্য-সম্পাদন করিয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হয়; কথাটা বুঝিয়া দেখা উচিত। রচনার যে রূপ, যাহাকে ষ্টাইল বলে, তাহা রচনার অন্তর্গত ভাব-চিন্তারই একটা ছায়া-ছবি; রচনার সেই ষ্টাইল যদি কৃত্রিম বা অস্পষ্ট হয় তবে বুঝিতে হইবে লেখকের মানস-প্রকৃতিই অস্ফুট ও জড়তা-পূর্ণ। অতএব, রচনারীতির প্রথম সূত্র হইবে—না, প্রথম নয়, এই একটাই সকল উৎকৃষ্ট রচনার পক্ষে যথেষ্ট—যে, লেখকের সত্যকার কিছু বক্তব্য থাকা চাই। কথাটা বড় গুরুতর—ঐ একটার ভিতরেই সব আছে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়িয়া গেলেও এই সব লেখা হইতে একটা কিছু সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় না। অপর পক্ষে, যিনি সুলেখক তিনি শীঘ্রই পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন এইজন্য যে, তাহারা বুঝিতে পারে, তাঁহার সত্যই কিছু বলিবার আছে, এবং তাহা বলিবার যোগ্য; অতএব বুদ্ধিমান পাঠক তাঁহার গ্রন্থ মন দিয়া পড়িবার জন্য ধৈর্য্য ধারণ করে। এইরূপ লেখক তাঁহার বক্তব্য যে, অতি সরল করিয়া সহজ ভঙ্গিতে প্রকাশ করিতে চান, তার কারণ, তাঁহার যে সত্যই কিছু বলিবার আছে! তিনি পাঠকের মনে সেই কথাটি ধরাইয়া দিতে চান—যাহা আর কাহারও নয়, তাঁহার নিজেরই।

উপরে রচনাভঙ্গির যে দুর্বোধ্যতার কথা বলিয়াছি তাহাও দুই প্রকার হইতে পারে; এক, গ্রন্থেরই অন্তর্গত; আর এক—পাঠকের ব্যক্তিগত। প্রথমটির কারণ, লেখক যে বিষয়ে লিখিতেছেন, সে বিষয়ে তাঁহার সুস্পষ্ট ও সুসম্পূর্ণ জ্ঞান

নাই ; যাহার সেই জ্ঞান আছে, সে তাহার সেই জ্ঞানটাকেই অপরের মনে সঞ্চারিত করিতে চাহিবে, কাজেই, তাহার বক্তব্য অতিশয় সুপরিমিত, সুসম্বদ্ধ ও সুনির্দ্দিষ্ট হওয়া চাই ; তাই তাহাতে অবান্তর বা অর্থহীন কোন বাক্য থাকে না, এবং সেই কারণে তাহা পাঠকের চিত্তকে বিমুখ করে না। যদি তাহার মূল প্রতিপাদ্য ভ্রান্তও হয়, তথাপি সেরূপ ক্ষেত্রে যদি তাহা সুচিন্তিত, সুবিচারিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ, অন্ততঃ তাহার ছাঁদটা নির্ভুল হয়, তেমন রচনারও একটা মূল্য আছে। কিন্তু ঠিক সেই কারণে, যে রচনার বিষয়বস্তুই সুস্পষ্ট নয়, তাহা সর্ব্বদাই মূল্যহীন। আবার, রচনা যে ব্যক্তিগত কারণে নীরস হয় সেই কারণ এমন সুনিশ্চিত নয়; হয়তো পাঠকের রুচি অন্যরূপ, সব রকম লেখা তাঁহার ভাল লাগে না। এইজন্য অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থও পাঠকবিশেষের সুখপাঠ্য না হইতে পারে, আবার অতি নিকৃষ্ট পুস্তকও কোন কোন ব্যক্তির হৃদয়গ্রাহী হয়,—সেই পুস্তকের বিষয়বস্তু, কিম্বা সেই লেখকের প্রতি অনুরাগই ইহার কারণ।

জর্ম্মান লেখকেরা যেন এই কথাটা বুঝিয়া দেখেন যে, সম্ভব হইলে প্রত্যেকেই চিন্তা করিবার সময়ে অতি মহৎ ব্যক্তির মতই মহৎ চিন্তা করিবেন বটে, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার সময়ে সাধারণ বাক্যরীতিই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। চিন্তা যতই অসাধারণ হউক, সাধারণ ভাষাতেই তাহা ব্যক্ত করা উচিত। কিন্তু লোকে ইহার ঠিক উল্টাই করে। আমরা প্রায় দেখিতে পাই, লেখকগণ, অতি তুচ্ছ বিষয়কে উচ্চ ভাষা দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করেন ; অতি সাধারণ চিন্তাকেই অদ্ভুত, উদ্ভট, অতিশয় কৃত্রিম ও অনভ্যস্ত শব্দের দ্বারা ভূষিত করেন।

যে সকল লেখক অকারণে অত্যধিক শব্দাড়ম্বর পছন্দ করে তাহাদের আচরণ অনেকটা সেই সকল ব্যক্তির মত যাহারা সমাজে নিম্নশ্রেণী বলিয়া পরিচিত হইবার ভয়ে সর্ব্বদা দামী পোষাক পরিয়া থাকে। কিন্তু সত্যকার অভিজাত ভদ্রলোক যিনি, তাঁহার এ ভয় নাই—অতিশয় দীন দরিদ্রবেশেও লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারে। অতএব, যে প্রকৃতই অভিজাতবংশীয় নয় তাহার পোষাক পরিচ্ছদে একটা এমন চটক থাকে যে, তাহা দ্বারাই যেমন তাহাকে চিনিয়া লওয়া যায়, তেমনই, ভাষার ঐ চটকের দ্বারাই লেখকের জাতি-পরিচয় পাওয়া যায়।

তথাপি, ঠিক যে-ভাষায় আমরা কথা বলি, সেই ভাষায় সাহিত্য রচনা করাও ভুল। ভাষার যে ভঙ্গি অতীতের রচনাবলীতে অমর হইয়াছে, লিখিত ভাষার সহিত সেই ভঙ্গির একটা সাদৃশ্য থাকা চাই,—ঐ যে ভঙ্গি উহাই প্রকৃতপক্ষে সকল

উৎকৃষ্ট ষ্টাইলের আদিরূপ। অতএব, লিখিত ভাষায় কথা কহিতে যাওয়া যেমন দোষাবহ, কথ্যভাষায় লিখিবার চেষ্টাও তেমনই।

ভাষার অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা রচনার একটি অতিশয় কুলক্ষণ। ঐরূপ শতকরা নিরানব্বইটা রচনার একমাত্র কারণ—চিন্তার অস্পষ্টতা। কোন একটি সত্যকার ভাব মনে উদয় হইলে সেই ভাবটারই চেষ্টা হইবে অতিশয় পরিষ্কার স্পষ্ট ভাষায় নিজেকে ব্যক্ত করা; তেমন ভাষার জন্য খুব বেশি পরিশ্রম করিতে হয় না, কারণ, ভাব যদি সুস্পষ্ট হয়, তবে তাহার অনুরূপ স্পষ্ট ভাষা জুটিবেই। যাহারা, অতি দুরূহ, দুর্বোধ্য, জটিল এবং দ্ব্যর্থপূর্ণ বাক্য রচনা করে, তাহারা যে কি বলিতে চায় তাহা নিজেরা ঠিক করিতে পারে না; তাহাদের মনে ঝাপসা ধারণা মাত্র আছে, সেই ধারণা চিন্তার আকারে ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এই সত্যটা তাহারা পরের কাছেও যেমন, নিজেদের কাছেও তেমনই গোপন করিতে চায়। ভলটেয়ার (Voltaire) ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন, যথা—"অধিকাংশ লেখক বাগ্‌বাহুল্যের দ্বারা তাহাদের চিন্তাশক্তির অভাব ঢাকিবার চেষ্টা করে।"

লেখকেরা পাঠকের সময়, মনঃসংযোগ এবং ধৈর্য্য—এই তিনটির উপরে জুলুম না করেন; তাহা হইলে পাঠকও বিশ্বাস করিবে, সে যাহা পড়িতেছে তাহা পড়িবার যোগ্য, তাহার পরিশ্রম সার্থক হইবে। বরং ভালোর কিছু বাদ যায় সেও ভালো, তবু মন্দ কিছু লেখার মধ্যে যেন না থাকে। সব কথা নিঃশেষে বলিবার প্রয়োজন নাই; পাঠক যাহা নিজেই বুঝিয়া লইতে পারে তাহা না বলাই সঙ্গত। যাহারা নিকৃষ্ট শ্রেণীর লেখক তাহারা একটা ক্ষুদ্র অর্থ-প্রকাশের জন্য অনেক কথা লেখে; যাঁহারা প্রতিভাবান, তাঁহাদের রচনার একটি নিশ্চিত লক্ষণ এই যে, তাঁহারা অতি অল্প কথায় বৃহৎ অর্থ প্রকাশ করেন।

যে সত্য যত নগ্ন তাহা ততই সুন্দর, এবং তাহার প্রকাশভঙ্গি যত সরল হয়, ততই তাহা হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে। ইহার কারণ, সে রচনা সরল বলিয়া—অর্থাৎ তাহাতে কোন অপর অর্থ বা চিন্তার মিশ্রণ থাকে না বলিয়া, সেই বাক্য শ্রোতার মনকে একাগ্র করিয়া রাখিতে পারে; আরও কারণ, শ্রোতা দেখিতে পায়, এ ব্যক্তি বক্তব্যকে কোনরূপ অলঙ্কার বা বেশভূষার দ্বারা সজ্জিত করিয়া তাহার মনকে বিক্ষিপ্ত বা প্রতারিত করিতে চায় না, বক্তব্য বস্তু নিজের গুণেই মুগ্ধ করে। ঠিক এই কারণেই গ্যেটের (Goethe) স্বচ্ছন্দ সরল কবিতা শিলারের (Schiller) বক্রোক্তিপূর্ণ কবিতার সহিত তুলনায় এত গরীয়ান্‌। ঐ এক

কারণেই অনেক পল্লীগীতি ও গাথা আমাদিগকে এমন মুগ্ধ করে। এইরূপ সরলতা এবং ভাবের অকপট অভিব্যক্তি সকল কলা-শিল্পের একটি বিশিষ্ট গুণ, কারণ, যাহা কিছু মহান্, তাহার সহিত ঐ সারল্যের একটি সহজ সম্বন্ধ আছে।

আবার বাক-সংযমের জন্য রচনার প্রাঞ্জলতা যেন নষ্ট না হয়—ব্যাকরণের তো কথাই নাই। অত্যন্ত সংক্ষেপ করিবার আগ্রহে চিন্তার বাগ্‌দেহকে শীর্ণ করা,—কথাটা অস্পষ্ট রাখা, কিম্বা অর্থটি বিকৃত করিয়া দেওয়ার মত বুদ্ধিহীনতা আর নাই।

অতিশয় ব্যক্তিগত রচনাভঙ্গি বলিতে যে আর একপ্রকাব দোষ জর্ম্মান লেখকদের মধ্যে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার কারণ, এই সকল লেখক মনে করে, তাহারা যাহা লিখিতেছে তাহার অর্থ নিজেরা বুঝিতে পারিলেই যথেষ্ট, পাঠকেরা সেই অর্থ নিজেদের চেষ্টায় বুঝিয়া লউক। পাঠকদের কথা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া ইহারা যেন নিজেদের সঙ্গে নিজেরা আলাপ করিতে থাকে। কিন্তু রচনা জিনিষটা তো এইরূপ একক উক্তি নয়, বরং আসলে উহা দুইয়ের মধ্যে একটা কথোপকথন; এবং যেহেতু সেইরূপ কথোপকথনে অপর পক্ষের প্রশ্ন করিবার সুযোগ নাই, এজন্য লেখককে তাঁহার বক্তব্য অতিশয় স্পষ্ট ও সুসম্বদ্ধ করিয়া বলিতে হইবে। অতএব রচনার ষ্টাইল লেখকের নিজ-চিন্তানুসারী (Subjective) হইলে চলিবে না, পর-চিন্তানুসারী (Objective) হইতে হইবে; এবং সেইরূপ হইতে হইলে এমন ভাবে বাক্য-যোজনা করিতে হইবে যে, পাঠক যেন লেখকের চিন্তাকে ঠিক লেখকের মত করিয়াই নিজের মনে অনুসরণ করিতে পারে। এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করিতে হইলে লেখককে সর্ব্বদা একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, তাহা এই যে,—চিন্তাবস্তুকে নিজের মস্তিষ্ক হইতে কাগজের উপরে নামাইয়া দেওয়া যত সহজ, ঐ কাগজ হইতে পরের মস্তকে তাহা উঠাইয়া দেওয়া তত সহজ নহে।

যে লেখকদের লেখায় কোনরূপ যত্নের লক্ষণ নাই, তাঁহারা নিশ্চয় নিজেরাই সেই লেখাকে মূল্যবান মনে করেন না। কারণ, যখন আমাদের বিশ্বাস হয় যে, এমন একটা কিছু মনের মধ্যে উদয় হইয়াছে যাহা সত্য ও প্রকাশযোগ্য, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে সুস্পষ্ট আকারে, পরিচ্ছন্ন ভাষায় লিখিয়া রাখিবার জন্য যে প্রযত্ন, তাহা আপনা হইতেই আসে। কথিত আছে, প্লেটো তাঁহার 'রিপাব্লিক'-খানির ভূমিকা-অংশ সাতবার নূতন করিয়া লিখিয়াছিলেন, প্রত্যেক বারে বিভিন্ন

রকমে পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আর, রচনার রীতি সম্বন্ধে জার্ম্মাণ জাতির মত এমন অমনোযোগী জাতি আর নাই,—পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও তেমনই; ঐ দুইটা দোষেরই মূল এক—এ জাতির চরিত্র। পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কোন নিয়ম না মানিলে যেমন ভদ্র সমাজের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়, তেমনই, যে লেখক রচনার রীতি ও শ্রী-সৌষ্ঠব গ্রাহ্য করে না সেও পাঠকগণকে নিরতিশয় অবজ্ঞা করে—ফলও হাতে হাতে ফলে, কোন শিক্ষিত লোক তেমন পুস্তক পাঠ করিবে না!

কথাসাহিত্যে প্রকৃতি-পন্থা

[বিখ্যাত ফরাসী লেখক Emile Zola-লিখিত প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদ হইতে]

ভূমিকা

য়ুরোপীয় কথা-সাহিত্যের যে ধারাটিকে Naturalism নাম দেওয়া হইয়াছে, আমরা তাহাকেই প্রকৃতি-পন্থা বলিয়াছি। এই প্রকৃতিপন্থাই পরবর্ত্তী কালে তথাকার সাহিত্যে নানা রূপ ধারণ করিয়াছে। তথাপি এখনও কথা-সাহিত্যে (Fiction), কল্প-পন্থা (Romance) ও বাস্তব-পন্থার (Realism) মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও আপোস চলিয়াছে, তাহাতে এইরূপ আলোচনায় তেমন নূতনত্ব আর না থাকিলেও উহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি মূল্যহীন নহে। এই প্রবন্ধের মনস্বী লেখক প্রকৃতি-পন্থা বলিতে যাহা বুঝাইতেছেন, এবং যাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন-প্রসঙ্গে বালজাক (Balzac), মোপাসাঁ (Maupassant) প্রভৃতির প্রশংসা করিয়াছেন, তাহার প্রধান প্রবৃত্তি সংক্ষেপে এইরূপ। বাহ্যপ্রকৃতির বাস্তব রূপগুলিতে যাহা প্রকাশ পায়—মনুষ্যস্বভাবসুলভ প্রীতি ও অপ্রীতি, এবং সামাজিক সুনীতি-দুর্নীতির সংস্কার ত্যাগ করিয়া, স্থির ও গভীর দৃষ্টিতে তাহাই নিরীক্ষণ করিতে হইবে। তদ্দ্বারা সেই বাস্তবের মধ্যেই 'জীবন' নামক এক মহা-রহস্য —সৃষ্টির অন্তর্গত একটি দুর্জ্ঞেয় অব্যভিচারী নিয়মের লীলা—প্রত্যক্ষ করা যাইবে; এবং তাহাতেই একপ্রকার রসোদ্রেক হইবে। কল্পনার যে রস তাহা অপেক্ষা এই রস সত্য বলিয়াই শ্রেষ্ঠ। এই জন্য প্রকৃতিপন্থী লেখকেরা মানুষের মনোগত সত্য-সুন্দরের আদর্শকে ভ্রান্ত ও অসম্পূর্ণ বলিয়া সৃষ্টির বাস্তব-সত্য—অর্থাৎ ঐ সর্ব্বতঃপ্রবাহী জীবন-ধারার তত্ত্বটিকেই বেদবৎ মান্য করিয়াছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এই ভাবদৃষ্টির উদ্ভব হইয়াছিল ফরাসী সাহিত্যে; তাহাতে মনে হয়, ঐ তত্ত্ব ও তাহার রস-সাধনা ফরাসী জাতির ভাব-জীবনের অনুকূল। তথাপি, ফরাসীর ঐ প্রকৃতিবাদ পাশ্চাত্য সংস্কারের গণ্ডি অতিক্রম করিতে পারে নাই; 'জীবন' বলিতে তাহারাও, নিছক জৈবপ্রবৃত্তি বা প্রাণধর্ম্মের উপরে উঠিতে পারে নাই,—আরও ভিতরে দৃষ্টি করিয়া প্রকৃতির অধ্যাত্ম-গভীর রূপ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। তাই ঐ ভাবদৃষ্টি হইতেই য়ুরোপীয় কথা-সাহিত্যে নবনব ধারার উদ্বর্ত্তন হইলেও, এ পর্য্যন্ত সেই এক দৃষ্টির বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই।

এতদিন পরে, যে একজন ইংরেজ লেখকের রচনায় ঐ প্রকৃতিবাদের মধ্যেই একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তিনি—Somerset Maugham। ইংরাজ হইলেও ইঁহার সাহিত্যিক প্রেরণায় ফরাসী সংস্কারই প্রবল; সম্ভবতঃ ইহাও একটি কারণ। তিনি ফরাসীর সেই প্রকৃতিপন্থাকেই সহসা আরও অন্তর্মুখী করিয়াছেন; সেই পাশ্চাত্য দৃষ্টিতেই প্রাচ্যের পিপাসা যুক্ত হইয়াছে—যেন কোন অলক্ষ্য সূত্রে তাঁহার ভাব-জীবনে ভারতীয় প্রকৃতিবাদ সংক্রামিত হইয়াছে। ইঁহার গল্পগুলিতে, কেবল প্রাণশক্তির দুর্দ্দমনীয়তাই নয়—জীবন যতই উন্নত হউক, তাহার মূলে শুধু পশুত্বই নয়, একটা গূঢ়তর ও মহত্তর কিছুর লীলা প্রকটিত হইয়াছে। প্রকৃতির নির্ম্মম, নীতিহীন স্বৈরিণী-মূর্ত্তির সহিত সংগ্রামে পশু-মানুষের যে পরাজয়, সেই পরাজয় সত্ত্বেও, মনুষ্যজীবনের একটা আত্মিক ট্রাজেডি তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। যেন সেই প্রকৃতির সহিত মানবাত্মার একটা ঘনিষ্ঠ আত্মিক সম্পর্কও আছে; মানুষ তাহার জীবনে সেই সম্পর্কের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না বলিয়াই—তাহাকে নানাপ্রকারে অস্বীকার করিতে গিয়া, অশেষ দুর্গতি ভোগ করে। Somerset Maugham প্রকৃতিকে শুধুই অন্ধ-প্রবৃত্তিময়ী জীবজননীর রূপেই দেখেন নাই, তিনি তাহার মধ্যে এমন এক শক্তিকে দেখিয়াছেন, যে শক্তি 'সত্য-সুন্দর-মহান্'কেই একটা উচ্চতর ও বৃহত্তর নীতির মহিমায় মহীয়সী করিয়াছে।

প্রকৃতি-পন্থার এই যে নবতম ভঙ্গি, ইহাতেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-সাধনার মিলন ঘটিতে সুরু হইয়াছে। আমাদের বাংলা কথা-সাহিত্যেও এই প্রকৃতিপন্থা অল্প কিছুকাল হইল দেখা দিয়াছে। আমরা য়ুরোপ হইতে গল্প-রচনার আর্ট আমদানি করিয়াছিলাম, তাই ইংরেজী সাহিত্যের সাক্ষাৎ প্রভাবে, আমরাও সেই আর্টের আদর্শে উৎকৃষ্ট কাব্যপন্থী গল্প ও উপন্যাস রচনা করিয়াছি। কিন্তু সেখানকার তুলনায়, অতি অল্পকালের মধ্যেই আমরা ঐ প্রকৃতিপন্থাকে আরও গভীর করিয়া ধরিতে পারিয়াছি; তার কারণ, বাঙালীর পক্ষে উহাই তাহার স্বধর্ম্ম—বাংলা কথাসাহিত্যে বাঙালীর সেই নিজস্ব সাধনা এইবার যেন একটু সাড়া দিয়াছে। বাঙালীর রক্তগত সংস্কার তান্ত্রিক, অর্থাৎ সে আরও গভীর-ভাবে প্রকৃতিপন্থী; ঐ তান্ত্রিক দৃষ্টিই প্রকৃতিবাদের চরম। শ্রীযুক্ত তারাশঙ্করের গল্পগুলিতে প্রকৃতিপন্থার যে লক্ষণ আছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার কতকগুলির স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত সমারসেট ম'ম-এর গল্পগুলির সহিত

তারাশঙ্করের কয়েকটি বিশিষ্ট গল্প তুলনা করিলে দেখা যাইবে—ইংরেজ লেখকের বিষয়বস্তু ও জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যাপকতর, এবং কল্পনা ও কলা-নৈপুণ্য উচ্চতর হইলেও, তারাশঙ্করের প্রকৃতি-চেতনা আরও সূক্ষ্ম,—তাঁহার ভাবদৃষ্টি আরও অনাসক্ত, অর্থাৎ কোন মতবাদের প্রচ্ছন্ন সংস্কার তাহাতে নাই।

কাব্যসাহিত্যে প্রকৃতি-পন্থা নামে যে একটি নূতন পন্থার উদ্ভব হইয়াছে আমি এখানে তাহার চারিটি লক্ষণের আলোচনা করিব—এ চারিটির যে বিচার তাহা নূতন পদ্ধতির লেখক, পাঠক ও সমালোচকের কাজে লাগিবে। (১) লেখকের আপন অনুভূতি প্রকাশ করিবার শক্তি। (২) কল্পনা-বৃত্তিকে প্রায় সর্ব্বত্র কতখানি শাসনে রাখা কর্ত্তব্য। (৩) রচনার মধ্যে বর্ণনামূলক অংশগুলির উপযোগিতা কোথায় ও কিরূপ? (৪) গল্পসাহিত্যে সুনীতির স্থান—যাহা লইয়া বিতর্কের অন্ত নাই।

প্রথমটির, অর্থাৎ রচনায় লেখকের নিজস্ব ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি সম্বন্ধে এমন কথা বলা যাইতে পারে যে, যে লেখকের এই শক্তি নাই, তিনি কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন না। এই যে এত লেখক, অন্য নানাগুণ সত্ত্বেও প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন না, তাহার একমাত্র কারণ—ইঁহারা আর সকলের মতই লিখিয়া থাকেন। ইঁহাদের ব্যাকরণ নির্ভুল হইতে পারে, বাক্যের গতি যেমন সচ্ছন্দ, কথাগুলিও তেমনি সুপ্রযুক্ত, এমন কি—রঙ্গীন হইতেও পারে, কিন্তু লেখায় সেই ব্যক্তিগত বিশেষ ভঙ্গিটি নাই, যাহা দ্বারা এক লেখককে অপর হইতে বিশিষ্ট করা যায়। একজন সুরসিক সমালোচক ইঁহাদের নাম দিয়াছেন—'মহাযানী সম্প্রদায়', অর্থাৎ ইঁহাদের ভাষার যানখানিতে সকলেই আরোহণ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ, ইঁহারা ভাষার একটা সাধারণ রীতি চটপট আয়ত্ত করিয়া লন, যে সকল বাক্য বা শব্দ তাঁহাদের চারিপাশে সর্ব্বদা ভন্ ভন্ করিয়া উড়িতেছে সেইগুলিকেই ধরিয়া ফেলেন। প্রায় দেখা যায়, তাঁহাদের একটি কথাও নিজস্ব নয়, যেন আর একজন পিছনে দাঁড়াইয়া যাহা বলিয়া দিতেছে তাহাই লিখিয়া চলিয়াছেন। তথাপি, যশোলাভ করেন না বলিয়া ইঁহারা বিস্ময় প্রকাশ করেন। একালের শক্তিমান কথাশিল্পী বলিতে কেবল তাঁহাকেই বুঝায়—যাঁহার বাস্তবতা-বোধ যেমন সুপরিমিত, তেমনই, যিনি নিজেরই প্রাণের

খানিকটা তাপ প্রকৃতির বক্ষে সঞ্চারিত করিয়া তাহার সেই রূপের কোন একটা নূতন দিক প্রদর্শন করিতে পারেন।

ফরাসী সাহিত্যে এই নিজস্ব ভাবপ্রকাশের শক্তি একজন লেখকের রচনায় পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, ইনি St. Simon। ইনি যেন নিজ দেহের শোণিত ও পিত্ত দুয়েরই রসে লেখনী সিক্ত করিয়াছিলেন, তাই আজিও তাঁহার পুঁথির পাতাগুলি জীবনাবেগে স্পন্দিত হইতেছে। বহু বিখ্যাত লেখকের রচনায় অলঙ্কারের ছটা ও বাক্যের সজ্জাকৌশল আছে, কিন্তু St. Simon-এর 'আত্মকথা'য় তাহার চিহ্নমাত্র নাই। তাঁহার প্রত্যেক বাক্য যেন এক একটি হৃদ্-স্পন্দন, সমগ্র গ্রন্থই যেন মনুষ্য-হৃদয়-নিঃসৃত একটা উচ্চরব, যেন একটা দীর্ঘ একক-উক্তি—একটা সশব্দ জীবন।

ব্যক্তিগত বচনভঙ্গি বলিতে আমি অবশ্য ভাষার একটা উদ্ভট বিকৃত ভঙ্গি মনে করিতেছি না; তেমন ভাষা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার একটা নিকৃষ্ট কৌশলমাত্র। আবার, ভাষার রীতিগত পরিপাট্যই যদি লেখকের একমাত্র লক্ষ্য হয়, তবে তাহাতেও সিদ্ধিলাভ হইবে না। লেখার ভিতরে লেখকের মস্তিষ্ক-রস ভরিয়া দিলেই চলিবে না, সেই সঙ্গে কিছু রক্তও মিশাইয়া দেওয়া চাই। M. Leon Cladel-এর লেখা সকলেই পড়িয়াছেন; অনেকের মত তাঁহারও বিশ্বাস ছিল যে, বাগ্‌বিন্যাসের নিখুঁত সৌষ্ঠবই রচনার প্রাণ, তাহাতেই উহা অমর হইয়া থাকে। এই একটি চিন্তা তাঁহাকে এমন পাইয়া বসিয়াছিল, এবং এমন একনিষ্ঠার সহিত তিনি ঐ নীতি পালন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সৃষ্ট নর-নারীর মূর্ত্তিগুলি হইতে প্রাণ একেবারে বিদায় লইয়াছে। সে যেন কতকগুলি মণি-মাণিক্যের মালা—মুগ্ধ করে, কিন্তু প্রাণে সাড়া জাগায় না। প্রকৃতিপন্থী লেখকগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের রচনা কেহ যদি পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তবে দেখিতে পাইবেন, তাহাতে ভাষার পালিশ, বা সুনিপুণ শব্দবিন্যাস নাই; বরং সেই ব্যক্তিত্বের লক্ষণ আছে, যাহা রচনাকে প্রানহীন কারুকার্য্যময় না করিয়া প্রাণবন্ত করিয়া তোলে। বালজাককে (Balzac) অবশ্য তাঁহার রচনারাজির সমষ্টিগত বিশালতার দিক দিয়া বিচার করিতে হইবে; তথাপি তাঁহার Contes Drolatiques-এর প্রত্যেকটি, রচনারীতির দিক দিয়া এক একটি মণিখণ্ড বলিলেও হয়। কিন্তু তাঁহার উপন্যাসগুলির ভাষায় যথেষ্ট বাহুল্যদোষ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব আছে।

ভাবপ্রকাশের এই স্বাধীন স্বতন্ত্র রীতি আর একজন বড় লেখক—Stendhal—উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্যগুলি অতিশয় সংক্ষিপ্ত, আবেগবর্জ্জিত, সারবান ও সুতীক্ষ্ণ; এ সকলই তাঁহার সেই অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ-শক্তির উপযুক্ত। Stendhal-এর রচনা যে খুব পরিপাটী ও পরিচ্ছন্ন এমন কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। এই প্রকাশ-ভঙ্গি তাঁহার প্রতিভারই উপযুক্ত ছিল। তাঁহার রচনারীতির সেই বাহ্যিক শিথিলতা ও সর্ব্বপ্রকার নিয়মলঙ্ঘন এমন একটি মৌলিকভঙ্গি বলিয়া মনে হয় যে, ফরাসী সাহিত্যে সে যেন একটা ছাপ-মারা ভঙ্গি হইয়া আছে। Flaubert ছিলেন শিল্পী; তাই তাঁহার বাক্যগুলিকে তিনি রীতিমত পালিশ করিয়া দিতেন; তথাপি তাহার মধ্যেও ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যেমন, তেমনই, একটা জীবন্ত-ভাব ফুটিয়া রহিয়াছে। Goncourt-র, (E. and J. De Goncourt) এবং Daudet ও Maupassant-এর রচনাবলীতেও সর্ব্বত্র জীবন-লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহাদের রচনায় কেবল ব্যক্তিগত রীতি নয়, প্রতিভার দীপ্তিও আছে—অন্তরের সেই অনুভূতি ও আবেগ আছে যাহার স্পর্শে বাহিরের বস্তুগুলা সজীব হইয়া উঠে।

পূর্ব্বকালে ঔপন্যাসিকের প্রশংসা করিতে হইলে বলা হইত—"ইহার কল্পনাশক্তি অসাধারণ।" কিন্তু আজিকার দিনে ঐরূপ প্রশংসা একরূপ নিন্দা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার কারণ, একালে উপন্যাসের অবলম্বন যাহা তাহাই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এখন কল্পনাই কথাশিল্পীর প্রধান সহায় নহে। Hugo তাঁহার Notre Dame de Paris-নামক উপন্যাসে এমন সকল ঘটনা ও চরিত্রের কল্পনা করিয়াছেন যাহাতে পাঠকচিত্ত গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়। George Sand তাঁহার Mauprat-নামক উপন্যাসে কল্পিত নায়ক-নায়িকার কল্পিত প্রেম এমনভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এককালের সকল নারী-পুরুষ তাহাতে হৃদয়ের উদ্দীপনা অনুভব করিত। কিন্তু কোন পাঠক বা সমালোচক Balzac অথবা Stendhal-এর কল্পনাশক্তির প্রশংসা করিতে সাহস পায় নাই। তাঁহারা যে উচ্চপ্রশংসার অধিকারী হইয়াছেন তাহা দুইটিমাত্র গুণে—অতি তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি, এবং সব-কিছুরই কারণ-সন্ধান। কাহিনী-রচনা করিবার শক্তিই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয়; তাঁহারা গল্প তৈয়ারী করেন নাই—নিজ নিজ কালের যথাযথ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহাদের

পরবর্ত্তী লেখকেরা—Goncourt, Flaubert ও Daudet—যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাহারও কারণ, ইঁহারা কিছুই কল্পনা করেন নাই, প্রকৃতির নিখুঁত রূপটি ধরিয়া দিবার দিব্যপ্রতিভা তাঁহাদের ছিল।

তথাপি, ইহাও সত্য যে, উপন্যাস-রচনায় এমন একটু ফাঁক থাকেই যাহা কল্পনায় পূরণ করিয়া লইতে হয়, একটা কাহিনী-সূত্র গড়িয়া লইতে হয়; তাহার সমাপ্তিটাও নাটকোচিত, এমন কি, বিয়োগান্ত হইলে ভাল হয়। কিন্তু তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় না; চারিদিকে প্রত্যহ যাহা ঘটিতেছে তাহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই হয়। তা ছাড়া, লেখক যে ঘটনাগুলি গল্পে সন্নিবিষ্ট করেন—তাহা চরিত্রগুলার বিকাশ-পথে স্বতঃই ঘটিয়া থাকে। কাহিনীগত নরনারী, পাঠকের সম্মুখে, তাহাদের সেই মানবীয় নাট্যরঙ্গের অভিনয় যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক ভাবেই করিবে। লেখকের প্রধান কর্ম্ম হইবে—কাহিনীর সেই কাল্পনিক অংশটুকুকে বাস্তবের আবরণে ঢাকিয়া দেওয়া। পাত্র-পাত্রী এবং পারিপার্শ্বিক উভয়ের জন্যই, ক্ষুদ্রতম বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, সে সকলের তাৎপর্য্যও চিন্তা করিতে হইবে। অতএব উপন্যাস-রচনার জন্য এক্ষণে যে শক্তির প্রয়োজন তাহা কল্পনাশক্তি নয়—বহির্জগতের বাস্তবরূপটিকে অন্তরে গ্রহণ করিবার শক্তি। সে এমন একপ্রকার বোধ-শক্তি বা অনুভব-শক্তি—যাহার বলে প্রাকৃতিক সৃষ্টির রসও যেমন উপলব্ধি করা সম্ভব, তেমনই তাহাকে তদ্বৎ চিত্রিত করাও যাইবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তেমন শক্তি অল্প লেখকেরই আছে; অধিকাংশই রং-কানা, যেটি যেমন তাহাকে ঠিক তেমনটি দেখিতে পায় না।

কোন কোন সমালোচক এই বাস্তব-দৃষ্টি বা বাস্তব-বোধের তত্ত্বটি অস্বীকার করিতে না পারিয়া অবশেষে কথাসাহিত্যের এই প্রকৃতিপন্থাকে ফোটোগ্রাফির সামিল বলিয়া মত-প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও একটা ভুল-বিচার। প্রকৃতিপন্থী লেখক-সম্প্রদায় যদিও তাঁহাদের ঐ সত্যনিষ্ঠা ও বাস্তবনিষ্ঠার জন্যই গর্ব্ব অনুভব করেন, তথাপি তাঁহাদের সেই প্রতিলিপিগুলিতে জীবনের গূঢ়তর রহস্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে তাঁহারা দৃঢ়চেষ্টিত। তাঁহাদের রচনায় জীবনের সেই জীবন্ত রূপ যে ফুটিয়া উঠে, তার কারণ—সেই স্বকীয় ব্যক্তিগত অনুভব-শক্তি, এবং তাহা প্রকাশ করিবার প্রতিভা। প্রকৃতিপন্থীরা যদি কল্পনাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে তাহা এই অর্থে যে, তাঁহারা বাস্তবের উপরে অবাস্তবের আরোপ করেন না; কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা কাজও করিতে হয়—বাস্তবের সত্যকে শুধুই বাস্তব

নয়, তাহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিবার জন্য প্রকৃত সৃষ্টিশক্তির চূড়ান্ত প্রয়াস করিতে হয়। সে কাজ যে কত দুরূহ, তাহার প্রমাণ—মাত্র কয়েকজন লেখকই ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

উপন্যাসের আখ্যান-বস্তু ও চরিত্রগুলাই সর্ব্বস্ব নয়; গল্প ও পাত্র-পাত্রীগণের জন্য একটা তদনুযায়ী বাস্তব স্থান-সন্নিবেশ চাই, কারণ, প্রকৃতি বলিতে শুধুই মানুষ নয়; সেই মানুষেরও একটা বিশিষ্ট সমাজ, বা জীবন-রঙ্গভূমি আছে, ভূমি ও আকাশের একটা বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী আছে, দুইটার মধ্যে একরূপ নাড়ীর যোগ আছে। উহাই উপন্যাসের বর্ণনা-ভাগ। একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা এখনও বর্ণনার কাজটিকে বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায় করি নাই। প্রাচীন কালে, প্রকৃতি-বর্ণনার জন্য, যে কতকগুলি বস্তুসম্পর্ক-বর্জ্জিত বিধিবদ্ধ উপকরণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহারই প্রতিক্রিয়ার ফলে, প্রকৃতি এখন স্বয়ং আমাদের সাহিত্যকর্ম্মে যেন জোর করিয়া প্রবেশ করিয়াছে; আমাদের মধ্যে কেহ কেহ—আমি নিজেও—প্রকৃতির প্রেমে মাথা ঠিক করিতে পারি নাই, আকাশ ও ভূমিতলের সৌন্দর্য্য, সূর্য্যালোক ও মুক্তবায়ু, এই সকলের নেশায় বুঁদ হইয়াছি। এমন কি, Goncourt-গণও তাঁহাদের উপন্যাসে প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী অপেক্ষা পাত্র-পাত্রীকে অধিকতর মর্য্যাদা দিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সেই বর্ণনাগুলিও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রাণহীন বাক্যসমষ্টি নয়; তদ্‌পরিবর্ত্তে, কোন একটি বিশেষ দৃশ্য-দর্শনে যে সত্যকার অনুভূতি জাগিয়াছে তাহারই যথার্থ প্রকাশ সেগুলিতে আছে। মনে হয়, কতকগুলি মানুষকেই দেখিতেছি না, সেই মানুষ চারিদিকের সকলকিছুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া, নিজের স্নায়ুতন্ত্রীর কম্পনে তাহাদিগকেও সমানুভূতিসম্পন্ন করিয়াছে। Goncourt-দের প্রকৃতি-বর্ণনায় কিছু বাড়াবাড়ি আছে বটে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে সকলের মধ্যে মানুষের হৃদয়টাও বাসা বাঁধিয়াছে, তাহাতেও জীবনের শ্বাস বহিতেছে।

উপন্যাসে বর্ণনার যথার্থ কাজ কি, তাহা যদি ভালো করিয়া বুঝিতে হয়, তবে গুস্তাভ ফ্লোবেয়ারের (Gustav Flaubert) লেখা পড়িতে বলি। ধাপে ধাপে চরিত্রটি ফুটাইয়া তুলিবার জন্য, বা চিত্রটি সম্পূর্ণ করিবার জন্য, পারিপার্শ্বিকের রঙগুলিও কত আবশ্যক, তাহার প্রমাণ উহাতে আছে। ফ্লোবেয়ার তাঁহার গল্পের পাত্র-পাত্রীকে চতুষ্পার্শ্বের সেইসব বর্ণনার মধ্যে হারাইয়া যাইতে দেন না, বরং সেই পরিবেষ্টনীই তাহাদিগকে স্ফুটতর করিয়া তোলে। এই জন্য Madame

Bovary ও L'Education Sentimentale এমন শক্তিশালী উপন্যাস হইতে পারিয়াছে। বালজাক (Balzac) তাঁহার নভেলের প্রথমে পৃষ্ঠাগুলিতে, নিলাম-ঘরের দ্রব্যাদির মত একটা প্রকাণ্ড তালিকা দিয়া, পাঠকের পথরোধ করেন। ফ্লোবেয়ার সেই তালিকা যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করিয়া, কেবল যে কয়টি নহিলে নয়, তাহাই রাখিয়াছেন। তাঁহার কথাও খুব কম ; খুব স্পষ্ট রেখায়, এবং কয়েকটি মাত্র সরল তুলিকাপাতে তাঁহার কাজ শেষ হইয়া যায় ; এমন এক-একটির উপরে তিনি জোর দেন যাহাতে অল্পের মধ্যেই সব আছে ; তাহাতেই তাঁহার চিত্র ও চরিত্রগুলি অবিস্মরণীয় হইয়াছে। এ বিষযে, আমি নিজে যথেষ্ট অপরাধ করিয়া থাকিলেও, আমার মত এই যে, যে-বর্ণনা চরিত্র-চিত্রণের প্রয়োজনকে ছাড়াইয়া যায়, তত্ত্বের দিক দিয়া তাহা নিন্দনীয়।

সাহিত্যে সুনীতি-দুর্নীতির যে প্রশ্ন উঠিয়া থাকে, তাহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। প্রকৃতিপন্থী উপন্যাসে মানুষের বাসনা, কামনা ও চিত্তবৃত্তির বিশ্লেষণ, এবং বাহিরে তাহা যে-রূপে প্রকাশ পায় তাহারই যথাযথ বিবৃতি থাকে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা-কালে বিজ্ঞানীকে যেমন অনেক কদর্য্য বস্তু লইয়া ঘাঁটাঘাটি করিতে হয়, ঔপন্যাসিককেও সেইরূপ করিতে হয়। প্রকৃতিপন্থী লেখকের কোন ব্যক্তিগত মতামত নাই, তিনি যেন সরকারী আদালতে বিচারপতির রায় লিখিবার কেরাণী মাত্র। কোন সিদ্ধান্ত বা বিচার তাঁহার নয়, তিনি কেবল নথী নকল করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানীর একমাত্র কাজ—যেমনটি করিয়া যাহা হয় বা ঘটে, তাহাই উত্তমরূপে দেখাইয়া দেওয়া, এবং দেখাইতে গিয়া কোন কারণে অর্দ্ধপথে নিরস্ত না হওয়া। কোন বিষয়েই একটা অতি-নিশ্চিত বা চরমতম সিদ্ধান্ত জাহির করা তাঁহার কাজ নয়, তেমন দুঃসাহস তিনি করিবেন না। তিনি কেবল ইহাই বলিয়া দেন যে, যে-সকল বস্তু চোখের সম্মুখে রহিয়াছে তাহাদের বস্তুগত সত্য এই ; স্থান, কাল, সংখ্যা ও পরিমাণ প্রভৃতি—বিভিন্ন বিধানের অধীন করিয়া সে গুলিকে পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করিলে এই এই ফল পাওয়া যায়। ইহার পর বিজ্ঞানী আর একপদও অগ্রসর হইতে পারেন না, যদি হন তবে তাঁহাকে অনুমান ও কল্পনার রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। তথায় অনেক কিছু সম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা বিজ্ঞানের বহির্ভূত। ঠিক সেইরূপ, প্রকৃতিপন্থী লেখকও তাঁহার সমীক্ষিত প্রকৃত ঘটনা হইতে একটুও দূরে যাইতে পারেন না ; তিনিও প্রকৃতির প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান রূপটি উত্তমরূপে দেখিবার প্রয়াস করিয়াছেন, যদি না করিতেন

তবে তিনিও ভ্রান্ত ও ভ্রান্তিজনক সিদ্ধান্তের কবলে পড়িয়া যাইতেন; এই কারণে, গল্পের মধ্যে তাঁকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তিনি কোথাও নিজের কথা একটিও বলেন নাই, কেবল যাহা যেমন দেখিয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাই বাস্তব সত্য; তাহা দেখিয়া পাঠক শিহরিয়াই উঠুন, আর হাসিয়া ভাঙ্গিয়াই পড়ুন; তাহা হইতে তিনি নিজের ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত নিজেই করিয়া লইতে পারেন। যে-লেখক নিজেও লেখার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় ঘোষণা করেন, তিনি বাস্তবের সেই দলিলগুলাকে মূল্যহীন করিয়া ফেলেন। এইরূপ মধ্যস্থতা সত্যনির্ণয়ের পক্ষে একটা বড় বাধা হইয়া দাঁড়ায়, সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। লেখকের নিজস্ব হৃদয়াবেগের পালিস বা রঙ লাগিয়া, বাস্তবের খনি হইতে উদ্ধৃত সেই শুভ্র ও অমসৃণ পাথরগুলা রূপান্তরিত হইয়া যায়; সেই ভাবাবেগের মূলে কত কুসংস্কার কত ভুল-ধারণাই না থাকে! যে-গ্রন্থে সত্যকেই স্থান দেওয়া হয়, তাহার আদর সর্ব্বকালে সমান থাকে; আর যে গ্রন্থে লেখক তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাসই ব্যক্ত করেন, তাহা কেবল সমসাময়িক পাঠক-পাঠিকার মনোহরণ করে।

আমাদের মত যাহারা প্রকৃতিপন্থী—তাহাদিগকে দুর্নীতি-পরায়ণ বলিয়া ভয়ানক গালি দেওয়া হয়; আমাদের অপরাধ, আমরা আমাদের গল্পে উপন্যাসে ধার্ম্মিক ও নরাধমকে সম-মর্য্যাদায় চিত্রিত করি, কোন চরিত্রের ভাল-মন্দ বিচার করি না। ঐ নরাধমগুলাকে গল্পে স্থান দিতে সমালোচকদের কোন আপত্তি নাই—যদি গল্পের শেষে তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দেওয়া হয় অথবা, লেখক যদি নিজেরই প্রচণ্ড ক্রোধ ও ঘৃণার দ্বারা তাহাদিগকে নিষ্পেষিত করিয়া দেন। ধার্ম্মিকগুলাকেও মাঝে মাঝে দু'চার লাইন প্রশংসা করা ও উৎসাহ দেওয়া উচিত। এই কারণে, আমাদের এমন নির্ব্বিকার মনোভাব, ও সহ্য-শক্তি বড়ই দূষণীয়। এমন মূর্খও আছে, যাহারা আমাদের ঐ কঠিন সত্যভাষণকেই মিথ্যাভাষণ বলিতে কুণ্ঠিত হয় না। তাহারা বলে—"কি আশ্চর্য্য! ইহারা কি বদমায়েস ছাড়া আর কোন মানুষ খুঁজিয়া পায় না! ইহাদের গল্পে কোথাও এমন একটা চরিত্র নাই যাহা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে।" ইহাদের আদেশে, ঐরূপ চরিত্র উপন্যাস-মাত্রেই থাকা চাই; সেজন্য যদি প্রকৃতির সত্য লঙ্ঘন করিতে হয় তাহাও করিতে হইবে। আবার, শুধুই সদ্‌গুণগুলা বাছিয়া লইলেই চলিবে না, সেগুলিকে উজ্জ্বলতর করিয়া দেখাইতে হইবে। এমনও বলা হইয়া থাকে যে, আমরা যেন

সেই চরিত্রের গুণগুলাই লক্ষ্য করি, দোষগুলা বাদ দিই। মোটকথা এই যে, আমরা স্বভাবের সত্যকে লঙ্ঘন করিতে রাজী নই বলিয়াই আমাদের যত অপরাধ।

জগতে যেমন অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য বলিয়া কিছু নাই, তেমনই অবিমিশ্র সৎ-স্বভাব বলিয়াও কিছু নাই; অতিশয় সুস্থ দেহেও যেমন একটু না একটু ব্যাধি বাস করিবেই, তেমনই, অতি-উন্নত স্বভাবেও মনুষ্যসুলভ পশুভাব কিছু না কিছু থাকিবেই; সাধারণ মানুষের স্বভাবে তাহা আরও বেশি মাত্রায় আছে। এক শ্রেণীর উপন্যাসে যে সকল সতী-সাধ্বী দেবকন্যা এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ, বীর, ও আদর্শ-প্রেমিক যুবাদের গুণকীর্ত্তন থাকে তাহাদের কেহই এই মাটির পৃথিবীতে বাস করে না। তাহাদের চরিত্রে একটু বাস্তবতা আমদানি করিতে হইলে, যে দুই চারিটি লক্ষণ যোগ করিতে হয়—ঐ সকল লেখক তাহা চাপিয়া যাওয়াই সঙ্গত মনে করেন। আমরা প্রকৃতি-পন্থী লেখকেরা এই একটি নীতি স্থির করিয়াছি যে, আমরা একটি কথাও গোপন করিব না, কিছুই আমাদের পছন্দমত বাছিয়া লইব না, বা ভাবের রঙে রঙীন করিব না। এই জন্যই আমাদের ঐ অপবাদ রটিয়াছে যে, আমরা পাঁক লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে বড় ভালবাসি। আসল কথা, উপন্যাসে এই যে সুনীতি-দুর্নীতির তর্ক—ইহা দুইটা বিরোধী দলের মত-বিরোধ। যাহারা আদর্শবাদী তাহারা বলে, সুনীতিরক্ষার জন্য মিথ্যা কথায় দোষ নাই; যাহারা প্রকৃতিবাদী তাহারা ইহার জবাবে বলে, সত্যভ্রষ্ট হইলে সুনীতি-রক্ষাও হয় না, কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়ার মত অত্যহিত আর কিছু নাই। সংসারকে মিথ্যার রঙে রঞ্জিত করার ফলে, কত পাঠকের মস্তিষ্কবিকার ঘটিয়াছে—অতিশয় সঙ্কটপূর্ণ, মহা অনিষ্টকর কর্ম্মে তাঁহার প্রবৃত্তি উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। ঐরূপ কল্পনাবহুল উপন্যাসে আরও যাহা থাকে—শুচিতার নামে ভণ্ডামী, অতি কুৎসিতকেও মনোহারী করিবার জন্য তাহার উপরে ফুলরাশির আচ্ছাদন—সে সব আর নাই বলিলাম। আমরা ঘৃণ্যকে রমণীয় করিতে চাহিনা; আমরা মানুষকে জীবনের কটু ও কঠিন তত্ত্বই শিক্ষা দিতে চাই; বাস্তব-সত্যের যে উৎকৃষ্ট জ্ঞান—সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ যাহা—তাহাই প্রচার করিতে চাই। এমন কোন লেখক-গোষ্ঠীর কথা আমাদের জানা নাই যাহারা ইহার অধিক সত্যনিষ্ঠা বা নীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছে। আমরা বালক-বালিকা বা দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্য লেখনী ধারণ করি নাই, ইহাও মনে রাখিতে হইবে; আমাদের উদ্দিষ্ট যে সাধারণ পাঠকসমাজ, তাহাদের জীবন

সর্ব্ববিধ পাপ, কুপ্রবৃত্তি, মিথ্যা ও ছলনার দ্বারা কলুষিত; তাহাদের কেহই মুনি-ঋষি নয়। আমরা যেমন কোন দোষ দেখাইতে ছাড়িনা, তেমনই আক্রোশ করিয়া কোন চরিত্রকে ঘৃণ্য করিয়া তুলি না—যে যেমন তাহাকে তেমন করিয়াই অঙ্কিত করি। আমাদের অভিপ্রায়—যেখানে যত প্রকার ব্যাধি আছে সব খুলিয়া দেখাইব, তাহাতেই আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা আছে। আমাদের কর্ত্তব্য ঐখানেই শেষ, জাতির গুরু বা নেতৃস্থানীয় যাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্যও তাঁহারা করুন।

প্রেমের গূঢ়তত্ত্ব

[এই প্রবন্ধটি আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনের অন্যতম প্রবর্ত্তক ঋষি সোপেনহাউয়েরের (Schopenhauer) মূল রচনার ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে লিখিত হইল। ইংরাজীতে ইহার নাম—Metaphysics of Love। আমরা ইহার নাম দিতাম—"প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ"; প্রবন্ধটি পাঠ করিলে ঐ নামের সার্থকতা বুঝিতে পারা যাইবে। গীতায় ঐ যে বাক্যটি আছে লেখক যেন তাহারই একটি বিশদ ব্যাখ্যা বা বিস্তারিত ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শোপেনহাউয়েরের দার্শনিক চিন্তার মূল সূত্রগুলি যাঁহাদের জানা আছে তাঁহাদের পক্ষে প্রেম সম্বন্ধে উক্ত মনীষীর এই আলোচনা অতিশয় সহজবোধ্য হইবে; কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষেও এইরূপ আলোচনা কম চিত্তাকর্ষক হইবে না, বরং চিন্তা-হিসাবে বড়ই নূতন বলিয়া আরও মনোজ্ঞ হইবে। জীবনে আমরা প্রেমকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকি—এবং কাব্যে নাটকে তাহা যেরূপে চিত্রিত হইয়া থাকে—লেখক তাহাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াছেন; কেবল সেই প্রেমের অন্তরালে তাঁহার দার্শনিক দৃষ্টিতে তিনি যে শক্তি বা নিয়মের লীলা দেখিতে পান, তাহাই অতিশয় সুস্পষ্টরূপে এই প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এত বড় দার্শনিক হইয়াও শোপেনহাউয়েরের রচনার সাহিত্যিক উৎকর্ষ এমনই যে, অনেকের মতে, তিনি ও তৎপরবর্ত্তী দার্শনিক লেখক নিট্শে (Nitzsche) এই দুজনেই নাকি সর্ব্বপ্রথম জার্ম্মান ভাষায় ভূমধ্যসাগরকূলের সারস্বত-শ্রী (ফরাসী. ইতালীয় প্রভৃতি ভাষার) যোজনা করিয়াছেন।]

কবিরা প্রধানতঃ নর-নারীর প্রেম লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন; ইহাই সচরাচর দেখা যায়, নাটক মাত্রেই—তাহা ট্র্যাজেডি বা কমেডি, রোমান্টিক বা ক্লাসিক, ভারতীয় বা য়ুরোপীয়—যাহাই হউক না কেন—ঐ প্রেমই প্রধান ভাববস্তু। মহাকাব্য বা গীতিকাব্য, কিম্বা যতপ্রকার কাব্য ও রোমাঞ্চকর কাহিনী এত শতাব্দী ধরিয়া, প্রতি বৎসর পৃথিবীর ফলশস্যের মত য়ুরোপের সভ্য দেশগুলিতে উৎপন্ন হইয়াছে—তাহাদের অধিকাংশের খোরাক যোগাইয়াছে ঐ এক নর-নারী-ঘটিত প্রেম। সেগুলি আর কিছুই নয়—এই প্রবল হৃদয়াবেগের দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা—তাহারই নানা ভঙ্গি ও নানা ভাবের কাহিনী। আবার ঐ প্রেমেরই কাব্য-কথা যে সকল রচনায় সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে সেই সকল কাব্যই শাশ্বতী-সমা খ্যাতি লাভ করিয়াছে—যথা, 'রোমিও ও জুলিয়েট', 'লা নুভেল এলোইজ' ও 'বের্দার'।

রোশফুকো (Rochefoucauld) বলেন, প্রেম ভূত-প্রেতের মতই একটা কিছু, কারণ উহার কথা সকলেই বলে বটে, কিন্তু কেহই উহাকে দেখে নাই; লিখটেনবের্গ তাঁহার এক প্রবন্ধে প্রেমের সত্যতা ও স্বাভাবিকতা সম্বন্ধে সংশয়

প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি উহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু উভয়েই ভুল করিয়াছেন। কারণ, ইহা যদি মনুষ্য-প্রকৃতির বহির্ভূত বা তাহার বিরোধীই হইবে, এবং সেই কারণে উহা যদি একট আষাঢ়ে-কল্পনা মাত্রই হয়, তাহা হইলে, সর্ব্বযুগের কবিরা এমন একাগ্র আগ্রহে উহার চিত্র অঙ্কিত করিতেন না, সে চিত্রও মানুষ মনে-প্রাণে চিরদিন এমন সমান বিশ্বাসে বরণ করিয়া লইত না; একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, কারু-শিল্পে, কাব্যে-নাটকে—যাহা সুন্দর হইয়া উঠে, তাহা সত্য না হইয়া পারে না।

প্রতিদিনের ঘটনা হইলেও, এমন প্রায় দেখা যায় যে, মানুষের একটা ইচ্ছা প্রথমে অতি প্রবল কিন্তু বশীভূত থাকিলেও, কতকগুলি অবস্থার যোগাযোগে শেষে এমনই দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে যে, তাহার নিকট আর সকল বাসনাই তুচ্ছ হইয়া যায়। তখন সেই এক কামনা-পরিতৃপ্তির জন্য, সে আর কোনদিকে তাকাইবে না। আশ্চর্য্য শক্তি ও একাগ্রতার সহিত সকল বাধা বিঘ্ন সে জয় করে; সেই প্রেমকে সফল করিবার জন্য জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করে; যদি কোন আশা নাও থাকে, তবে প্রাণটাকেও সেই নিষ্ফলতার সঙ্গে বিসর্জ্জন দেয়। ইংরেজী ও ফরাসী সংবাদপত্রে পুলিশ-বিভাগের সংবাদ যাঁহারা পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমার এই কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন। আবার অনেকে ঐ প্রেমের তাড়নায় উন্মাদ হইয়া যায়। প্রতি বৎসর কোন না কোন এমন ধরণের ঘটনাও ঘটে যাহাতে, প্রেমিক-প্রেমিকা দুইজনেই আত্মহত্যা করে—কারণ, বাহিরের অবস্থা তাহাদের মিলনের পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে আমার একটু আশ্চর্য্য বোধ হয় এই ভাবিয়া যে, এইরূপ প্রেমিকযুগল—যাহারা পরস্পরের ভালবাসা সম্বন্ধে এতই নিঃসংশয় এবং সেই ভালবাসার অমৃতোপম সুখ ভোগ করিবার আশা রাখে—তাহারা এমন করিয়া আত্মহত্যা না করিয়া সেই অসীম সুখের জন্য দারুণতম দুঃখও সহ্য করা শ্রেয়স্কর মনে করে না কেন? ছোটখাটো ভালবাসার দৃষ্টান্ত আমরা ত' পথে ঘাটে নিত্যই দেখিতে পাই, এমন কি, যদি বয়স খুব বেশি না হইয়া থাকে, তবে আপনাদের হৃদয়ের মধ্যে তাহা অনুভব করিয়া থাকি।

এই যে কথাগুলি এ পর্য্যন্ত উত্থাপন করিয়াছি, ইহার পর প্রেমের বাস্তবতা বা গুরুত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয় করা চলিবে না। অতএব, কবিরাই যাহার সম্বন্ধে এতদিন এত কথা বলিয়াছেন, তাহার বিষয়ে, একজন দার্শনিক যে কিছু বলিতে চাহিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া বরং উল্টা কারণে বিস্ময় বোধ করা

উচিত ; তাহা এই যে, মানুষের জীবনে যে বস্তুটির প্রভুত্ব ও প্রাধান্য এত অধিক, যাহা অনেক ক্ষেত্রে মানুষের ভাগ্যবিধাতা হইয়া থাকে—সেই প্রেমের তত্ত্ব এ পর্য্যন্ত কোন দার্শনিক আলোচনার বিষয় হয় নাই !

দার্শনিকপ্রবর প্লেটো অবশ্য এই প্রেমের বিষয়ে সবচেয়ে বেশি বলিয়াছেন, বিশেষ করিয়া তাঁহার দুইখানি গ্রন্থে—Symposium ও Phaedrus ; কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা নিতান্তই গাল-গল্প, কিম্বদন্তী এবং বিদ্রূপাত্মক নিন্দার শ্রেণীতেই পড়ে—তাহাও গ্রীক যুবকদিগের সম্পর্কে। রুসো (Rousseau) তাঁহার গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন তাহা যেমন সত্য নয়, তেমনই যুক্তিপূর্ণও নহে। আচার্য্য কাণ্ট তাঁহার গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে প্রেমের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও স্থূল, তদ্দারা প্রমাণ হয় তিনি ঐ বিষয়টির ভিতরে প্রবেশ করেন নাই, এজন্য তাঁহার ঐ বিচার কতকটা অযথার্থ হইয়াছে। সর্ব্বশেষে প্লাট্‌নের (Platner) তাঁহার Anthropology-নামক গ্রন্থে ইহার যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা যেমন নীরস তেমনই পাণ্ডিত্যহীন।

পাঠকের কৌতুক উদ্রেকের জন্য আর এক দিকে স্পিনোজার সেই বচনটি স্মরণ করিতে বলি—'Amor est titillatio, concomitante idea causae externae'।* তিনি ইহাতে প্রেমের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার সরলতা প্রায় বালকোচিত।

আমার অভিপ্রায় অন্যরূপ—আমি পূর্ব্ববর্ত্তীগণের কথার প্রতিবাদও করিব না, তাহার দ্বারা আমার মতের সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিব না। বিষয়টি সম্পূর্ণ বাহির হইতেই আমার মনের উপরে ভর করিয়াছে এবং আপনা হইতেই আমার মূল দার্শনিক চিন্তাধারার একটা অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাও বলিয়া রাখি যে, আমার আলোচনা সেই সকল পাঠক ও পাঠিকার মনঃপূত হইবে না—যাঁহারা এইক্ষণে ঐ প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন এবং সেইহেতু অতি মহান ও দিব্যকল্পনাময় ভাষাতেই তাহা প্রকাশ করিতে চাহিবেন। তাঁহাদের নিকটে আমার এই তত্ত্বকথা অতিশয় স্থূল দেহসর্ব্বস্ব বলিয়াই মনে হইবে—যতই তাহা অতীন্দ্রিয় ও পার্থিবতাবর্জ্জিত হউক।

আমি প্রথমেই তাঁহাদিগকে একটি প্রশ্ন করিতে চাই ; ঐ যে মানব বা মানবীটিকে আপনারা এত গানে এত কবিতায় বন্দনা করিয়াও তৃপ্তি পাইতেছেন

* অর্থাৎ, 'প্রেম একটা কণ্ডূয়ন, বহির্গত কারণের অনুরূপ অন্তর-সংবেদনা'।

না—আচ্ছা, যদি তিনি আঠারো বৎসর পূর্ব্বে জন্মিতেন, তবে আপনারা কি এমনই করিয়া তাঁহার বন্দনায় বাউল হইয়া উঠিতেন?

প্রেম যেমনই হউক—আদৌ সেই এক যৌন-প্রবৃত্তির সহজাত সংস্কার হইতেই তাহা উদ্ভূত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রেম ঐ প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নহে; তফাৎ এই যে, সেই যৌন-প্রবৃত্তিই একটু নির্দ্দিষ্ট আকারের, একটু বিশিষ্ট রকমের—এবং সম্ভবতঃ, আরও ঠিক করিয়া বলিতে হইলে—ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের দ্বারা অতিমাত্রায় পরিচ্ছন্ন হইয়া প্রকাশ পায়। এই কথাটি মনে রাখিয়া, এক্ষণে মানুষের জীবনে প্রেমের গুরুতর ফলাফল ও বিচিত্র লুকোচুরির কথা ভাবিয়া দেখিলেই হইবে। শুধু কাব্যে নাটকে নয়, বাস্তব জীবনেও বিভিন্ন মাত্রায় ও বিভিন্ন দশায়, ইহার কারসাজির কি শেষ আছে? যখন ভাবি যে, মনুষ্যজাতির সমগ্র যুবা-অংশটির ভাবনা-কামনা, চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে এই প্রেমই অনুক্ষণ অধিকার করিয়া আছে, এবং ইহাই মানুষের সর্ব্ববিধ কর্ম্ম-প্রচেষ্টার শেষ বিশ্রাম-স্থল; জগতের বৃহত্তম ব্যাপার গুলিতেও ইহার অশুভ প্রভাব পড়ে; অতিবড় মনীষিগণের মস্তিষ্কও ইহার বশে সাময়িকভাবেও বিকারগ্রস্ত হয়; দার্শনিকের তত্ত্ব-চিন্তাপূর্ণ পাণ্ডুলিপির মধ্যেও যেমন, রাজমন্ত্রীর অতিশয় জরুরী সরকারী কাগজপত্রের মধ্যেও তেমনই, প্রেমপত্র বা প্রেমিকার কেশগুচ্ছ লুকাইয়া থাকে; অতিশয় কুটিল চক্রান্ত, ভীষণ অধর্ম্মাচরণ কেমন করিয়া সফল করিতে হয় তাহাও সে জানে, আবার সুনিবিড় ও সুদৃঢ় আত্মীয়তাবন্ধন ছিন্ন করিয়া দেওয়াও তাহারই নিত্য কর্ম্ম; মানুষ তাহারই কারণে, তাহার জীবন, স্বাস্থ্যসুখ, ধনসম্পদ, পদমর্য্যাদা এবং অন্তরের সুখ অনায়াসে বিসর্জ্জন করে; যে স্বভাবতঃ সাধুই ছিল, তাহাকে ঐ প্রেম পাপিষ্ঠ করিয়া তোলে; যে কখনও বিশ্বাস ভঙ্গ করে নাই, সেও উহার প্ররোচনায় ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা করে; উহা যেন একটা পৈশাচিক শক্তি, উহার একমাত্র কাজ—জগৎ-সংসারের সবকিছু লণ্ডভণ্ড করিয়া দেওয়া, যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই ধ্বংস করে; এই সব কথা ভাবিয়া দেখিলে, স্বতঃই একটা প্রশ্ন জাগে, "এই কোলাহল কেন? এই ভিড়, এই হানাহানি, এই হুঙ্কার ও হাহারব, এই দৈন্য-দুর্দ্দশা কিসের জন্য? একটা অতিসামান্য বস্তু মানুষের সুশৃঙ্খল জীবনে এমন সব বিপ্লব ঘটাইবে কেন?" এ জিজ্ঞাসা যদি গভীর ও আন্তরিক হয়, তবে জিজ্ঞাসুর মনে ইহার উত্তরও ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইবে। ব্যাপারটা আদৌ তুচ্ছ নয়—বরং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। প্রেমের

তাড়নায় যাহারা এমন সকল দুর্দ্ধর্ষ ও দুঃসাহসিক কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাদের সেই আচরণ ঐ প্রেমনামক প্রবৃত্তির গুরুত্বের তুলনায় কিছুমাত্র অতিরিক্ত নয়। কারণ, প্রেম-ঘটিত যতকিছু ব্যাপার—বিয়োগান্তই হোক, বা মিলনান্তই হোক—তাহার মূলে যে উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনসাধনের অভিপ্রায় আছে, তাহা মনুষ্য-জীবনের আর সকল উদ্দেশ্যের উপরে; অতএব উহার অনুসরণে মানুষ যে প্রাণান্ত আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহা কিছুমাত্র অকারণ বা অসঙ্গত নহে।

আসলে প্রেমের কাজ বড় সহজ নয়, সে কাজ—পরবর্ত্তী বংশধরগুলির জন্ম ও জাতি সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া। আমরা যখন এই রঙ্গমঞ্চটি ত্যাগ করিয়া যাইব, তখন এই বংশ-নাটকখানির পাত্র-পাত্রী কাহারা হইবে, এত বড় সমস্যার সমাধান করিয়া দেয়—ঐ অতিশয় লঘু ও তুচ্ছ একটা প্রেমের মাতামাতি! ঐ সাধারণ যৌন-সংস্কারই যেমন ভবিষ্যৎ বংশের সম্ভাবনার কারণ, তেমনই, সেই বংশের ব্যক্তিগুলির প্রকৃতি বা চরিত্র কেমন হইবে তাহা নির্ভর করে ঐ প্রেমের উপর; অর্থাৎ প্রাণের ব্যক্তিগত পিপাসা-নিবারণের জন্য কে কেমন সঙ্গী বা সঙ্গিনী বাছিয়া লয়, তাহার উপর। অতএব ঐ প্রেমই সেই ভবিষ্যৎ সন্ততির চরিত্র, নিয়তির মত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। ইহাই হইল সমস্যাটির একেবারে গোড়াকার কথা।

প্রেম যে এমন একটা সাংঘাতিক ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়, তার কারণ, যে ব্যক্তিটি প্রেমাক্রান্ত হয়, তাহার নিজের সুখদুঃখের সঙ্গে ঐ ঘটনাটির কোন সম্পর্কই নাই—আর সকল ব্যাপারেই সেই সম্পর্ক থাকে, কেবল ঐ একটা ব্যাপারে ব্যক্তির নিজস্ব কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। ভবিষ্যৎ কালের মানব মানবীর জন্ম ও তাহাদের জাতি-প্রকৃতির ব্যবস্থা করাই প্রেমের একমাত্র অভিপ্রায়; এই জন্যই ব্যক্তির ব্যক্তিগত কামনাকে অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর গোষ্ঠীর কামনা তাহাতে প্রবল হয়, ব্যক্তির কামনাই একটা বৃহত্তর আকার ধারণ করে। এইজন্যই প্রেমঘটিত সুখ দুঃখ এমন বিরাট, এমন মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠে—সে সুখও যেমন, সে দুঃখও তেমনই একটি অসীমতার ব্যঞ্জনা লাভ করে; এবং কবিগণ যুগযুগ ধরিয়া সেই অপূর্ব্ব রস-রাগের বিচিত্র রাগিণী গাহিয়া শেষ করিতে পারেন না। আর কোন রস মানুষের প্রাণকে এমন আবেশ-বিহ্বল করিতে পারে না; এই জন্যই যে নাটকে প্রেমের গ্রন্থি কোথাও নাই সেই নাটক নীরস হইতে বাধ্য; আবার কাব্যনাটকে প্রেমের এত ছড়াছড়ি সত্বেও ঐ জিনিষটা কিছুতেই পুরাতন হইয়া উঠিল না।

মানুষের সাধারণ কামনাকে যদি বাঁচিবার কামনা বলা যায় এবং সেই কামনাই যৌন-কাম-প্রবৃত্তির আকার ধারণ করে, তবে যে কামনা শুধু বাঁচিবার কামনাই নয়—যাহাতে ঐ যৌন-পিপাসাই একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ বিশিষ্ট ব্যক্তির রূপে আবির্ভূত হইবার প্রবল কামনায় পরিণত হয়—সেই কামনাই প্রেমের রূপ ধারণ করিয়া কোন একটিমাত্র ব্যক্তির দিকেই ধাবিত হয়। বহির্গত একটা পাত্র বা পাত্রীকেই কামনা করে বটে, যেন তাহারই রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়াছে, যেন নিজের মনে পূর্ব্ব হইতে কোন প্ররোচনা ছিল না—ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পর-ঘটিত, কিছুমাত্র আত্ম-ঘটিত নয়—এইরূপ একটা আত্ম-প্রবঞ্চনা প্রেমিকমাত্রেরই প্রেমের আব্রু রক্ষা করে, কিন্তু আসলে, প্রয়োজনটা সম্পূর্ণ আত্ম-ঘটিত—তাহার নিজের ভিতরেই একটা খুব বড় প্রয়োজনের তাগিদ রহিয়াছে। সেই তাগিদটা কিসের? একটা বিশেষ আকৃতি ও প্রকৃতিসম্পন্ন সন্তানের জন্মদাতা হইতে হইবে—নিজেরও অগোচরে এই প্রয়োজন বোধটি অন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকে। ইহার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, কেবল উভয়ে উভয়কে ভালবাসিয়াই তৃপ্ত হয় না, দেহটার উপরেও স্বত্বাধিকার চাই।

প্রণয়িনীকে সেইরূপ অধিকারে না পাইয়া অনেক প্রণয়ী আত্মহত্যা করিয়াছে। অপর পক্ষে, এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন প্রণয়ী তাহার প্রিয়তমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, কিন্তু সেই ভালবাসার প্রতিদান সে পায় নাই, তৎসত্ত্বেও তাহাকে পত্নীরূপে অধিকার করিতে পারিয়া সে কৃতার্থ হইয়াছে। জোর করিয়া বিবাহ, অথবা নানাপ্রকারে ভুলাইয়া নারীকে কুপথবর্ত্তিনী করার কারণ ঐ একই। প্রায় দেখা যায়, যেখানে মেয়েমানুষ পুরুষের ভালবাসা গ্রহণ করে নাই, সেখানে পুরুষ তাহার প্রণয়পাত্রীর বিরক্তি সত্ত্বেও নানাবিধ উপঢৌকন—বেশভূষা ও অলঙ্কারের দ্বারা, এবং তাহার জন্য বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়া, সেই রমণীর প্রসাদ লাভ করিতে ব্যগ্র হইয়া থাকে।

প্রেমের যতকিছু রোমাঞ্চকর নাট্যলীলা—তাহার মূলে আছে (অবশ্য প্রেমিক-প্রেমিকার অজ্ঞাতসারে) সেই এক উদ্দেশ্য—একটি অতিশয় বিশিষ্ট প্রকৃতির মানবসন্তানকে এই মাটির সংসারে ভূমিষ্ঠ করা। কেমন করিয়া, কি উপায়ে তাহা হইবে, সে সকল ব্যাপার অতিশয় গৌণ। যাঁহারা প্রেমের গোলাপী নেশায় বিভোর হইয়া আছেন, এবং প্রেম-সম্বন্ধে যাঁহাদের হৃদয়ে ও কণ্ঠে মহা মহা কবিত্বময় ভাবের উৎসার হইয়া থাকে তাঁহাদের নিকটে আমার এই কথা যতই অগ্রাহ্য ও

তুচ্ছ হউক—তাঁহারা নিজেরাই ভ্রান্ত। আরে বাপু, ভবিষ্যৎ বংশধরের ঠিক-সমস্যাটা—তোমাদের ঐ ভাবের ঘোরে মূর্চ্ছা যাওয়া, আকাশের গায়ে রঙের তুলি বুলানোর চেয়ে ঢের বেশি মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ। ভাবিয়া দেখ দেখি, জগতে ইহার চেয়ে বড় প্রয়োজন আর কি থাকিতে পারে? যদি উহার মূলে ঐ মহত্তম অভিপ্রায়টি না থাকিত, তবে প্রেম বলিতে যে গভীর দুর্দমনীয় কামনা বুঝায়—তাহাতে যে প্রাণান্তিক আকুলতা প্রকাশ পায়, এবং অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ বস্তুও অসাধারণ মহিমা লাভ করে—তাহার কি কোন সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যাইত? প্রেমের জন্য মানুষ যে এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে, এত বিপদ মাথায় পাতিয়া লয়—তাহার একমাত্র কারণ প্রেমের প্রকৃত প্রয়োজন অতি গভীর, অতিশয় মহৎ। দুইজনের মধ্যে যে অনুরাগ ক্রমেই গভীর হইয়া উঠে, তাহা আর কিছুই নয়—একটি নূতন জীবের জন্মকামনা; সেই জীবটির জনক ও জননী হইবার জন্য ভিতর হইতে যে অজ্ঞান-তাড়না, তাহার রূপান্তরিত সজ্ঞান আবেগের নাম প্রেম। ঐ যে দুইজোড়া চোখের আকুল দৃষ্টি-বিনিময়, উহাতেই একটি নূতন জীবের জীবন-স্ফুলিঙ্গ স্ফুরিত হইয়া উঠে—সেই জীব একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে প্রকাশ পাইবার চেষ্টা করে। প্রেমিক-প্রেমিকার বড় ইচ্ছা হয়, দুই দেহ এক হইয়া একই জীবন যাপন করে; সে কামনা ওই সন্তানের দ্বারাই পূর্ণ হয়—উভয়ের গুণ-দোষ সন্তানের মধ্যে আসিয়া মিলিত হয়, এবং স্থায়িত্ব লাভ করে। যদি অবস্থাটা ইহার বিপরীত হয়, অর্থাৎ ঐ নারী এবং পুরুষ কেহ কাহাকে দেখিতে না পারে, পরস্পরের মধ্যে একটা বদ্ধ বিদ্বেষ বা মনের অমিল থাকে তাহার অর্থ আর কিছুই নয়—সন্তানটির প্রকৃতি বেশ একটু বেয়াড়া রকমের হইবে, ভিতরে বিরুদ্ধ স্বভাবের ঠোকাঠুকি লাগিবে, বেচারী জীবনে বড় অসুখী হইবে।

এই যে প্রাণীটি একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে জন্মগ্রহণ করিবে উহার চরিত্র ও চিত্তের দৃঢ়তা পিতার অনুরূপ হইবে, এবং বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের যতকিছু দোষ-গুণ মায়ের মত হইবে। কেবল স্বাস্থ্যটা দুইজনেরই দান; কিন্তু দেহের গঠনটা পিতার মত এবং উচ্চতা মায়ের মত হওয়াই নিয়ম—পশুদের মধ্যেও ঐ নিয়ম লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত প্রকৃতি তাহারই মত—আর কেহ সেরূপ নয়; এই ব্যক্তিত্বের রহস্যও যেমন ভেদ করা দুরূহ, তেমনই দুইজন নর-নারীর পরস্পরের প্রতি যে প্রবল আকর্ষণ হয়, তাহারও কারণ কেহ নির্ণয় করিতে পারে না, তাহাও তেমনই ব্যক্তিগত, তেমনই অসাধারণ।

ঠিক যে মুহূর্ত্তে, একজন পুরুষ ও একজন নারী পরস্পরকে বড়ই মিষ্ট মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছে—ইংরেজরা তাহাদের ভাষায় যাহাকে বলে—to fancy each other,—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটি নূতন ব্যক্তি-জীবের জন্মলীলা সুরু হইয়াছে মনে করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যখনই দুইজোড়া পিপাসা-কাতর আঁখির মিলন হয়, তখনই সেই নূতন মানব-জীবটির বীজোদ্গম হইয়াছে বুঝিতে হইবে; অন্যান্য বীজরাশির মত সেই বীজও প্রায় বিনষ্ট হইয়া যায়। এই নূতন ব্যক্তি-সত্তাটি কতকটা প্লেটোর সেই এক একটা পৃথক ভাবময় সত্তার মতই (Platonic Idea); ইহাও সত্য যে, ভাবগুলো রূপের জগতে প্রবেশ করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রাণপণ ঠেলাঠেলি করিতেছে; এবং বিশ্ববিধানের মহানিয়মে যে বস্তুরাশি চতুর্দ্দিকে বিথারিয়া রহিয়াছে—ঐ ভাবগুলা কি আকুল আকাঙ্ক্ষায় তাহার একটা অংশ আশ্রয় করিয়া শরীরী হইতে চায়! সেইমত এই অতিশয় বিশিষ্ট ব্যক্তি-মানুষটি বলিতে যে ভাবময়-সত্তা (Idea) বুঝায়, তাহাও অরূপ হইতে রূপের জগতে আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য তেমনই ব্যগ্র ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই যে আকুল বাসনা বা উদগ্র আকাঙ্ক্ষা—ইহাই ভাবী জনক-জননীর চিত্তে ঐ প্রেমের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া এমন মাতামাতি করিতে থাকে।

এখন বুঝিয়া লও, প্রেম কি কারণে মাত্রাভেদে অল্প বা প্রবল হইয়া থাকে; ঐ আগন্তুক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ তাহার স্বকীয় প্রকৃতি যত অনন্যসদৃশ বা অসাধারণ হইবে—ততই ঐ প্রেম প্রবল আকার ধারণ করিবে; অর্থাৎ, প্রেমের পাত্র বা পাত্রীটি প্রেমিকের নিজস্ব ব্যক্তিগত বাসনা চরিতার্থ করিবার পক্ষে যতই উপযোগী হইবে, ততই সে তাহার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিবে। আর একটু চিন্তা করিলেই, একথার অর্থ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। অনুরাগ মাত্রেই এই কয়টি বস্তুর উপরে নিবদ্ধ হয়—স্বাস্থ্য, শক্তি ও সৌন্দর্য্য; অর্থাৎ যৌবন চাই। ইহার কারণ, সৃষ্টির মূলে যে কাম রহিয়াছে, যাহাকে ভব-বাসনা বা বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা বলা যায়, তাহা জীবের জাতিগত শ্রেষ্ঠ গুণগুলিকেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের আধার করিতে চায়। তৎসত্ত্বেও, প্রবলতম যে প্রেম-বিকার, তাহাতে দুই পক্ষের দুই ব্যক্তিত্ব, অর্থাৎ প্রত্যেকের যেগুলি বিপরীত গুণ—সেইগুলিই যেন ঠিক ঠিক মিলিয়া যায়, অর্থাৎ একে অপরের পূর্ণতা সাধন করে। মায়ের বুদ্ধি ও বাপের চরিত্র এইভাবে মিলিয়া সেই ভবিষ্যৎ মানুষটির ব্যক্তিত্ব স্থির-নিশ্চয় করিয়া তোলে। সৃষ্টির সেই সাধারণ ভব-কামনাই ব্যক্তির রূপে এমন চরিতার্থ হইবার

সুযোগ চায় বলিয়াই, ঐরূপ স্থলে প্রণয়ীর প্রণয়াবেগ অতিশয় প্রবল হইয়া থাকে; আসলে, ব্যাপারটা ত ব্যক্তির সুখদুঃখের ব্যাপার নয়, সেখানে একটা বৃহত্তর শক্তি, সৃষ্টির বৃহত্তর অভিপ্রায় দুর্ব্বার হইয়া উঠে বলিয়া, ঐ প্রেম এমন মহান্ ও অচিন্ত্যনীয় রূপ ধারণ করে—মানুষের ক্ষুদ্র হৃদয়-সীমা, কিম্বা জ্ঞান-বুদ্ধির যতকিছু বিবেচনা সহজেই পার হইয়া যায়। তাহা হইলে, প্রেম যেখানে সত্যই একটা সর্ব্বগ্রাসী কামনা হইয়া দাঁড়ায়, সেখানে তাহার কারণ আর কিছু নয়—ব্যক্তির কামনাকে একটা বৃহত্তর কামনা অভিভূত করিয়াছে। দুইটি নর-নারীর একজন অপরের প্রাণ-মন-দেহের প্রয়োজন যত বেশী করিয়া মিটাইবার উপযুক্ত হয়—একে অপরের 'রাজ-যোটক' হয়—ততই পরস্পরকে পাইবার কামনা প্রচণ্ড হইয়া উঠে। দুইটা মানুষ কখনও সর্ব্ববিষয়ে সমান হইতে পারে না, কাজেই একজনকেই চাই; এক নারীর পুরুষও একটি আছে, দুইটি নাই; এইরূপ না হইলে সেই ভবিষ্যৎ সন্তানটির ব্যক্তিরূপে জন্মলাভ নির্ব্বিঘ্ন ও সুসম্পন্ন হইতে পারে না। দুইজনের এমন 'যোটক' প্রায়ই মেলে না বলিয়াই, সত্যকার—অতিগভীর ও দুর্জ্জয়—প্রেমের দৃষ্টান্ত এমন বিরল। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলিয়া রাখি—ঐরূপ প্রেমের সংঘটন বাস্তব জগতে সর্ব্বদা সম্ভব না হইলেও, আমাদের হৃদয়ে ঐরূপ প্রেমের বাসনা সকলেরই আছে, এই জন্যই কবিরা নাটক-নভেলে যে সব প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহা আমাদের আদৌ অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

আবার দেখ, ঐরূপ সন্তান-জন্মের প্রয়োজন বা তাগিদ যেখানে নাই, সেখানে সত্যকার ঐ প্রেমের আবেগও বিদ্যমান না থাকাই স্বাভাবিক। সেইজন্য যৌন-আকর্ষণ ব্যতিরেকেও পুরুষ ও নারীর মধ্যে একরূপ বন্ধুতা জন্মিতে পারে; দুইজনেই সুরূপ এবং যুবা বয়সী—মানস-প্রকৃতি এবং ভাবুকতা বা চিন্তাশক্তিতে দুইয়ের মধ্যে বেশ একটা সমধর্ম্মিতা আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঐ যৌন-কামনার উদ্রেক হয় না; বরং সে বিষয়ে পরস্পরের প্রতি যেন একটা বিরাগই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাও আমার ঐ প্রেম-তত্ত্বের পরিপোষক। ঐ যে প্রেম-রসের সঞ্চার হয় না, তাহার কারণ, মনের একরূপ মিত্রতা থাকিলেও উভয়ের গূঢ়তর প্রকৃতিতে সেইরূপ গুণসমষ্টি নাই যেগুলির সমন্বয়ে আর একটা নূতন ব্যক্তির জন্মলাভ হইতে পারে।

আবার ইহার ঠিক উল্টা অবস্থাও হয়, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে মানসিক বা চারিত্রিক কোন প্রকার মিল নাই, এবং সেইজন্য প্রীতির অভাব, এমন কি বৈরভাবও অসম্ভব নয়—কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রেও প্রেম জন্মিতে পারে। এই প্রেম

সর্ব্ববিষয়ে অন্ধ ; তাহার ফলে যদি বিবাহ হয়, তবে তাহা অতিশয় অসুখকর হইবারই কথা।

এইবার এই তত্ত্বটিকে উত্তমরূপে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক। ব্যক্তি-মাত্রেরই স্বভাবে, 'অহংভাব'—অর্থাৎ, 'আমি ও আমার', এই রকমের আত্মপরতা এতই দৃঢ়মূল যে, মানুষকে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে হইলে তাহার ঐ 'আমি'কে চরিতার্থ করিবার মত একটা কোন প্রলোভন থাকা চাই।

যেহেতু, মানুষের ব্যক্তি-জীবনের লাভ-ক্ষতি অতিশয় ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক, এবং তাহার তুলনায় জাতি ও গোষ্ঠীর স্বার্থ অনেক বড, অতএব তাহারই দাবী আর সকলের উপরে। তথাপি, মানুষ যখন ব্যক্তিহিসাবে তাহার সেই জাতি বা বংশরক্ষার জন্যই, সজ্ঞানে কোন ক্ষতি স্বীকার করে, তখন সেই বৃহত্তর অভিপ্রায়ের মর্ম্ম তাহার বোধগম্য হয় না, কারণ, মানুষের সেই ব্যক্তিগত বোধশক্তি এমনই যে, তাহা সর্ব্বদা ব্যক্তিগত স্বার্থকেই বড করিয়া দেখে।

এই কারণে, প্রকৃতি-দেবী তাহার সেই ব্যক্তি চেতনায় এমন একটা মোহ বেশ পাকা করিয়া রাখিয়াছেন, যাহার বশে সে গোষ্ঠীর কল্যাণকে নিজেরই কল্যাণ মনে করিয়া প্রতারিত হয় ; সে যখন বস্তুতঃ প্রকৃতির সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতেছে, তখনও তাহার এমন অভিমান হয় যে, সে যেন নিজেরই সুখ-পিপাসায় ঐরূপ করিতেছে। এই যে মোহ, ইহাও একটা সহজাত সংস্কার।

সত্য বটে, ইতর প্রাণীর তুলনায় মানুষের তেমন সহজাত অন্ধ-বুদ্ধি প্রায় নাই বলিলেই হয়—ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সেই যে মাতৃস্তন খুঁজিয়া তাহাতে ওষ্ঠ সংলগ্ন করে, কেবল, সেইসময়ে ঐ একটা সহজাত বুদ্ধি প্রকাশ পায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আরও একটি অতি গূঢ়-গভীর এবং জটিলতাপূর্ণ অজ্ঞান-বুদ্ধি তাহার আছে—সে-বুদ্ধির খেলা দেখিতে পাওয়া যায় যখন সে তাহার যৌন-পিপাসা তৃপ্ত করিবার জন্য, অতিশয় সমনস্ক ভাবেই হোক, বা খামখেয়ালীর বশেই হোক—একটি সঙ্গিনী নির্ব্বাচন করে। কেবলমাত্র পিপাসাতৃপ্তির পক্ষে সেই অপর পাত্র বা পাত্রীর সুশ্রী বা কুশ্রী হওয়ায় কিছুমাত্র যায় আসে না ; অতএব ঐ নির্ব্বাচন কর্ম্মে সে যে এত যত্ন, এত নিষ্ঠা, এত একাগ্রতার পরিচয় দেয়, তাহার অর্থ কি ? আসলে উহাই একটি মোহ—মনে করে, সেই ভাবনা ও সেই কামনা তাহারই। কিন্তু তাহা নয়,—অপর একটি ব্যক্তির হিতার্থেই ঐরূপ সাধ্য-সাধনা। ঐ প্রেমের ফলে যে সন্তানটির জন্ম হইবে, তাহার আকৃতি ও প্রকৃতিতে—তাহার

একটি ব্যক্তিরূপের মধ্যেই—জাতি বা গোষ্ঠীর আদি-ছাঁচটি যতদূর সম্ভব নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্করূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। আমরা জানি, বহু দৈহিক ও চারিত্রিক কারণে, মানুষের আকৃতি-প্রকৃতির সেই আদি-আদর্শটি বংশানুক্রমে অল্পবিস্তর বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, নিরন্তর সেই আদি রূপটি ফিরিয়া পাইবার চেষ্টাও রহিয়াছে। আরও জানি যে, সেই আদি রূপ ফিরিয়া পাইবার প্রধান উপায়—সৌন্দর্য্য-প্রীতি; যৌন প্রবৃত্তিও এই সৌন্দর্য্য-প্রীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, তাহা না হইলে, ঐ প্রবৃত্তি একটা অতি কুৎসিত ও আবশ্যিক ক্ষুধানিবৃত্তিতেই চরিতার্থ হইত। ঐ কারণে, প্রত্যেকে ঐ অবস্থায়, প্রথমতঃ সুন্দরীতমাকেই একান্তভাবে কামনা করিবে। এখানে সৌন্দর্য্য অর্থে আর কিছুই নয়,—যাহার আকারে-গঠনে, জাতি বা গোষ্ঠীর সেই আদর্শ-আকৃতির লক্ষণগুলি বিদ্যমান। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেকে অপরের সেই গুণগুলির প্রতি বিশেষ পক্ষপাতী হইবে—যাহা নিজের নাই; আবার, তাহার নিজের যে দোষগুলি আছে অপরের মধ্যে তাহার বিপরীতগুলিকে বড়ই সুচক্ষে দেখিবে। এইজন্য বেঁটে পুরুষ লম্বা স্ত্রীলোক পছন্দ করে; অতিশয় ফর্সা যাহারা তাহারাই শ্যামবর্ণ পছন্দ করে, পছন্দগুলা এই ধরণের। যখন কোন পুরুষ কোন অনিন্দ্যসুন্দরী কামিনীকে দেখিয়া প্রবল রূপমোহে অভিভূত হয় এবং মনে করে যে, তাহার সহিত মিলন হইলে সে অসীম সুখসাগরে সন্তরণ করিবে, তখন বুঝিতে হইবে, তাহার ভিতরে সেই জাতি বা গোষ্ঠী-চেতনা অতিশয় প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। জাতির আদর্শ-দেহরূপটি বজায় রাখিবার একমাত্র উপায়—ঐরূপ সৌন্দর্য্যপ্রীতি; এইজন্যই প্রেমের ব্যাপারে সৌন্দর্য্যের প্রতাপ এত অধিক।

আমরা পরে, এ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা করিব। পুরুষমাত্রেই যে সুন্দরী স্ত্রী কামনা করে, সে তাহার ব্যক্তিগত প্রয়োজন-বুদ্ধির বশে নয়—একটা গূঢ়তর জৈব-সংস্কারের বশেই সে ঐরূপ করিয়া থাকে, জাতি ও গোষ্ঠীর হিতসাধনই তাহার প্রকৃত অভিপ্রায়; অথচ পুরুষ মনে করে, সে নিজেরই সুখের জন্য সুন্দরী নারী কামনা করে। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যাপারেও, আমরা প্রাণিগণের সর্ব্ববিধ সহজাত সংস্কার বা অজ্ঞানবুদ্ধির গূঢ় তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি। সর্ব্বত্রই ওই এক অভিপ্রায়,—ব্যক্তিকে দিয়া জাতির কাজ করাইয়া লওয়া। যেখানেই ব্যক্তি-জীব জাতির ইষ্ট-সম্বন্ধে অজ্ঞান, অথবা জানিলেও তৎসাধনে অনিচ্ছুক,—প্রকৃতিদেবী সেইখানেই এইরূপ একটি সহজাত, অর্থাৎ, জ্ঞান বুদ্ধিকে

ফাঁকি-দেওয়া—প্রবৃত্তি রোপণ করিয়া দেন; এখানেও তাহাই,—বাহিরে মানুষের সজ্ঞান উদ্দেশ্যকে প্রশ্রয় দিয়া ভিতরে নিজের মতলব হাসিল করেন।

মানুষের জ্ঞান-ক্রিয়া অতিশয় প্রবল বলিয়া, ইতর প্রাণীদের তুলনায় তাহার মধ্যে ঐরূপ সহজ সংস্কার সংখ্যায় এত অল্প। যাহাও আছে, তাহা সব সময়ে অভ্রান্ত থাকিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, সৌন্দর্য্যপ্রীতি তাহার একটি স্বাভাবিক সংস্কার বটে, সঙ্গিনী-নির্ব্বাচনে সে তদ্দ্বারা অবশে চালিত হয়; তথাপি ঐ সহজাত সংস্কারও তাহাকে ভুল করায়—সে নারীর পরিবর্ত্তে পুরুষের প্রতিও আকৃষ্ট হইয়া থাকে। যৌন-প্রবৃত্তিঘটিত এই যে প্রেম, ইহার মূলে, ঐরূপ একটা সর্ব্বব্যাপী জন্মগত সংস্কারই বিদ্যমান। ইহা প্রমাণ করিতে হইলে, বিষয়টি আর একটু সবিস্তারে আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ, প্রেমে পড়িয়া পুরুষ যেমন চপল-চিত্ত হয়, নারী তেমন হয় না, নারীর একনিষ্ঠা আছে। একটা নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলেই পুরুষের প্রেমে ভাঁটা পড়ে, তখন যে-কোন অপর একজন মেয়েমানুষকে পূর্ব্বের সেই প্রেমাধিনী মেয়েটির অপেক্ষা তাহার সুন্দরী বলিয়া মনে হয়। সে সর্ব্বদাই নূতনত্ব চায়,—নিত্যনূতনের অভিলাষী। অপর পক্ষে, স্ত্রীলোকের প্রেম প্রতিদান পাওয়ার মুহূর্ত্ত হইতেই ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহার কারণ, প্রকৃতিদেবী বংশরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই চান না। এজন্য একদিকে সেই বংশ যত বৃদ্ধি পায় ততই ভালো; পুরুষ যে কেবলই একটিকে ছাড়িয়া অপর একটিকে কামনা করে তাহার দ্বারা প্রজাবৃদ্ধি হয়; এবং স্ত্রীলোক যে একটা পুরুষকেই ধরিয়া থাকে, তাহার মূলে আছে একটা নির্জ্ঞান সংস্কারের তাড়না—ভবিষ্যৎ সন্তানের পালক ও রক্ষক যে পুরুষ সেই পুরুষের পরিচর্য্যা তাহাকে করিতেই হয়। এই কারণে, দাম্পত্য-নিষ্ঠা পুরুষের পক্ষে একটা কৃত্রিম সদ্‌গুণ, অর্থাৎ, অভ্যাসের বস্তু; নারীর তাহা প্রকৃতিসুলভ। এইজন্যই নারীর অসতীত্ব—পুরুষের তুলনায়,—এমন দোষাবহ এবং অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে; কারণ, বাহিরের দিক দিয়া তাহার ফলাফল যেমন মন্দ, ভিতরের দিক দিয়াও তাহা অতিশয় অস্বাভাবিক।

পুরুষের প্রতি নারীর, এবং নারীর প্রতি পুরুষের এই যে মধুময় আকর্ষণ ইহা যতই একটা ব্যক্তিগত অভিলাষ, বা বহির্গত কারণে ঘটে বলিয়া মনে হউক না কেন আসলে উহা যে একটা সার্ব্বজনীন ও সহজাত সংস্কারের ছদ্মবেশ মাত্র;

অর্থাৎ, ব্যক্তির কোন নিজস্ব ইষ্ট উহাতে নাই,—বংশ বা জাতির ইষ্টসিদ্ধিই উহার একমাত্র অভিপ্রায় ইহা উত্তমরূপে বুঝাইতে হইলে, যে বিশেষ বিশেষ কারণে ঐ প্রেমের পুষ্টিসাধন হয় তাহা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। এইবার সেইগুলি সংগ্রহ করা যাক।

ঐ নির্ব্বাচন-ব্যাপারে প্রেমিক-প্রেমিকার বয়সটাই সর্ব্বাগ্রে ধর্ত্তব্য—তাহার পরেই স্বাস্থ্য। খুব কঠিন কোন ব্যারাম হইলে সাময়িক একটা ভয় হয় মাত্র; কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী রোগ—যাহাকে যাপ্য ব্যাধি বলে, তাহার সম্মুখে প্রেম পলাইতে বাধ্য হয়, কারণ ঐরূপ ব্যাধি সন্তানেও সংক্রামিত হওয়া সম্ভব।

পছন্দের তৃতীয় হেতু—দেহের কাঠামো, অর্থাৎ অস্থি-পঞ্জরটা; কারণ উহাই জাতির বিশিষ্ট দেহাকৃতিটা ধারণ করিয়া আছে। ব্যাধি ও বার্দ্ধক্যের পরেই যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর, তাহা ঐ আকৃতির বিকৃতি; এমন কি, যদি মুখ খুব সুন্দরও হয়, তথাপি ঐ দোষ তাহার দ্বারা পূরণ হয় না; বরং কুৎসিৎ মুখের সহিত যদি দেহটা পূর্ণাঙ্গ ও সুগঠিত হয়, তবে তাহাও তদপেক্ষা বহুগুণে বরণীয়। শুধুই গঠনের নয়, ঐ অস্থি-সংস্থানের ত্রুটিমাত্রেই আমাদের চক্ষে বড় লাগে—যেমন, দেহের অতিরিক্ত খর্ব্বতা, দেহের অনুপাতে পদদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের অল্পতা, ইত্যাদি; কিম্বা, চলনে যদি এমন কোন দোষ থাকে যাহার কারণ কোন দুর্ঘটনা নয়—জন্ম হইতেই ঐরূপ। অপর পক্ষে, যদি ঐ আকারটা, ঐ সাধারণ গঠনটা খুব সুশ্রী ও লক্ষণীয় হয়, তবে তাহাতেই সকল দোষ কাটিয়া যায়—তেমন চেহারা দেখিলে মন খুশী হইয়া উঠে। আরও আছে। পদপল্লবের ক্ষুদ্রতাও কম প্রার্থনীয় নয়; ইহার কারণ, পদপল্লবের ঐ আয়তনটা মনুষ্যজাতিরই একটি বিশিষ্ট লক্ষণ—যেহেতু আর কোন জন্তুর অস্থিসংস্থানে tarsus ও metatarsus-নামক অস্থিদ্বয় এমন ক্ষুদ্রাকারে যুক্ত হইতে পারে নাই; এইজন্যই মানুষ খাড়া হইয়া চলিতে পারে—জীবগণের মধ্যে তাহাকেই Plantigrade বলা হইয়া থাকে। যীশু সিরাক নামক বিখ্যাত লেখক তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন (ক্রাউস-এর বিশুদ্ধতর অনুবাদের ভাষায়), "যে স্ত্রীলোকের দেহাবয়ব সুপরিণত, এবং যাহার পদপল্লব সুমনোহর—সে যেন রৌপ্য-পীঠিকার উপরে দণ্ডায়মান সুবর্ণস্তম্ভের মত।" দন্তপংক্তিরও মূল্য কম নয়, কারণ, দেহের পুষ্টির জন্য যে খাদ্য গ্রহণ—তাহা ঐ দন্তের দৃঢ়তা ও বিন্যাস-রীতির উপরে নির্ভর করে, এবং দন্তের দোষ-গুণ অতি-মাত্রায় বংশগত।

পছন্দের চতুর্থ কারণ—একপ্রকার হৃষ্টপুষ্টতা, ইহাও আর কিছু নয়, যাহাকে 'Vegetative function' বলে তাহারই প্রাচুর্য্য—সর্ব্বাঙ্গীণ সুনমনীয়তা। এইজন্যই দেহের অতিরিক্ত কৃশতা এমন দৃষ্টিকটু হইয়া থাকে।

পছন্দের সর্ব্বশেষ হেতু বলিয়া ধরিতে হইবে—সুন্দর মুখমণ্ডল। এখানেও আর সকলের আগে মুখের অস্থিপ্রধান অংশগুলিই বিচারের বিষয় হইয়া থাকে; যথা—নাসিকাটি সুন্দর হইলে আর সব সুন্দর হইয়া উঠে; আর যদি ঐ অঙ্গটি খাঁদা বা ক্ষুদ্র হয়, তবে অন্যান্যগুলির শোভা মাটি হইয়া যায়। বহু কুমারী যুবতীর জীবনে তাহার সুখ-সৌভাগ্যের নিয়ামক হইয়াছে—নাসিকার ঈষৎ উচ্চ বা ঈষৎ নিম্নমুখী বঙ্কিমতা, এবং তাহাই হওয়া উচিত; কারণ, নাসিকার দোষে জাতির সেই আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বিপন্ন হইয়া পড়ে।

মুখবিবরটিও ক্ষুদ্র হওয়া চাই, কারণ মানুষের মুখ পশুদের মত বিকট হইতে পারে না; এজন্য মানুষের মুখ-কান্তির উহাও একটি অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ। থুঁতিটা যদি কাটিয়া বাদ-দেওয়ার মত, অর্থাৎ যেন পিছন দিকে হটিয়া যাওয়ার মত হয়, তাহাও চিত্তকে বিমুখ করিয়া দেয়। তার কারণ, ঐ থুঁতিটা মানুষের মনঃশক্তির পরিচায়ক—ঐ মনঃশক্তিই মানুষকে পশু হইতে পৃথক করিয়াছে।

অতঃপর, সুন্দর চক্ষু ও সুন্দর ললাটের কথাও বিবেচনা করিতে হইবে। ঐ সৌন্দর্য্য মানুষের চিত্তের—বিশেষ করিয়া তাহার বুদ্ধির বিকাশ বা গভীরতা নির্দ্দেশ করে; ও দুইটাই সাধারণতঃ সে জননী হইতেই প্রাপ্ত হয়। এইরূপ মনোনয়নে নারীগণ আরও যে সকল অজানিত বা অস্পষ্ট অনুভূত কারণে প্রভাবিত হয়, সেগুলি এমন নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত করা যায় না। সে বিষয়ে আমরা সাধারণভাবে এই কয়টি কথা, বলিতে পারি।

যে-বয়সে পুরুষ তাহাদের মনোহরণ করে তাহা ত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশ। নিতান্ত ছোকরা-বয়স তাহারা পছন্দ করে না, তৎপরিবর্ত্তে ঐ বয়সের পুরুষই অধিকতর আকৃষ্ট করে—এমনই দেখা যায়। ইহার কারণ, ঐ বয়সেই পুরুষের দেহসৌষ্ঠব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অতএব, এখানে রুচি বা সজ্ঞান ইচ্ছাটাই বড় নয়, একটা অজ্ঞান-বুদ্ধিই তাহাদিগকে চালিত করে। সেই বুদ্ধিই বলিয়া দেয় যে, ঐ বয়সেই পুরুষের সন্তান উৎপাদন-শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সাধারণতঃ মেয়েরা পুরুষের সৌন্দর্য্যের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখে না—অর্থাৎ, ঐ মুখের সৌন্দর্য্য; সন্তানকে সৌন্দর্য্যদান করিবার দায়িত্ব তাহারা যেন একাই গ্রহণ করে।

প্রধানতঃ পুরুষের দুইটা গুণ তাহাদিগকে মুগ্ধ করে,—তাহার দৈহিক বল, এবং তদানুষঙ্গী মনের সাহস। ঐ দুইটারই প্রয়োজন আছে, একটি—সুস্থ ও সবল সন্তানলাভের জন্য; অপরটি—সেই সন্তানের উপযুক্ত রক্ষক হইবার জন্য। সন্তানের আকৃতিগত যতকিছু ত্রুটি, বা সে বিষয়ে মনুষ্যজাতির আদর্শ হইতে যে সকল বিচ্যুতি—তাহা নারীই দূর করিতে পারে, যদি সেই সেই সম্পর্কে সে নিজে নির্দোষ হয়, অথবা সেই দোষগুলার যাহা বিপরীত সেই গুণে গুণান্বিতা হয়। কেবল যে গুণগুলা পুরুষের নিজস্ব, এবং সেইহেতু জননীর নিকটে প্রাপ্য নয়, সেই গুণগুলার সম্বন্ধে নারী নিরুপায়। এইগুলির কয়েকটির নাম করা যাইতে পারে, যথা—দেহের কঙ্কালখানার পুরুষসুলভ গঠন; স্কন্ধের প্রশস্ততা; কটির নিম্নভাগের সংকীর্ণতা; পদদ্বয়ের ঋজুতা ও উচ্চতা; পেশীর দৃঢ়তা, সাহস, শ্মশ্রু, ইত্যাদি। এইজন্য মেয়েরা সচরাচর কুৎসিত পুরুষের অনুরাগিণী হয়, কেবল পুরুষোচিত গুণ থাকিলেই হইল; পুরুষত্বহীন পুরুষকে তাহারা কখনও পছন্দ করে না—তার কারণ, সেই ত্রুটি নিজেরা পূরণ করিয়া দিতে পারে না।

দ্বিতীয় যে একশ্রেণীর গুণ প্রেমের উদ্দীপক হইয়া থাকে—সেগুলি অন্তঃকরণ-সম্বন্ধীয়। এক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই, মেয়েরা, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে, পুরুষের হৃদয় ও চরিত্রগুণে আকৃষ্ট হয়—এই দুই গুণ সন্তান তাহার পিতা হইতেই প্রাপ্ত হয়। নারীচিত্ত জয় করিবার পক্ষে পুরুষের থাকা চাই—চিত্তের দৃঢ়তা, সংকল্পনিষ্ঠা, সাহস, এবং হয়তো তাহার সহিত সততা ও মনের উদারতা; অথচ, বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ মেধা প্রভৃতি মস্তিষ্কের গুণ নারীর উপরে সহজ বা প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে না; অর্থাৎ পুরুষের বিদ্যা, মনীষা প্রভৃতি গুণ নারীকে আকৃষ্ট করে না। ইহার কারণ ত' পড়িয়াই রহিয়াছে—ঐ মস্তিষ্কের যাহা কিছু গুণ, মানুষ তাহার জনক নয়—জননী হইতেই লাভ করে। পুরুষের মেধাশক্তির অভাবে নারীর কিছুই যায় আসে না; বরং অত্যধিক মেধাশক্তি এমন কি প্রতিভা—একটা ব্যাধি বা অস্বাভাবিক কিছু বলিয়া—ঠিক বিপরীত ভাবের উদ্রেক করে। এই কারণে আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে, স্ত্রীলোকে সুশিক্ষিত, ধীশক্তিসম্পন্ন ও মধুরপ্রকৃতি পুরুষকেও ত্যাগ করিয়া, অতিশয় বুদ্ধিহীন, কুৎসিত ও ভদ্রতাশূন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়। অতএব, সম্পূর্ণ বিরুদ্ধস্বভাবের নর-নারীও প্রেমের বশে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হয়; অর্থাৎ, পতি হইবে অতিশয় নিকৃষ্টচিত্ত, সঙ্কীর্ণবুদ্ধি এবং বলবান; আর পত্নী হইবে অনুভূতিকাতর, মার্জ্জিতরুচি, ভাবগ্রাহী, সৌন্দর্য্যপ্রিয়—এই সকল

গুণের অধিকারিণী। অথবা, পতি হইবে—বুদ্ধিমান ও সুরসিক, আর পত্নী হইবে —একটি অতিশয় বুদ্ধিহীনা, অভব্য স্ত্রীলোক।

ইহার কারণ, মেয়েমানুষ বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া মুগ্ধ হয় না, তাহার মুগ্ধ হওয়ার মূলে আছে—স্বাভাবিক বা সহজাত-সংস্কার (instinct)। বিবাহটা দুইজনে মিলিয়া বড় বড় ভাব-চিন্তা চর্চ্চা করিবার জন্য নয়; সন্তানের জন্যই বিবাহ—উহাই ঐরূপ মিলনের একমাত্র অভিপ্রায়; আসলে উহা হৃদয়ের মিলন, মস্তিষ্কের মিলন নয়। কোন স্ত্রীলোক যদি বলে যে, সে কোন পুরুষের মানসিক উৎকর্ষ দেখিয়া প্রেমে পড়িয়াছে, তবে বুঝিতে হইবে, সেটা তাহার একটা অতিশয় হাস্যকর আত্মম্ভরিতা, বা নিজের মহত্ত্ব-প্রচারের চেষ্টামাত্র; অথবা, তাহার নারী-প্রকৃতির বিকৃতি হইয়াছে বলিয়াই সে ঐরূপ অত্যুক্তি করিয়া থাকে। পুরুষের আচরণ অন্যরূপ; যদি কোন পুরুষ কোন নারীর প্রতি সহজাত সংস্কারের বশেই আসক্ত হয়, তবে সে তাহার মনোবল বা চরিত্র-বলের দ্বারাই আকৃষ্ট হইবে না। এইজন্য কত সক্রেটিসের কত জান্তিপ্পে জুটিয়াছে; শেকস্‌পীয়ার, আলব্রেখট্ ডুরের (Albrecht Durer), বায়রণ প্রভৃতির সৌভাগ্যও স্মরণীয়। এ সকল ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের বুদ্ধিমত্তার আকর্ষণটাই অধিক বলিয়া মনে হয়, ইহার কারণ, ঐ গুণ জননী হইতেই সন্তানে বর্ত্তিবে। তৎসত্ত্বেও, ঐরূপ বুদ্ধিমত্তা নারীর সৌন্দর্য্যের কাছে কিছুই নয়, কারণ, ঐ সৌন্দর্য্যের প্রয়োজন আরও মূলগত, তাই উহার প্রভাব আরও প্রত্যক্ষভাবে ঘটিয়া থাকে। প্রসঙ্গক্রমে, এইখানে একটা বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পুরুষের উপরে ঐরূপ মানসিক গুণাবলীর (শিল্প-সাহিত্য-সংক্রান্ত) প্রভাব সম্বন্ধে যাহাদের অভিজ্ঞতা আছে—সেই জননীরা তাহাদের কন্যাদিগকে ভাষা, সাহিত্য ও কলাবিদ্যায় পারদর্শিনী করিতে চায়,—উহার দ্বারা পুরুষের চিত্ত জয় করিতে পারিবে। এমনই করিয়া কৃত্রিম উপায়ে তাহারা কন্যার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কটির আয়তন বাহিরের দৃষ্টিতে বড় করিয়া তোলে,—ঠিক যেমন, আবশ্যক হইলে তুলা ও বস্ত্রখণ্ডের সাহায্যে তাহার শীর্ণ বক্ষ ও কৃশ কটিতটের স্থূলত্ব সম্পাদন করে! মনে রাখিতে হইবে, আমরা কেবল সেইরূপ আকর্ষণের কথাই বলিতেছি, যাহা সম্পূর্ণ অপরোক্ষভাবে, স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিয়া থাকে—এবং যাহা হইতে প্রকৃত প্রেমের উৎপত্তি হয়। কোন বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা মহিলা যে পুরুষের বিদ্যাবুদ্ধি ও মস্তিষ্কশক্তির পক্ষপাতী হইবে; কিম্বা, এমন পুরুষও আছে —যে তাহার ভাবী-পত্নীর চরিত্র, চিত্তের দৃঢ়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি উত্তমরূপে

বিচার করে এবং প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে,—সে সব দৃষ্টান্ত আমার বর্ত্তমান আলোচনার বহির্ভূত। তেমন হিসাব কেবল সেইরূপ বিবাহই হইয়া থাকে, যেখানে বর-কন্যার নির্ব্বাচন বিচার-বুদ্ধির দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। আমরা প্রেম-নামক যে প্রবল পিপাসার আলোচনা করিতেছি, সেরূপ প্রেমে এরূপ বিচার-বুদ্ধির স্থান নাই।

এতদূর পর্য্যন্ত, আমি প্রেমোৎপত্তির যে হেতুগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছি সেগুলি একেবারে মূল-গত, অর্থাৎ, সাধারণভাবে সকল প্রেমিক-প্রেমিকার সম্বন্ধে খাটে। এইবার আমি আর কতকগুলির উল্লেখ করিব, যাহা স্থান-কাল-পাত্রের অপেক্ষা রাখে; অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র প্রয়োজনের কথা। আমি পূর্ব্বে জাতিগত আকৃতি-প্রকৃতির যে একটা বিশুদ্ধ আদর্শ-রক্ষার কথা বলিয়াছি, সেই আদর্শ-রক্ষার জন্য এক-এক ব্যক্তির মধ্যে এক এক প্রকার দোষ বা অসম্পূর্ণতার সংশোধন আবশ্যক; প্রত্যেক পুরুষ সেই গুণটির পক্ষপাতী হয়, যে-গুণ তাহার নিজের নাই। ফলে, যাহাকে প্রবল প্রেম-পিপাসা বলে, তাহা ব্যক্তি-বিশেষের ঐরূপ একটা বিশেষ কামনা হইতেই জাগে; এই প্রেম যেমন উগ্র, তেমনই অসামান্য হয়। পূর্ব্বে যে সাধারণ হেতুগুলির উল্লেখ করিয়াছি, তাহার প্রেমও সাধারণ। অতএব বাঁধা-আদর্শের সুন্দরী যাহারা তাহারা ঐরূপ অতি-দুর্দ্দম এবং অদ্ভুত প্রেম জাগাইতে পারিবেনা। সত্যকার গভীর প্রেম সম্ভব হয় তখনই, যখন যুগলের একজন অপরের প্রকৃতির নিখুঁত পরিপূরক হয়—যতকিছু দোষ অপরের বিপরীত গুণের দ্বারা সমতা-প্রাপ্ত (neutralised) হয়। উহা সম্ভব হইতে হইলে নিম্নলিখিত অবস্থাগুলির যোগাযোগ চাই।

প্রথমেই বুঝিতে হইবে, পুরুষের পুরুষত্ব এবং নারীর নারীত্ব, অর্থাৎ ঐ দুই যৌন-প্রকৃতি—অতিশয় বিপরীত। আবার ঐ নারীত্ব ও পুরুষত্বেরও মাত্রাভেদ আছে। কোন কোন ব্যক্তির প্রকৃতিতে উহা বিশেষ প্রবলতা লাভ করে। এই মাত্রাভেদের কারণে, প্রত্যেক পুরুষের যে একটা বিশিষ্ট যৌন-প্রকৃতি আছে তাহার পরিপূরক হিসাবে এবং তাহার সমতা-সাধনের জন্য, যে-কোন নারীই তাহার উপযুক্ত হইতে পারে না; একটি ঠিক সেই প্রকৃতির নারীকে তাহার প্রয়োজন—যাহার নিজের সেই নারীত্বের মাত্রা বিপরীত দিকে ঐ পুরুষটার সমান। এই উপায়ে, ভবিষ্যৎ সন্তানে যে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইবে তাহার মানব-প্রকৃতি পূর্ণতা লাভ করিবে।

।-সাধনের কথা বলিয়াছি উহার জন্য এইগুলির প্রয়োজন। নারী-বিশেষের নারীত্বের এবং পুরুষবিশেষের পুরুষত্বের মাত্রায় এমন মিল হওয়া চাই যাহাতে উভয়ের সেই স্বতন্ত্র যৌন-প্রকৃতি পরস্পরের মধ্যে সাম্য রক্ষা করে। এইজন্য যে-পুরুষ অতিমাত্রায় পুরুষ, সে এমন নারীকে কামনা করিবে যে অতিমাত্রায় নারী; উল্টাদিকেও তাই। অতএব, প্রত্যেকেই এমন ব্যক্তিকে কামনা করিবে যাহার সহিত তাহার যৌন-প্রকৃতির ঐরূপ মিল আছে। যখনই দুইজনের প্রকৃতি এই অত্যাবশ্যক বিষয়টিতে মিলিয়া যায়, তখনই —স্বভাবের বশেই—পরস্পরকে চিনিতে পারে; তারপর অপর যে ব্যক্তিগত পছন্দের কারণগুলি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার যোগে ঐ আকর্ষণ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে, এবং তাহা হইতেই যত বড়-বড় প্রেমের উদ্ভব হয়। অতএব, যখনই কোন প্রেমিক-যুগল ভাবাবেশে গদগদ-স্বরে পরস্পরের নিকটে, তাহাদের আত্মায়-আত্মায় কিরূপ মিল হইয়াছে, তাহাই বলাবলি করে, তখন সেই আলাপের মূল কারণটা আর কিছু নয়—যে-সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারই ব্যক্তিত্বকে সুসম্পূর্ণ করিবার জন্য উভয়ের দৈহিক গুণগুলির সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে; আত্মার মিল অপেক্ষা ঐরূপ মিলের প্রয়োজন অনেক বেশী। আত্মায়-আত্মায় মিল যে কত সত্য তাহা বিবাহের অল্পকাল পরেই প্রকাশ হইয়া পড়ে।

এইবার আমরা আর কতকগুলি প্রয়োজনের আলোচনা করিব। সেগুলি এই কারণে ঘটে। প্রত্যেক ব্যক্তিটি অপরের মধ্য দিয়া নিজের আকৃতি ও প্রকৃতির যতকিছু বিকৃতি বা অপূর্ণতা-দোষ খণ্ডন করিয়া লইতে চায়, যাহাতে ঐগুলা ভবিষ্যৎ সন্তানেও না রহিয়া যায়, বা অতিমাত্রায় বাড়িয়া না উঠে। যে-পুরুষের দেহ যত দুর্ব্বল সে তত বলিষ্ঠ নারী পছন্দ করিবে; নারীদের পক্ষেও ঐ এক কথা।

তৎসত্ত্বেও, আর সকলের চোখে ভাল দেখাইবে বলিয়া, কোন দীর্ঘাকার স্ত্রীলোক ঠিক সেই আকারের পুরুষকে যদি বরণ করে, তবে প্রায়ই তাহার সেই দুর্ব্বুদ্ধির ফলভোগ সন্তানকে করিতে হয়। দেহের বর্ণও একটা বড় বিবেচনার বিষয়। স্বর্ণকেশী, কটা রংয়ের মেয়েরা, হয় রীতিমত শ্যামবর্ণ, অথবা ঈষৎ গৌরবর্ণ পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়; কিন্তু বিপরীত ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীতটিই প্রায় ঘটে না। ইহার কারণ আছে। কটাচুল বা নীলচোখ নর-জাতির আদর্শ রূপ নহে; উহাকে প্রাকৃতিক নিয়মের একরূপ ব্যতিক্রম বলাও যায়—যেমন শ্বেতবর্ণ মূষিক; শ্বেতকায়

অশ্ব ত' বটেই। য়ুরোপ ছাড়া পৃথিবীর আর কোন অংশে, এমন কি, মেরুদেশেও ঐরূপ বর্ণ প্রকৃতি-সুলভ নয়; সম্ভবতঃ উহার উদ্ভব হইয়াছে স্কান্দিনাবিয়াতে। প্রসঙ্গতঃ আমার একটা বিশ্বাসের কথা বলি, তাহা এই যে, শ্বেতচর্ম্ম—মানুষের স্বাভাবিক চর্ম্ম নয়; আমাদের পূর্ব্বপুরুষ হিন্দুদের মতই, মানুষের গাত্রচর্ম্ম হয় শ্যামবর্ণ অথবা ঈষৎ গৌরবর্ণ ছিল। প্রকৃতির আদি-সৃষ্টি যে মানুষ, তাহার বর্ণ শ্বেত নহে। অতএব শ্বেতজাতি বলিয়া কোন মনুষ্যজাতি নাই। মানুষের ঐ শ্বেতবর্ণটা আসলে রঙ্ উঠিয়া-যাওয়ার মত একটা বিশ্রী ব্যাপার। উত্তরের হিমময় অঞ্চলে যাহারা এককালে বসতি বিস্তার করিতে বাধ্য হইয়াছিল, ঐ সকল দেশ তাহাদের পক্ষে বিদেশের মতই ছিল; সেইখানে, শীত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, কৃত্রিম তাপ-গৃহে বিচিত্র গুল্মলতার মত, বহু শতাব্দী বাস করার ফলে, মানুষ তাহার সেই স্বাভাবিক গাত্রবর্ণ হারাইয়াছে। মাত্র চারি শতাব্দী পূর্ব্বে ভারত হইতে যে জিপ্সী-জাতি য়ুরোপে আসিয়াছিল, তাহাদের গাত্রবর্ণ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়—হিন্দুদিগের সেই বর্ণ কেমন করিয়া আমাদের বর্ণে পরিণত হইয়াছে। অতএব প্রেমের পাত্র-নির্ব্বাচনে মানুষ যে নীলচক্ষু ও স্বর্ণকেশের পরিবর্ত্তে কালো-চুল এবং কপিশ চক্ষুর পক্ষপাতী হয়, তাহার কারণ, প্রকৃতি ঐ উপায়ে আবার তাহাকে তাহার আদিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করে। তথাপি, শ্বেতচর্ম্ম এক্ষণে আমাদের যেন প্রকৃতি-সুলভ হইয়া উঠিয়াছে—যদিও এতখানি হয় নাই যে, হিন্দুদিগের শ্যামবর্ণ দেখিয়া বিতৃষ্ণা জন্মিতে পারে।

সর্ব্বশেষে—প্রত্যেক মানুষ, দেহের অঙ্গ-বিশেষের বিভিন্ন ত্রুটি সংশোধন করিবার মত এক একটি বিশেষ ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই যেমন,—যাহার নাসিকা অতিশয় অনুন্নত, তেমন ব্যক্তি বাঁশীর মত নাক বা টিয়াপাখীর মত মুখশোভা দেখিলে বিমোহিত হয়। দেহের অপর অঙ্গগুলির সম্বন্ধেও ঐরূপ। যাহারা অতিরিক্ত লম্বা এবং শীর্ণদেহ তাহারা খর্ব্বাকৃতি ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তির রূপে মজিয়া থাকে। আবার, মানসিক প্রকৃতি বা মেজাজও এই পছন্দের ব্যাপারে একটা কম জিনিষ নয়। প্রত্যেকে তাহার বিপরীত মেজাজের মানুষকে পছন্দ করে—সবক্ষেত্রে নয়, কেবল যেখানে ঐ মেজাজটা কিছু অধিক মাত্রায় বিদ্যমান।

একথা অবশ্য সত্য যে, যে-গুণটি কাহারো পূর্ণমাত্রায় আছে, সে তাই বলিয়া তাহার প্রণয়পাত্র বা পাত্রীর মধ্যে সেই গুণটির একান্ত অভাব বা অল্পতা গ্রাহ্য করে না; তথাপি, যাহার সেই গুণ আদৌ নাই, তাহার তুলনায় যাহার আছে

তাহার পক্ষে উহার অভাবটা অগ্রাহ্য করা আরও সহজ হয়। তার কারণ, সন্তানের মধ্যে সেই গুণের অসদ্ভাব সে নিজে নিবারণ করিতে পারিবে। ইহার দৃষ্টান্ত,—যাহার রং খুব শাদা সে, বর্ণ পীতাভ হইলে আপত্তি করিবে না। কিন্তু যাহার নিজের রং পীতাভ তাহার চক্ষে অত্যুজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ স্বর্গীয়-সুন্দর বলিয়া মনে হইবে। পুরুষেরা প্রায় অতি-কুৎসিত স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হয় না। যদি হয়, তবে বুঝিতে হইবে, উভয়ের যৌন-প্রকৃতিতে মাত্রাগত একটা আশ্চর্য্য মিল আছে; এবং ঐ স্ত্রীলোকের যতকিছু প্রকৃতি-বৈষম্য পুরুষটার ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ তাহার নিজের দোষগুলার সংশোধক। এই সকল কারণে যে-প্রেম জন্মে সেই প্রেমই প্রবল ও গভীর হইয়া থাকে।

প্রেমে-পড়ার মূলে এই যে সব কারণ আছে—প্রেমিক-প্রেমিকাগণ সে সম্বন্ধে অবশ্যই সজ্ঞান নহে। বরং প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করে, সে নিজেরই সুখলাভের জন্য ঐরূপ পছন্দ করিয়া থাকে, আর কিছুই বিবেচনা করে না; আসলে কিন্তু ঐ পছন্দের সঙ্গে সুখলাভের কোন সম্পর্কই নাই। ঐরূপ পছন্দের মূলে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত রুচি যে আছে, তাহা আমাদিগকে মানিতেই হইবে; কিন্তু ঐ রুচি আর কিছুই নয়, তাহার ব্যক্তি-স্বভাবের অনুযায়ী একটা প্রয়োজন-বোধ; এবং তাহাও ব্যক্তির নয়—জাতি বা গোষ্ঠীর হিতার্থে,—তাহারই আদি আদর্শটি অক্ষুণ্ণ রাখিবার গোপন তাগিদে। এক্ষেত্রে, ব্যক্তি-মানুষটা তাহার নিজের অজ্ঞাতসারে আত্ম-স্বার্থ অপেক্ষা একটা বৃহত্তর স্বার্থ—জাতির স্বার্থরক্ষায় প্রণোদিত হয়। এইজন্য, সে এমন সকল বিষয়কে বড় করিয়া দেখে—যাহার জন্য, আর কোন কারণে, তাহার কিছুমাত্র ব্যাকুল হইবার কথা নয়—কখনই হইত না। প্রথম-দর্শনে দুইজন যুবক-যুবতী নিজেদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে, পরস্পরের প্রতি যেরূপ গম্ভীর ও সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে—যেরূপ অন্তর্ভেদী ও অনুসন্ধানী দৃষ্টি বিনিময় করে, উভয়ে উভয়ের ভাবভঙ্গি যেরূপ মনোযোগ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করে—তাহাদের সেই আচরণ সত্যই অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। এইরূপ দেখিবার আকাঙ্ক্ষা পরে আর না থাকিতে পারে, যদি এমন কিছু চোখে পড়ে যাহা প্রথম-দর্শনে লক্ষ্য করে নাই। এই যে প্রজনন বা জনন-কর্ম্ম, ইহাই কন্দর্পের কাজ; ইহার জন্য সেই দেবতাটি সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত রহিয়াছেন, নানা ফন্দি-ফিকির উদ্ভাবন করিতেছেন, সর্ব্বদাই ধ্যানস্থ হইয়া আছেন। ব্যক্তিবিশেষের ঐ প্রেম-সাধনা—সকল ব্যক্তির ক্ষণ-জীবন একত্র করিলেও—ঐ দেবতার তপস্যার তুলনায় অতিশয়

অকিঞ্চিৎকর; কারণ, তাঁহার ভাবনা—সমগ্র জাতি ও তাহার আগামী বংশধরগণকে লইয়া; এইজন্যই তিনি ব্যক্তির স্বার্থ নির্ম্মমভাবে বলি দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। এই অতি ক্ষণিক ব্যাপারের সহিত তাঁহার কার্য্যের সম্পর্ক ততটুকু—মরণশীলের সহিত অমরের সম্পর্ক যতটুকু; অনন্তের তুলনায় অন্-অনন্ত যেমন, তাঁহার প্রয়োজনের তুলনায় উহাদের প্রয়োজনও তেমনই। যেহেতু তিনি জানেন যে, ব্যক্তিবিশেষের সুখ-দুঃখের হিসাব রাখা অপেক্ষা তাঁহাকে বৃহত্তর ও মহত্তর ভার বহন করিতে হয়, সেজন্য তিনি নির্ম্মম ও নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁহার সেই কাজ করিয়া চলেন;—হোক্ না সে যুদ্ধের ঝঞ্চনার মধ্যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের কোলাহলময় কেন্দ্রস্থলে, কিম্বা মহামারীর ভীষণতম প্রাদুর্ভাবকালে; এমন কি, জনসমাজ হইতে দূরে—মঠে-মন্দিরে, তপোবনেও তাঁহার ঐ দেবকার্য্যের বিরাম নাই।

আমরা দেখিয়াছি যে, প্রেমের পাত্র যত সুনির্দ্দিষ্ট হইবে, অর্থাৎ তদ্দ্বারা দুইটি বিশেষ ব্যক্তির বিশিষ্ট প্রয়োজন সাধিত হইবে, ততই তাহার প্রবলতা বাড়িবে। এরূপ ক্ষেত্রে যাহাকে প্রবল কামনা বলে, প্রেমে সেই কামনা যুক্ত হয়। যেহেতু প্রেমের পাত্র একজন ছাড়া আর কেহ হইতে পারে না,—অর্থাৎ যেহেতু ঐ প্রেম জাতি বা গোষ্ঠীর কোন একটি বিশেষ প্রয়োজনে উদ্রিক্ত হয়—সেই হেতু, ইহা তন্মুহূর্ত্তেই একটি অতি সম্ভ্রান্ত ও মহান্ রূপ ধারণ করে। অপর পক্ষে, যে-প্রেম যৌন-পিপাসা ব্যতীত আর কিছু নয়, তাহা অতিশয় নিম্নস্তরের—তাহা হেয়; তাহার কারণ, ঐ প্রেম বিশেষ ব্যক্তির অপেক্ষা রাখে না, ঐ পিপাসা চরিতার্থ করিবার পক্ষে সকলই সমান; উহার দ্বারা কেবল বংশবৃদ্ধিই হয়,—গুণবৃদ্ধি হয় না।

আমরা দেখিলাম যাহাকে আমরা প্রেম বলি, তাহা আর কিছুই নয়, সৃষ্টির সেই কাম; সেই ভব-বাসনা বা নিখিল জীব-সংসারের জিজীবিষাই ভাবী জনক-জননীর হৃদয় অধিকার করে। আসলে ঐ যুগল-প্রেম—ব্যক্তির জন্য ব্যক্তির ঐ যে মিলন-কাতরতা—উহাও একটা মোহ; ঐ যে একটি কোন বিশেষ স্ত্রীলোককে পাইবার জন্য সর্ব্বস্বপণ করা, উহার কোন অর্থ হয় না, কারণ, অপর যে কোন স্ত্রীলোকের দ্বারাও যেমন, উহার দ্বারাও তেমনি, ঐ পুরুষের নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধি হইবে না। ঐ মোহও ঘুচিয়া যায়, যদি আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়—যেমন, স্ত্রীলোকটা যদি বন্ধ্যা হয়। কিন্তু তেমন ত সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে, প্রত্যহ কোটি কোটি বীজ নষ্ট হইতেছে। তাহাতেও সৃষ্টির অন্তর্গত ঐ গূঢ়কামনা,

ঐ ভব-বাসনা চরিতার্থ হইতে পারিতেছে না। ঐরূপ ব্যর্থতার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, দেশ-কালও যেমন অসীম, দেহ-ধারণের জড়-উপাদানও তেমনই অশেষ। অতএব ঐ জিজীবিষা চরিতার্থ হইবার সুযোগও অনন্ত।

যুগ-যুগ ধরিয়া কবিগণ যে প্রেমের পিপাসা এত রূপে এত প্রকারে বর্ণিত করিয়াও শেষ করিতে পারেন নাই—তাহার কূলও পান নাই; এই যে ক্ষুধা যাহার বশে মনে হয়, কোন একটি বিশেষ বরাঙ্গনাকে লাভ করিতে পারিলে আমাদের সুখের অবধি থাকিবে না, এবং না করিতে পারিলে জগৎ অন্ধকার হইয়া যাইবে, সে দুঃখের ভাষাও নাই;- সেই পিপাসা এবং সেই ব্যথা ক্ষণজীবী মানুষের তুচ্ছ প্রয়োজন-সম্ভূত নয়—সমগ্র জাতির—মানব-গোষ্ঠীর দীর্ঘশ্বাস তাহাতে ব্যক্ত হইয়া থাকে; ব্যক্তির নয়—সমষ্টির আত্মা তাহার সেই মহতী বাসনা পূর্ণ করিবার যে অনন্য উপায় সন্ধান করে, তাহারই সফলতা বা নিষ্ফলতার ভাবনা তাহাকে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন রাখিয়াছে। ঐ জাতি বা বংশ-জীবই অনন্ত কাল বাঁচিয়া থাকিবে; এইজন্য প্রেমের বাসনাও যেমন অসীম, তৃপ্তিরও তেমনই শেষ নাই; দুঃখও বিরাট। ঐ যে বিরাট উহাই একটা মরণধর্ম্মী মানুষের ক্ষুদ্র হৃদয়ে বাসা বাঁধে; অতএব আশ্চর্য্য কি, সেই হৃদয় উহা ধারণ করিতে না পারিয়া বিদীর্ণ হয়; অথবা সেই অসীম সুখ ও অসীম দুঃখ প্রকাশ করিবার মত বাক্য খুঁজিয়া পায় না! আদিরসের যত উদাত্ত-গভীর কবিতা—সে সকলের মূলে আছে ঐ এক বস্তু; এইজন্যই তেমন কাব্যে যে উপমা-অলঙ্কার থাকে তাহা পার্থিব কল্পনাকেও ছাড়াইয়া যায়। কবি পেত্রার্ক ইহারই গান গাহিয়াছেন; ইহাই হইয়াছে সকল শ্রেষ্ঠ প্রেমগীতির প্রেরণা; তাহা যদি না হইত তবে ঐ সকল কবিতার কোন অর্থই কেহ বুঝিত না। এই অসীম প্রীতি, এই যে অপূর্ব্ব নারী-বন্দনা—ইহা চিন্তা বা বুদ্ধিবৃত্তির কাজ নয়। এমন কি, সাধারণতঃ উহা প্রণয়িনীর সত্যকার রূপগুণের বর্ণনাও নহে; কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রেমোন্মত্ত কবি তাহার হৃদয়হরণীকে ভাল করিয়া দেখেও নাই—কবি পেত্রার্কই তাহার প্রমাণ।

প্রণয়পাত্রী যদি অপরের অঙ্কশায়িনী হয়, কিম্বা যদি তাহার মৃত্যু হয়—তবে তাহার মত যাতনা প্রেমিকের আর নাই; তাহার কারণ, ঐ বিয়োগ বেদনা ত' সেই ব্যক্তিটারই বেদনা নয়; তাহার সেই ব্যক্তি-চেতনায় যে বিরাটের অধিষ্ঠান হইয়া থাকে—তাহার সেই চিরন্তনী সত্তা, যে-সত্তা বংশপরম্পরায় অমরত্ব কামনা করে—সেই সত্তায় ঐ আঘাত লাগে। এইজন্যই প্রেমজনিত ঈর্ষ্যা এমন জ্বালার

সৃষ্টি করে ; পুরুষ যাহাকে ভালবাসে তাহাকে অপরের হাতে তুলিয়া দেওয়ার মত এমন আত্মবিসর্জ্জন আর নাই। বীর-যোদ্ধা যে—কোনরূপ হৃদয়াবেগ প্রকাশ করিতে যে লজ্জা পায়—সে-ও প্রেমের আবেগ দমন করিতে চায় না। ইহার কারণ, সে যখন প্রেম-পিপাসায় কাতর হয়, তখন সে আর সেই ব্যক্তি নহে—তাহার ভিতরে সেই গোষ্ঠী-আত্মাই কাঁদিয়া উঠে, তাই মান-অপমান-বোধ থাকে না। এই প্রেমের নিকটে, মানীর মান, সজ্জনের কর্ত্তব্যবোধ, এবং বিশ্বাসীর বিশ্বস্ততা, সকলই পরাজয় স্বীকার করে ; সর্ব্ববিধ প্রলোভন, এমন কি মৃত্যুভয়কেও যে জয় করিয়াছে তাহারও ইহার কাছে নিস্তার নাই। বড়দের কথা ছাড়িয়া দিলেও, সাধারণ মানুষের জীবনে আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করি ; যেমন—অন্যবিষয়ে যতই ধর্ম্মজ্ঞান থাকুক, প্রেমে পড়িলে সেই ধর্ম্মজ্ঞান অনেক পরিমাণে শিথিল হয়। এই প্রেম যেন কিছুই মানে না ; ইহার বিরুদ্ধে কোন হাত নাই, সমষ্টির হিতার্থে তাহারই আদেশ পালন করিতে হয়। এই দিক দিয়া দেখিলে, 'দেকামেরন' (Decameron)-এর অধিকাংশ ভাগই যেন ব্যক্তি-পুরুষের স্বার্থ ও স্বাধিকারের বিরুদ্ধে গোষ্ঠি-পুরুষের বিদ্রূপপূর্ণ পরিহাস ভিন্ন আর কিছুই নহে ; যেন সেই সকল দাবী পদাঘাতে চূর্ণ করা হইতেছে। যেখানে দুইজন নর-নারী পরস্পরকে প্রাণ দিয়া কামনা করে, সেখানে পদমর্য্যাদা বা কুলমর্য্যাদা বা ঐ ধরণের ছোট-বড় বলিয়া যদি কোন বাধা উপস্থিত হয়, তবে তাহাও ঐ জাতি বা গোষ্ঠীর বৃহত্তর প্রয়োজনে তুচ্ছ হইয়া যায়। সেই প্রয়োজন ব্যক্তির নয়, অন্তহীন বংশধারাই উহার লক্ষ্য ; তাই মানুষের যতকিছু নীতি-নিয়ম, যতকিছু মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব যেন তৃণরাশির মত ফুৎকারে উড়িয়া যায়।

* * * * *

নাটক বা উপন্যাসে আমরা যখন দেখি দুইটি প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরকে পাইবার জন্য প্রাণান্ত করিতেছে, এবং শেষে বৃদ্ধ অভিভাবকদের উপরে তাহারাই জয়ী হয়, তখন আমাদের কি ভালোই লাগে! তরুণ-তরুণীর ঐ যে ব্যবহার, উহা আমাদের চক্ষে যেমন প্রীতিকর তেমনই ন্যায়সঙ্গত মনে হয় ; তার কারণ, উহারা সেই গোষ্ঠীর বা জাতির হিতার্থেই ঐরূপ করিতেছে। বুড়ারা তাহা করিতে দিবেনা, তাহারা চায় ঐ ব্যক্তির স্বার্থ—ব্যক্তির হিত। মিলনান্ত নাটকগুলি এইজন্যই দর্শকদিগকে এমন পরিতৃপ্ত করে ; ঐ যে পরিণামে প্রেমিকযুগলের জয় হয়—উহাই আমাদের মনোমত সুবিচার। নাটক শেষ হইলে, দর্শকগণ বড়ই

খুশী হইয়া বিজয়ী প্রণয়ীযুগলের নিকট বিদায় গ্রহণ করে; ঐ প্রণয়ীযুগলের মত, তাহারাও মনে করে, এইবার দুইজনে সুখী হইল। কিন্তু আসলে, তাহা নিজেদের সুখ নয়—মিথ্যা মায়ার ভ্রমে তাহাই মনে হয় বটে; বরং অভিভাবকদের কথা গ্রাহ্য না করিয়া তাহারা বংশধরের হিতার্থে নিজেদের সুখ বিসর্জন দিয়াছে। ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্ত নাটকে যে প্রেমের ঘটনা থাকে, তাহাতে দুইজনেই বিনষ্ট হয়—ইহাই যেন নিয়ম। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, সে ক্ষেত্রে ঐ প্রণয়ীযুগল যে উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্রমাত্র,—অর্থাৎ, ঐ দুইজনের ঠিক যেরূপ মিল হইলে প্রজননের উদ্দেশ্য সফল হইত—এখানে তাহা ব্যর্থ হইয়াছে; যেমন, রোমিও ও জুলিয়েট, ডন কার্লোস, দি ব্রাইড অব্ মেসিনা প্রভৃতি।

প্রেমে পড়িলে মানুষ এমন সকল আচরণ করে যাহাতে হাস্যরস অথবা করুণ-রসের সৃষ্টি হয়। ইহার কারণ, সেই অবস্থায় মানুষটা নিজেকে হারাইয়া ফেলে; সে তখন সেই 'ব্যক্তি' থাকে না সমষ্টির চেতনা তাহাকে অভিভূত করে; কাজেই তখন তাহার ব্যবহার আর তাহার মত নয়। অতিশয় নীরস গদ্য-প্রকৃতির লোকেও যখন প্রেমাক্রান্ত হয়, তখন সেও কবি হইয়া উঠে, তাহার অদ্ভুত আচরণ হাস্যরসের উদ্রেক করে। ইহারও কারণ সেই এক; প্রেম ত' আর কিছুই নয়, একটি কোন বিশিষ্ট পাত্র বা পাত্রীর প্রতি প্রবল আকর্ষণ; মানুষ মনে করে, ঐ একটিকে না পাইলে তাহার জীবন মরুভূমি হইয়া যাইবে। ঐ যে বংশধারা—এবং সেই ধারায় যেখানে যেমন সম্ভব একটি বিশেষ আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট সন্তানের জন্মসংঘটন, তাহারই তাড়নায় অর্থাৎ সেই দুর্দ্ধর্ষ সৃষ্টিবিধানের—সেই আদি ভব-বাসনারই একটি গোষ্ঠীগত অভিপ্রায়ের তাড়নায়—মানুষ ঐরূপ মোহগ্রস্ত হয়; ঐ একটিকে না পাইলে সে জগৎ অন্ধকার দেখে। জীবন এমনই বিস্বাদ বোধ হয় যে, মৃত্যুকেও সে আর ভয় করে না; এইজন্য অনায়াসে আত্মহত্যাও করে। এইরূপ প্রেমিকের হৃদয়ে সেই সমষ্টিগত ভব-বাসনাই ঐ একটি নারীকে পাইবার প্রবল ইচ্ছারূপে দেখা দেয়। সেইরূপ অবস্থায় শেষে আত্মহত্যা করিতে হয়। কখনো কখনো দুইজনেই করে। ইহা নিবারণের একমাত্র উপায়, উন্মাদ হইয়া যাওয়া—প্রকৃতি-মাতা তাহার সেই দারুণ নৈরাশ্যের উপরে এমনই করিয়া একটা আবরণ টানিয়া দেন। প্রতি বৎসর এইরূপ কত ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কেবল হতাশ প্রেমিকেরই যে এমন দুর্দশা হয় তাহা নয়; প্রেমের প্রতিদান

এবং মিলন হওয়া সত্ত্বেও প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুখ অপেক্ষা দুঃখের মাত্রাই অধিক হইয়াছে। তাহার কারণ, ঐ প্রেমের দাবী মিটাইতে ব্যক্তির ব্যক্তিগত সুখে বড় বেশী আঘাত লাগিয়াছে। তাহা ছাড়া, আরও কারণ আছে। শুধু বাহিরের বিঘ্ন-বাধাই নয়—ভিতরেও বাধা থাকে; প্রেমে অন্ধ হইয়া মানুষ এমন ব্যক্তির প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়, যাহাকে আদৌ পছন্দ করে না,—এমন কি ভিতরে ভিতরে একটা বিদ্বেষ অনুভব করে; কেবল যৌন-প্রকৃতিগত একটা মিল ঐ আকর্ষণের কারণ। সেই যৌন-আকর্ষণ বা বংশরক্ষামূলক কামনা ব্যক্তিকে অভিভূত করে বলিয়াই, তাহার নিজের সেই পছন্দ-অপছন্দের ভাবনা সে সময়ে লুপ্ত হইয়া যায়, প্রণয়িনীর সকল দোষ—আপত্তিকর যাহা-কিছু—সব অগ্রাহ্য করিয়া, কেবলমাত্র একটা প্রবল কামনার বস্তু হিসাবেই, সে তাহাকে চিরজীবনের জন্য নিজের গলায় বাঁধিয়া লয়। সে সময়ে সে এমনই অন্ধ হইয়াছিল যে, কিছুদিন পরেই যখন সেই জাতি বা গোষ্ঠীরূপী পুরুষের উদ্দেশ্য সাধন হইয়া যায়, তখন সে বুঝিতে পারে যে, সে এমন এক ব্যক্তিকে চিরসঙ্গী বা সঙ্গিনী করিয়াছে যাহাকে সে মোটেই পছন্দ করে না। এইজন্যই আমরা প্রায় দেখিতে পাই, অতিশয় বুদ্ধিমান, এমন কি বিশিষ্ট জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিও ডাকিনী-প্রেতিনীর মত পত্নী লাভ করিয়াছেন; এমন পছন্দ যে তাঁহাদের কেন হইল তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। এমনও ঘটিয়া থাকে যে, প্রণয়িনীর যতকিছু দোষ প্রেমিক সবই স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে,—ইহাও বুঝিতেছে যে তাহাকে লইয়া সে সুখী হইতে পারিবে না, তথাপি তাহার একটুও ভয় হয় না।—

"হৃদয়ে তোমার বিষ কিবা মধু—
সে কথায় কাজ নাই;
এই শুধু জানি, যা' হও তা' হও—
তোমারেই আমি চাই।"

সর্ব্বশেষে, ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, একই কালে কাহাকেও ভালবাসা, এবং না-ভালবাসা সম্ভব। এইজন্য প্লেটো বলিয়াছেন, মানুষের ভালবাসা আর মেষের প্রতি বাঘের ভালবাসা—দুইই একজাতীয়। এইরূপ ভালবাসার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সেই সকল প্রেমার্ত্ত যুবার আচরণে, যখন তাহারা কিছুতেই বহু সাধ্য-সাধনাতেও তাহার প্রণয়-পাত্রীর কৃপা লাভ করিতে পারে না।—

"ভালো তারে বাসি—

তবু শত্রু হেন মানি!"—শেক্‌স্‌পীয়ার।

("I love and I hate her"—Shakespeare)

ঐরূপ বিদ্বেষ যখন বাড়িয়া উঠে, তখন তাহার আর কিছুই করিতে বাধে না; প্রেমিক তখন প্রথমে তাহার প্রিয়াকে হত্যা করিয়া পরে নিজেও আত্মহত্যা করে। প্রতিবৎসর সংবাদপত্রে এইরূপ ঘটনার সংবাদ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বস্তুতঃ, এসকলের মূলে আছে সেই এক তত্ত্ব,—জাতি বা সমষ্টির অধিদেবতার সহিত ব্যক্তির ইষ্ট-বিধাতার নিরন্তর দ্বন্দ্ব। পূর্ব্বোক্ত দেবতা কিছুতেই ছাড়িবে না, ব্যক্তির সর্ব্বনাশ করিবেই। কেবল ব্যক্তিরই নহে ঐ দেবতাটির খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য কখনো একটা সমগ্র জাতির স্বার্থ বলি দেওয়া হইয়াছে। শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকে (Henry VI, Part III, Act III, Scenes 2 and 3) ইহার দৃষ্টান্ত মিলিবে। ইহার কারণ, ঐ ব্যক্তির স্বার্থের তুলনায় সমষ্টির স্বার্থ অনেক বড়—তাহার দাবীটাই আগে। ইহাই বুঝিয়া, প্রাচীনেরা সমষ্টির ঐ কামনাকে কন্দর্প-দেবতারূপে কল্পনা করিয়াছিলেন; সেই দেবতা বয়সে শিশু হইলেও অতিশয় ক্রূর ও অহিতকারী; অতএব একটা যথেচ্ছাচারী অপদেবতা বলিয়া তাহার নিন্দা করা হইত,—যদিও দেবতা বা মানুষ উভয়ের উপরেই তাহার সমান প্রভুত্ব। তাহার বর্ণনা এইরূপ;—সে ধনুকধারী, তাহার বাণগুলি বিষদিগ্ধ; সে অন্ধ, তাহার দুইটা পাখা আছে; পাখা থাকার অর্থ—সে বড় চঞ্চল, বেশিক্ষণ কোথাও থাকে না, অর্থাৎ প্রেমের মোহ শীঘ্রই ছুটিয়া যায়। নেশা যে ছুটিয়া যায় তাহার কারণ, জাতির সমষ্টি-জীবনের অভিপ্রায় যেমনই সিদ্ধ হয়, প্রেমও পলায়ন করে; এতদিন তাহাই উহাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, এখন ছাড়িয়া দেয়—তখন সে বুঝিতে পারে, কি ঠকাটাই সে ঠকিয়াছিল। কবি পেত্রার্কের প্রেম-কামনা যদি পূর্ণ হইত তবে সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার গান বন্ধ হইয়া যাইত; পাখীদের বেলাতেও ঠিক তাহাই হয়—ডিম পাড়িবার পর তাহারা আর গান গায় না।

প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলিয়া রাখি যে, আমার এই প্রেম-তত্ত্বের আলোচনা প্রেমিক প্রেমিকাদের যতই অপ্রীতিকর হউক, আমি ঐ প্রেমের যে মূল-রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিলাম তাহাতে তাঁহাদের মঙ্গল হইবে,—ইহার দ্বারা ঐ দুর্দ্দমনীয় কামনা যতটা দমন করা সম্ভব হইবে, ততটা আর কিছুতেই হইবে না; অবশ্য, যদি সেই প্রেমের অবস্থায় বিচারবুদ্ধির কিছুমাত্র অবকাশ থাকে। সত্য বটে, ঐ অবস্থায় নরনারীগণ

মনে করে যে, তাহারা নিজেদেরই সুখপিপাসায় ঐরূপ প্রেমের বশীভূত হইয়াছে ; কিন্তু উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য অন্যরূপ—নিজেরা তাহা বুঝিতেও পারে না ; তাহারা এমন একটি ব্যক্তি-মানুষকে জন্মগ্রহণ করাইতে উদ্যত হইয়াছে, যে আর কাহারও সন্তান হইতে পারে না। কিন্তু প্রায়ই এমন ঘটে যে, ঐ জীবসংস্কারের মোহে যে প্রবল প্রেম-পিপাসা হয়, তজ্জন্য পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেও, উভয়ের প্রকৃতিতে, অন্যদিকে বিশেষ গরমিল থাকে। ঐ মোহ যখন দূর হয়, তখনই তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে—হইতে বাধ্য।

এই কারণে যাহারা প্রেমে পড়িয়া বিবাহ করে, তাহারা প্রায় বড় অসুখী হয় ; তার কারণ, তাহারা তো নিজের হিতার্থে বিবাহ করে নাই, ঐ প্রেম তো ব্যক্তি-স্বার্থ বোঝে না—ভবিষ্যৎ বংশধরের হিতার্থে তাহারা আত্মসুখ বিসর্জ্জন করে। যাহারা নিছক প্রেমের জন্যই বিবাহ কবে তাহাদের জীবন দুঃখেই কাটিবে। 'প্রেম ধরে যার বিয়ের হাল, তার দুঃখ চিরকাল'—স্পেন দেশে এইরূপ একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। বর-কন্যার সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সাধারণতঃ পিতামাতা যে বিবাহ দিয়া থাকেন তাহার ফল উল্টাই হয়। এরূপ বিবাহে যে-সকল বিষয় বিবেচনা করা হয়—তাহা আর যেমনই হউক—কাল্পনিক নয়, সত্য বস্তু ; তাই সেগুলি হাওয়ার মত মিলাইয়া যাইতে পারে না। এমন বলা যাইতে পারে যে, এরূপ ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ বংশের কল্যাণ অপেক্ষা বর্ত্তমান ব্যক্তি-যুগলের কল্যাণকেই বড় করা হয় ; কিন্তু তাহাও যে খুব ঠিক, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না।

এই সকল আলোচনা হইতে অতঃপর এই সিদ্ধান্ত হয় যে, বিবাহ করার অর্থ—হয়, ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততির হিতার্থে আত্মসুখ বিসর্জ্জন, নয়, আত্মসুখ-ভোগের জন্য ভবিষ্যৎ বংশের অহিতসাধন। দুইএর একটা অনিবার্য্য ; কারণ, প্রেমও গভীর হইবে এবং বিবাহও অতিশয় সুবিধাজনক হইবে, এমন যোগাযোগ কচিৎ হইয়া থাকে। তেমন সৌভাগ্য বড়ই বিরল। আমরা বিবাহের পর নর-নারীর জীবনের এত যে দুর্দ্দশা—দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক অবনতি দেখিতে পাই, তাহার কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পছন্দ বা ইচ্ছার বশে বিবাহ হয় নাই, হইয়াছে নানাবিধ অপর কারণে—ঘটনাচক্রে বা অবস্থার যোগাযোগে। বলা বাহুল্য, সুখী দম্পতির সংখ্যা খুব কম হইবারই কথা ; কারণ, বিবাহ তো বর-বধূর সুখভোগের জন্য নয়, ভবিষ্যৎ সন্ততির মঙ্গল-সাধনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

তথাপি, কোমল-প্রাণ নারী ও পুরুষদিগের সান্ত্বনাচ্ছলে আমি একটা কথা বলিব। অতিগভীর প্রেম বলিতে আরও একটা জিনিষ বুঝায়—যাহাকে বলে সমপ্রাণতা বা সখিত্ব, পরস্পরের মধ্যে একটি এক-ভাবের সামরস্য। কিন্তু ইহা জন্মিতে পারে না, যতক্ষণ না সহজাত যৌন-সংস্কার সম্পূর্ণ মুছিয়া যায়। এইরূপ বন্ধুভাব তখনই সম্ভব হয়, যখন ভবিষ্যৎ সন্তানের ব্যক্তিত্বটি সুনির্দ্দিষ্ট করিবার পক্ষে তাহাদের দৈহিক, মানসিক ও চারিত্রিক গুণাবলী যেমন একে অন্যের পরিপূরক হয়, তেমনই তাহাদের নিজেদের ব্যক্তিগত প্রকৃতিতেও পরস্পরের মধ্যে ঐরূপ গুণাবলীর এমন সমতা বা সামঞ্জস্য ঘটে যাহাতে উভয়ের মধ্যে সামরস্য সম্ভব।

আমি এখানে প্রেমের গূঢ়তত্ত্ব যেরূপ ব্যাখ্যা করিলাম, তাহা আমার মূল দার্শনিক মতবাদের সহিত বিশেষভাবে জড়িত—তদনুসারে ঐ তত্ত্ব যেরূপ দাঁড়ায় তাহা এই।—

আমরা দেখিয়াছি, নর-নারীর ঐ যে বিশেষ যত্নের সহিত সঙ্গী বা সঙ্গিনী-নির্ব্বাচন-স্পৃহা, উহাতে যৌবন-আকাঙ্ক্ষাই প্রেমের অতি দুর্দ্দমনীয় কামনাতে পরিণত হয়,—তাহার মূলে আছে ভবিষ্যৎ বংশের প্রতিষ্ঠাকল্পে একটা অজ্ঞান-অধীর উৎকণ্ঠা। এই যে গূঢ়-গভীর প্রবল উৎকণ্ঠা ইহার দ্বারা দুইটি সত্য প্রমাণিত হয়। প্রথমতঃ—মানুষের অমরতা; এই অমরতা বংশপরম্পরার মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইয়া থাকে। কারণ, এই যে একাগ্র এবং উদ্যমশীল একটি বাসনা—যাহার মূলে কোন সজ্ঞান উদ্দেশ্য অথবা বিবেচনা-বুদ্ধি নাই এমন একটা প্রয়োজন-বোধ, আমাদের স্বভাবেরই গূঢ়-গভীর প্রবৃত্তি না হইয়া পারে না; ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, মানুষ ক্ষণজীবী নয়; তাহার অস্তিত্ব এক জীবনেই শেষ হয় না; কেবলমাত্র কালক্রমেই, একজাতির মানুষ একেবারে লোপ পাইয়া, একটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতির মানুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় না। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের জীবন কেবল ব্যক্তির জীবন নয়, সে জীবন জাতি বা গোষ্ঠীর জীবনেরই একটা ঘনিষ্ঠ অংশ। প্রেমের মূলে আছে ঐ যে সমষ্টির স্বার্থ বা হিতাকাঙ্ক্ষা—সেই গোষ্ঠীর ধারাটিকে দৃঢ়, ও তাহারই বিশিষ্ট লক্ষণগুলিকে উৎকর্ষিত করিবার জন্যই এই যে একটি পাত্র বা পাত্রী বিশেষের প্রতি প্রবল আকর্ষণ—সেই আকর্ষণ যতই ক্ষণিক বা দীর্ঘস্থায়ী হউক, উহাই মানুষের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার এবং তাহাতে সফল বা বিফল হওয়া তাহার জীবনব্যাপী সুখ বা দুঃখের হেতু হইয়া

থাকে। অতএব ইহার দ্বারা মানুষই প্রমাণ করে যে, তাহার ঐ জীবন একার বা ব্যক্তির জীবন নহে, সে বংশের হিতার্থেই নিজেকে উৎসর্গ করে।

নহিলে, প্রেয়সীর একটি চাহনি বা তাহার চলন-বলনের একটা বিশেষ ভঙ্গির জন্য প্রেমিকেরা সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিতে চায় কেন? তার কারণ, তাহার যে অংশটা অমর তাহাই উহাকে পাইবার জন্য অধীর হইয়াছে; আর যাহা কিছু, তাহা সেই অমরের নয়—যে অংশটা মৃত্যুশীল তাহারই কামনার বস্তু; ঐ যে একটিমাত্র রমণীর জন্য এমন গভীর এবং ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা—উহা দ্বারাই আমরা আশ্বস্ত হইতে পারি যে, আমাদের এই ব্যক্তি-সত্তার মূলেও একটা সৎ-বস্তু আছে, সেই বস্তু বংশধারার মধ্য দিয়া অমরত্বের অধিকারী হয়।

ইহারই নাম ভব-বাসনা, বা সৃষ্টির অন্তর্গত সেই জিজীবিষা,—কেবল দেহধারণ করাই নয়, সেই দেহধারী জীবনকে নিরন্তর জীয়াইয়া রাখা; এমনই করিয়া জীবন মৃত্যুকে জয় করিয়া চলে। কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না, ঐ একই ভাবে সেই জীবনধারা প্রবাহিত হইতে থাকিবে; যতদিন ঐ জীবন আছে ততদিন যন্ত্রণারও অবসান নাই, ব্যক্তি-মানুষটার মৃত্যু ঘটিবেই।

যদি এই দিক হইতে আমরা মনুষ্যজীবনের ঐ অশান্ত কল-কল্লোলের প্রতি চাহিয়া থাকি, তবে ইহাই দেখিতে পাই যে, অভাব ও অসুখের তাড়নায় সকলেই অস্থির হইয়া ঘুরিতেছে; সেই অশেষ অভাব মিটাইবার জন্য, এবং হরেক রকমের দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস করিতেছে। কিন্তু এত করিয়াও কোন আশা নাই; একটা যাতনাময় জীবনকে কোনরকমে কয়েকটা দিন বাঁচাইয়া রাখা ভিন্ন, ব্যক্তির ভাগ্যে আর কিছুই মিলিবে না। তবুও, ওই ক্রন্দন-কোলাহলের মধ্যেই দেখিতে পাইবে, দুইটি প্রেমিক-প্রেমিকা কি আকুল পিপাসাভরে দৃষ্টি-বিনিময় করিতেছে! কিন্তু এত গোপনে, এত ভয়ে-ভয়ে, এমন চুরি করিয়া চায় কেন? তার কারণ, উহাদের অন্তরাত্মা জানে উহারা কতবড় [illegible]পরাধ ক[illegible] এই [illegible] দুঃখ ও অশান্ত কলরোলকে উহারাই চির[illegible] করিয়া [illegible], উহাদের ঐ [illegible] মানুষের এই দুঃখময় জীব[illegible] অবসান [illegible] না।